দ্বাদশ খণ্ড—সপ্তম সংখ্যা। কার্ত্তিক, ১৩০১।

নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা,

৩/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে, শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত।
২১০/৪নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩০১।

ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩] [এই সংখ্যার মূল্য ।৶০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

১। ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষের জন্য সম্পাদকের মফস্বল ভ্রমণ ও তৎপরে অসুস্থতার দরুণ কার্ত্তিক মাসের নব্যভারত কিছু বিলম্বে প্রকাশিত হইল। আশ্বিন মাসের বাকী ৩ ফর্ম্মা এই সংখ্যায় সংলগ্ন হইল।

২। বহু গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী, এদিকে টাকার অভাবে আমাদিগের যারপর নাই কষ্ট হইতেছে। এই সময়ে গ্রাহকগণ দয়া করিয়া কিছু কিছু দিলে যারপর নাই উপকৃত হইব।

ফরিদপুর সুহৃদ্‌সভা—বিজ্ঞাপন।

কোটালিপাড় রিলিফ-ওয়ার্কের কেন্দ্রে রোগীর চিকিৎসার জন্য দুই জন সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রয়োজন। দরিদ্র-সেবা যাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহাদের সাহায্য চাই, আর্থিক বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই, কেবল খোরাকী বাবতে কিছু দেওয়া যাইবে। ২।৩ মাস থাকিতে হইতে পারে। যাঁহারা ইচ্ছুক, সভার সম্পাদকের সহিত ২১০।৪ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটে সাক্ষাৎ করিবেন।

হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য।

ধর্ম্মের প্রামাণ্য লইয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃথিবীতে মহা শব্দ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কেবল আমাদের ধর্ম্মেরই প্রামাণ্য আছে, আর কোন ধর্ম্মের প্রামাণ্য নাই। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য চান। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রামাণ্য আবশ্যক, একথা প্রথমে হিন্দুরাই তোলেন। শুধু তুলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, দর্শনে যেমন ধর্ম্মের অনেক কথার বিচার ও মীমাংসা হইয়াছে, তেমনি হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্যেরও বিচার এবং মীমাংসা হইয়াছে। বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের নিকট নূতন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। নিজ-ধর্ম্মের প্রামাণ্য বলিয়া খ্রীষ্টানগণ যাহা প্রচার করেন, তাহার সহিত সনাতন ধর্ম্মের প্রামাণ্যের তুলনা করিলে, তাহাদের প্রামাণ্য নগণ্য হইয়া পড়ে। সে কথা দূরে যাক্, এখন খ্রীষ্টানেরা আসিয়া বলিতেছেন, হিন্দু, তোমার ধর্ম্মের প্রামাণ্য কি? এ বড় বিচিত্র কথা, প্রামাণ্যের আদি শিক্ষককে আসিয়া অন্য লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রামাণ্য কি, তাহা তুমি কি বলিতে পার? খ্রীষ্ট মিশনরিগণ হিন্দুকে ঠিক্ এই প্রশ্ন করেন।

হিন্দু শুনিয়া বলিতেছেন, যদি কোন ধর্ম্ম বাস্তবিক ধর্ম্ম নামের যোগ্য হয়, তাহা সনাতন ধর্ম্ম; আর কোন ধর্ম্মের যদি প্রামাণ্য থাকে, তাহাও সেই সনাতন ধর্ম্মের আছে। খ্রীষ্টান! তোমার ধর্ম্মের প্রামাণ্য, প্রামাণ্যই নহে। কেন, তাহা বলিতেছি :—

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়া ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সেই পরমেশ্বরের সহিত আত্মার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়। পরলোক ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষয়, সুতরাং তাহা সামান্য মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর নহে। তাই যদি হইল, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম যে সকল পারলৌকিক বিষয় প্রচার করিয়াছে, তাহা বাস্তবিক সত্য কি না? একথা বিচার করিতে হইলে জিজ্ঞাস্য এই, যিনি সে সকল কথা বিদিত করিয়াছেন তিনি কি সামান্য মনুষ্য? যদি সামান্য মনুষ্য হন, তবে তাঁহার যাহা জ্ঞানাতীত, তাহা যদি প্রচার করিয়া থাকেন, সে সমুদায় অনুমান-মূলক কথা। কিন্তু তিনি তা না হইয়া যদি এমত পুরুষ হন, লোকাতীত বিষয় যাঁহার গোচর, তবে তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে। এজন্য খ্রীষ্টানেরা বলিলেন, ঈশা সেইরূপ পুরুষ; ঈশা ঈশ্বর। তবে প্রমাণ করা চাই, ঈশা ঈশ্বর কি না? সেই প্রমাণার্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বলিলেন, ঈশা কতকগুলি অদ্ভুত, এবং অলোকসাধারণ ক্রিয়া কলাপ দ্বারা আপন ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস এই সমস্ত ক্রিয়া কলাপের সাক্ষী। এই ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপিত। সামান্য লোকের নিকট এরূপ প্রামাণ্য গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট-ইউরোপ যখন ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধ হইতে লাগিল, তখন তাহা নিজেই সে প্রামাণ্যকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। কারণ, মূর্খের নিকট যাহা প্রামাণ্য, জ্ঞানীর নিকট তাহা প্রামাণ্য নহে। এজন্য এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, খ্রীষ্ট-ইউরোপে Straus, Renan, Mill প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং Huxley প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এপ্রামাণ্যের উপর আর আস্থা স্থাপন করেন না। খ্রীষ্টধর্ম্মের এই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নিম্নলিখিত কারণে অগ্রাহ্য।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশার বাক্য। The New Testament বা নূতন বাইবেল ঈশ্বর-উপদিষ্ট-বাক্য; সুতরাং বাইবেল অপৌরুষেয় নহে। এখন কথা এই, খ্রীষ্টধর্ম্মের পৌরুষেয়বাদের পুরুষ ঈশা ঈশ্বর কি না? যদি তিনি ঈশ্বর হন,তবে তাঁহার অলৌকিক বিষয়ের উপদেশ সমুদায় সত্য, নহিলে নহে। বাইবেলের সত্যতা প্রতিপাদনার্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ দ্বিবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করেনঃ—

প্রথমতঃ। বাইবেলের পরতঃ-প্রমাণ বা External Evidence.

দ্বিতীয়তঃ। বাইবেলের স্বতঃ-প্রমাণ বা Internal Evidence.

প্রথমতঃ আমরা পরতঃ-প্রমাণ গ্রহণ করিলাম। পরতঃ-প্রমাণ, প্রমাণান্তর হইতে বাইবেলকে সত্য রূপে প্রতিপন্ন করিতে চায়। এই প্রমাণান্তর ইতিহাস। ইতিহাস স্থাপন করিতে চাহে যে, ঈশা অদ্ভুত এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ করিয়াছিলেন বলিয়া ঈশ্বর। একথার আপত্তি এইঃ—

(১) অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। আজ যাহা অদ্ভুত, কাল তাহা বিজ্ঞান-জ্যোতিঃতে সামান্য ও প্রাকৃত। অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয়, তবে প্রতি বাজিকর ঈশ্বর।

(২) ইতিহাস ঘটনাবলির যে সাক্ষ্য দেয়, তাহার প্রামাণ্য কি? তাহার প্রামাণ্য যাহা দিবে, তদুত্তরে বলিতে হইবে, সে প্রামাণ্যের আবার প্রামাণ্য কি? ঐতিহাসিক প্রমাণের এইরূপ অনন্ত-পরম্পরায় প্রমাণের আবশ্যকতা হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণে অনবস্থা দোষ (Argumentum-ad-infinitum) ঘটে। অতএব ইতিহাস ঈশ্বরত্ব স্থাপনে অসমর্থ। তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, পরতঃ-প্রমাণে বাইবেল প্রামাণ্য নহে।

হিউম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মীয় পরতঃ-প্রমাণ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সে সমস্ত আপত্তি আজিও অখণ্ডিত রহিয়াছে। এই প্রমাণে ইতিহাস অগ্রাহ্য। তবে কি ইতিহাস একেবারেই অগ্রাহ্য? আমরা এমত কথা বলিতে চাই না। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরত্ব স্থাপন পক্ষে ইতিহাস প্রামাণ্য নহে। লৌকিক ব্যাপার স্থাপন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণের তত বাধা নাই। তবে তাহাতেও প্রমাণের প্রকৃতি এবং বিষয় বিচার্য্য।

এই ইতিহাস প্রতিপন্ন করে যে, পূর্ব্বতন মিশর-ধর্ম্ম হইতে ইহুদী ধর্ম্মের উৎপত্তি। পুরাতন বাইবেলেও তাহা সপ্রমাণ। প্রাচীন মিশরধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের যে অনেক সাদৃশ্য ছিল, এমত নহে; আর্য্যগণের সহিত মিশরবাসিগণের সংমিশ্রণও ছিল। সুতরাং পূর্ব্বকালে বৈদিক ধর্ম্ম মিশরে প্রচার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সেই মিশর হইতে প্রাচীন জুডিয়ায় বৈদিক-তত্ত্ব সকল প্রচার হইয়া থাকিবে। হিব্রুগণ সেই সমস্ত মূল তত্ত্বের উপর আপনাদের ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশা অতি আধুনিক কালের লোক। তিনি যে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত অলৌকিক তত্ত্ব সমুদায় হিব্রুধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ অনুমান দ্বারা তাহা হইতে এক বিশেষ ধর্ম্মমতের সৃষ্টি করেন নাই, এমত প্রমাণের নিতান্ত অভাব।

ফরাশীদেশীয় নটোভিক্ (M. Notovitch) নামক কোন ভ্রমণকারী সম্প্রতি তিব্বৎ-দেশীয় লী নগরীর হেমিস অভিধেয় বৌদ্ধমঠ হইতে একখানি পালীভাষায় লিখিত ঈশার জীবনী সমুদ্ধার করিয়া ফরাশী ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। সেই জীবনীতে

প্রতিপন্ন যে, ঈশা ভারতে আসিয়া এতদ্দেশীয় ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়া গিয়াছিলেন। একথা যদি অপ্রামাণ্য না হয়, তাহা হইলে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বেদই অলৌকিক তত্ত্ব সকল জগতে প্রচার করিয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় বা স্বতঃ-প্রমাণের কথা। স্বতঃ-প্রমাণের যুক্তি-পথ এই রূপ :—

নূতন বাইবেলে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সমুদায় নির্দ্দোষ। এরূপ নির্দ্দোষ বাক্য অভ্রান্ত পুরুষ ভিন্ন উক্ত হইতে পারে না। কারণ, সামান্ত ভ্রান্ত মনুষ্যোক্ত বাক্য হইলে তাহা অভ্রান্ত হইত না। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ অভ্রান্ত নহে। সুতরাং বাইবেল ঈশ্বরোক্ত বাক্য এবং ঈশা সেই ঈশ্বর।

এ যুক্তির সমস্ত বল বাইবেলের সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। আজি যদি বাইবেলের কোন অংশ ভ্রান্ত বা দোষযুক্ত প্রমাণিত হয়, অমনি এ যুক্তির সমস্ত বল বিনষ্ট হইল। এ যুক্তি বাইবেলের নিজ বাক্য হইতে তাহাকে সত্য রূপে প্রমাণ করিতে চাহে। এ যুক্তির দোষ এই যে, বাইবেলকে সত্য বলিয়া প্রমাণ যে করিবে, সে ত ভ্রান্তিশীল মনুষ্য ; ভ্রান্তিশীল মনুষ্য কিরূপে অভ্রান্তের প্রমাণ হইতে পারে ? যে প্রমাণ করিবে সেই মনুষ্যের প্রমাণ কি ? যদি তাহার কিছু প্রমাণ থাকে, তবে সেই প্রমাণান্তরের প্রমাণ কি ? সুতরাং এস্থলেও অনবস্থা দোষ ঘটে। অতএব বাইবেল স্বতঃ-প্রামাণ্যও নহে।

খ্রীষ্টধর্ম্মের যাহা পরতঃ-প্রমাণ, তাহা কি হিন্দুধর্ম্মে আছে ? হিন্দুধর্ম্মেরও প্রমাণ পরতঃ এবং স্বতঃ। হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ প্রমাণ বুঝাইবার পূর্ব্বে এই কয়েকটী বিষয় জানা উচিতঃ—

(১) পৌরাণিক এবং বৈদিক ভেদে হিন্দু ধর্ম্মের দুই অঙ্গ। বেদই হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম সেই বেদের বিস্তৃতি মাত্র।

(২) জনসমাজের জ্ঞানাধিকার বিভিন্ন বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম এই রূপ দ্বিধা বিভক্ত। জ্ঞানিগণের জন্য যাহা প্রতিপাদ্য, অজ্ঞানীর কাছে তাহা অগ্রাহ্য। সকল অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করা অসম্ভব ; এজন্য হিন্দুধর্ম্ম নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অধিকার ভেদের উপযোগী হইয়াছে।

(৩) যেমত অধিকার ভেদে জ্ঞানী অজ্ঞানী এই দুই প্রধান শ্রেণী হইল, তেমতি জ্ঞানিগণের মধ্যেও অনেক অধিকার ভেদ আছে। যেমন শাস্ত্রজ্ঞানী, দার্শনিক, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, তার্কিক, বিজ্ঞানবিৎ, মুনি, ঋষি, মহর্ষি দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, ইত্যাদি। জ্ঞানিগণের মধ্যে যাঁহারা এক এক বিশেষ মত প্রচারক, তাঁহারাই মুনি নামে প্রথিত।

(৪) অদ্ভুত লীলা খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মে তাহা নহে। হিন্দুধর্ম্মে লীলার প্রমাণ ঈশ্বর। শাস্ত্র-প্রমাণ ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস্য বলিয়া তাঁহার লীলা দেবলীলা। হিন্দু অগ্রে স্বীকার করে যে রাম, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিষ্ঠির, হনুমান প্রভৃতি দেবাবতার, তার পর, কাজেই স্বীকার্য্য যে, তাঁহাদের লীলা সকল দেবলীলা বলিয়া অদ্ভুত এবং অলৌকিক। কিন্তু সকল হিন্দুই যে ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করে, এমত নহে। যে হিন্দু নিম্নাধিকার জ্ঞানে ঈশ্বরাবতার স্বীকার করেন, তিনি হয় ত উচ্চাধিকারে উঠিয়া তাহা স্বীকার করেন না। তবেই দেব-দেবীর সৃষ্টি হিন্দুধর্ম্মে নিম্নাধিকারীর জন্য। উচ্চাধিকারী সাকার ও সগুণ ঈশ্বরবাদী * নহেন। দৃষ্টান্ত

* হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর। নির্গুণ উপাসনাই মুক্তি। সগুণ ঈশ্বর নিম্নাধিকারীর উপাস্য।

স্বরূপ দেখ, ব্যাস মহাভারত সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, তাহা কাব্য; কিন্তু অজ্ঞানী এবং নিম্নাধিকারী জ্ঞানী সমাজে তাহা ইতিহাস-রূপে গৃহীত। যে জ্ঞানিগণ এবং অজ্ঞানিগণ ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ, সমগ্র মহাভারত প্রকৃত ঘটনা-রূপে তাঁহাদের গ্রহণ করাতে বাধা কি? তাঁহাদের নিকট প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত বিষয়ই গ্রাহ্য।

তবেই প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দুজনসমাজে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। পুরাণোক্ত বলিয়াই যাঁহারা সহজেই লোকের ঈশ্বরত্বে অথবা অবতার-বাদে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত প্রামাণ্যের প্রয়োজন কি? এজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মের যাহা পরতঃপ্রমাণ, তাহা হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য নহে। যাহারা কোন প্রামাণ্য চাহে না, তাহাদের কাছে প্রামাণ্য ধরা বৃথা। সেই নিমিত্ত হিন্দু ধর্ম্ম কেবল জ্ঞানিগণের জন্য প্রামাণ্য দিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্ম্মেও দেখা যায় যে, সামান্য জনগণ ধর্ম্মের তত প্রামাণ্য চাহে না; সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্বে তাহাদের দৃঢ় আস্থা। ধর্ম্মের প্রামাণ্য চায় কেবল সংশয়ী জনগণ। সেই সংশয়ী জনগণের নিমিত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ স্বতঃপ্রমাণ পথ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বতঃপ্রমাণ তত প্রবল যুক্তিবিশিষ্ট নহে বলিয়া, খ্রীষ্টানগণ পরতঃ-প্রমাণকে বিধিমত প্রকারে প্রবল করিতে চাহেন। চাহিলে কি হইবে, সংশয়িগণ সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ ছেদন করিয়া উঠেন। তাহারা প্রমাণের পর প্রমাণ চাহিয়া সর্ব্ব প্রমাণের উপরে উঠিয়া পড়েন।

ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সামান্য জনগণের অচলা ভক্তি। শাস্ত্র সকল চিরমান্য এবং মহাজন-অবলম্বিত। এই কারণে সাধারণ জনগণ শাস্ত্রোক্ত বিষয় সমুদায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। কি অদ্ভুত, কি অযৌক্তিক, কি প্রাকৃত, কি অপ্রাকৃত,—কোন বিষয় বিচার না করিয়া তাহারা বিশ্বাস করিয়া থাকে। সেই সাধারণ লোকমণ্ডলীর জন্য পুরাণোক্ত ধর্ম্ম। এই পুরাণোক্ত হিন্দুধর্ম্মে কথিত যে, ঈশ্বর জীবের কল্যাণার্থ শরীরধারণ ও লীলা বিগ্রহ করিয়া থাকেন। রামাদি সেইরূপ বিষ্ণুর অবতার। সাধারণ জনগণ এই অবতারবাদ পুরাণ-প্রমাণ অবলম্বন করিয়া রামাদির লীলা সকলকে দেবলীলা বলিয়া অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত লীলা বিশ্বাস্য কেন? যেহেতু তাহারা দেব-লীলা। সেই দেবতা বিশ্বাস্য কেন? যেহেতু তাহা শাস্ত্রানুমত। শাস্ত্র গ্রাহ্য কেন? যেহেতু তাহা ঋষি-প্রোক্ত এবং মহাজন-অবলম্বিত। তবেই দাঁড়াইতেছে, সেই অজ্ঞানিগণ, জ্ঞানী ও মহাজন-আচরিত পথের অনুগামী। যাহা চিরকাল মান্য হইয়া আসিতেছে, যাহা সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আদৃত এবং অবলম্বিত, তাহা সামান্য জনগণ কখন অমান্য করিতে পারে না। এই পরতঃ-প্রমাণে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সাধারণ জনগণ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য।

তথাপি, খ্রীষ্টধর্ম্মের পরতঃ প্রমাণ যে হিন্দুজনসমাজে একেবারেই নাই, এমত কথা আমরা বলিতে চাহি না। তাই সাধারণ লোকমণ্ডলীর মধ্যেও কেহ কেহ সেই প্রামাণ্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা শাস্ত্রে তাহার এইরূপ আভাস পাই।

"পরাশর কহিলেন—ইন্দ্র গমন করিলে পর, গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্লেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে প্রীতি সহকারে কহিতে লাগিলেন হে মহাবাহো। অদ্য আপনি আমাদিগকে

ও গোগণকে এই পর্ব্বত ধারণ করিয়া, মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন। আপনার এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত গোকুলে জন্ম, আবার এই প্রকার দিব্য কর্ম্ম এ সকল কি? হে তাত, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি কালিয়কে দমন করিয়াছেন, প্রলম্বাসুরকেও বধ করিয়াছেন, আবার আজ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইতেছে। হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার বীর্য্য অবলোকন করিয়া, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদয় দেবগণও একত্রিত হইলে এ কর্ম্ম করিতে পারেন না। হে অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আপনার এই প্রকার বালত্ব, এই অতিবীর্য্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এ সকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি।"

বিষ্ণুপুরাণ। ৫ম অংশ। ১৩ অধ্যায়।

অন্যত্র :—

"তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কার ভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে যখন অনুপস্থিত তোমাকে বা সাক্ষাৎ উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিয়াছি, আমি অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।"—গীতা, ১১ অঃ ৪১।৪২ শ্লোক।

স্থানান্তরে :—মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বান্তর্গত উতঙ্কোপাখ্যানে প্রকাশ যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন কালে উতঙ্ক মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মুনি কুরুপাণ্ডবগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যখন কুরুবংশের ধ্বংসের কথা শুনিলেন এবং বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই সংহার নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও নিবারণ করেন নাই, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাকে শাপোদ্যত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্মপরিচয়ে বলেন, আমি স্বয়ং বিষ্ণু। উতঙ্ক তখন সেই বিষ্ণুরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে অভিলাষী হইলেন। উতঙ্ক সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং শাপ হইতে নিরস্ত হইলেন।

অতএব পুরাণেই প্রতিপন্ন যে, অদ্ভুত লীলা হিন্দুর নিকটও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। এই প্রামাণ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব পুরাণে স্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণোক্ত বাক্য সকল প্রামাণ্য।

এই দ্বিবিধ পরতঃ-প্রামাণ্য হিন্দুধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ধর্ম্মের চূড়ান্ত প্রামাণ্য নহে। সাধারণ জনগণের জন্য এই প্রামাণ্য দ্বয় ব্যবস্থিত। নৈয়ায়িকেরা বেদের পৌরুষেয়বাদ স্থাপনার্থ যে তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের এই পরতঃ-প্রামাণ্য বললাভ করিয়াছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন :—

"যদি বল ঈশ্বরের শরীর নাই। সুতরাং তালু প্রভৃতি স্থানের অভাব বশতঃ বর্ণোচ্চারণ সম্ভব না হওয়াতে, বেদের প্রণয়ন কিরূপে ঘটিতে পারে? এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, স্বভাবতঃ শরীর হীন হইলেও তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ লীলা বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।"

জৈমিনি নৈয়ায়িকদের বিপক্ষে যাহাই বলুন না কেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অবতারবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা তত যুক্তি দ্বারা পরিচালিত নহেন। তবু তাঁহাদেরও কিছুই যুক্তি নাই, এমত নহে। সে যুক্তি এই :—

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমানের স্বেচ্ছানুমত কার্য্য করিবার বাধা নাই। পৃথিবীর পাপ ভার মোচনের জন্য তিনি দেহ পরিগ্রহ করিয়া অমানুষী ক্রিয়া কলাপদ্বারা

সেই ভার মোচন করেন। যাহা মানুষে সম্ভব নহে, তাহা সর্ব্বশক্তিমানে সম্ভব।

এ যুক্তি যদিও অত্যন্ত দুর্ব্বল বটে, কিন্তু সাধারণ জনগণ এই যুক্তিতে পরিচালিত। খ্রীষ্টানগণও এই যুক্তি অবলোকন করিয়া ঈশার অবতরণ ও অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপের সমর্থন করেন। নিম্নাধিকারী হিন্দু এবং খ্রীষ্টানের যুক্তি অথবা বিশ্বাস যাহাই হউক, খ্রীষ্টানের অবতারবাদের সহিত হিন্দুর অবতারবাদের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। খ্রীষ্টানের ঈশ্বরাবতার পৃথিবীতে আপ্তবাক্য দিতে আসিয়াছিলেন। হিন্দুর আপ্তবাক্যের অভাব কোন কালেই হয় নাই। হিন্দুর আপ্তবাক্য শ্রুতি এবং তদ্‌প্রামাণ্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র। তবে হিন্দুর অবতারের প্রয়োজন কি? হিন্দুর ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন গীতায় উক্ত হইতেছে।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই উক্তি অনুসারে পুরাণেও দেখা যায়, বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণাদি রূপে জগতের ভার মোচনের জন্য, উদয় হইয়াছিলেন। শুদ্ধ জগতের পাপ ভার মোচন করিয়া যান নাই, তাঁহারা বেদকেও প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ তাহার সাক্ষী। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বরূপ এই অবতারগণের উপদেশে সাধারণ হিন্দু-জনসমাজ চালিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর চক্ষে বেদের এই প্রামাণ্য বড় সামান্য নহে। অন্য কোন ধর্ম্মীয় আপ্তবাক্যের যদি এরূপ প্রামাণ্য থাকিত, তাহা হইলে আজি সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃথিবীতে ডঙ্কা মারিয়া বেড়াইতেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, এজন্য খ্রীষ্টধর্ম্মের যাথার্থ্য প্রমাণার্থ ঈশার ঈশ্বরত্ব স্থাপন আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে সেরূপ ঘটে নাই। হিন্দুধর্ম্ম বেদ হইতে সমুৎপন্ন, বেদ কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক কৃত নহে। বেদে যে ঋষিগণের ধ্বনি আছে, তাঁহারা বৈদিক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা মাত্র। তাঁহারা বৈদিক গুরু বা প্রচারক। পাণিনির অনুশাসনে প্রকাশিত যে, বৈদিক ঋষি কর্ত্তৃক বেদ উক্ত হইয়াছে, এইরূপ সমাখ্যাই দেখা যায়, তাঁহারা যে বেদের কর্ত্তা এমত বাক্য কোথাও উক্ত হয় নাই। তৈত্তিরিয়, কাঠক, কালাপ প্রভৃতি ঋষিবাক্য, তিত্তির, কঠক, কলাপ কর্ত্তৃক উক্ত বাক্য বলিয়াই প্রচারিত। নহিলে বেদ চিরকালীন শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া..আসিতেছে। শ্রুতির কর্ত্তা কেহ নাই। যাহার কর্ত্তা নাই, তাহার কর্ত্তার ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা আবশ্যকও নহে।

পুরাণোক্ত দেবলীলা যেমন শরীরধারী ঈশ্বরাবতার কর্ত্তৃক কৃত, বেদের কর্ত্তা তেমনি কোন শরীরধারী বিশেষ ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রুতিতে প্রথিত নাই। যখন জ্ঞানিগণের নিকট ঈশ্বরাবতরণ গ্রহণীয় নহে, তখন তাঁহাদের কাছে সেরূপ প্রামাণ্য স্বীকার্য্যও নহে। এখন কথা এই, জ্ঞানিগণ যদি ঈশ্বরাবতার স্বীকার না করিলেন, তবে তাঁহারা পুরাণোক্ত দেবলীলা সমস্ত কিসের প্রামাণ্য রূপে স্বীকার করেন। সামান্য জনগণ ত এই সমস্ত লীলাকে দেবলীলা বলিয়া গ্রহণ করেন, সুতরাং তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ এক প্রাচীন কালের ঈশ্বরাবতার, এবং তাঁহার লীলাদি প্রাচীনকালের দেবলীলা। সামান্য লোক এই সকল লীলার কথা শুনিয়াই তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন। যে পরোক্ষ প্রমাণের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম স্থাপিত,

অজ্ঞানী হিন্দুর নিকট তাহা অপ্রামাণ্য নহে। কিন্তু, পরোক্ষ প্রমাণ ও ইতিহাস জ্ঞানবান্ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুর নিকট ধর্ম্মের প্রমাণ নহে। যদি বল, বেদ যে অপৌরুষেয়, একথা হিন্দু জ্ঞানী কেন শ্রুতি প্রমাণে গ্রহণ করিলেন? একথা তিনি শ্রুতি প্রমাণে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিলেন, বেদ যে কোন পুরুষ কর্তৃক কৃত, এমত প্রমাণের নিতান্ত অভাব। পৌরুষেয় বাদ অপ্রামাণ্য বলিয়া হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় বলেন। তদ্রূপ দেবলীলার ঐতিহাসিক প্রমাণ হিন্দুজ্ঞানীর নিকট অগ্রাহ্য।

হিন্দুজ্ঞানী প্রত্যক্ষবাদী। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না। যে দেবলীলা সমস্ত অজ্ঞানী হিন্দুর নিকট পরোক্ষ প্রামাণ্য, হিন্দুজ্ঞানীর কাছে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়। কিরূপ প্রত্যক্ষ, তাহা বলিতেছি।

যাঁহার নিকট ঈশ্বরাবতারই সিদ্ধ নহে, তাঁহার নিকট দেবলীলা কিরূপে সম্ভবে? হিন্দুজ্ঞানী বলেন, এই সমস্ত দেবদেবী কল্পনা মাত্র। বেদেও তাহা ব্যক্ত আছে।

> "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
> উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
> রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যঙ্গাস্ত্রাদিকল্পনা।
> দ্বিচত্বারি ষড়ষ্টাসাং দশ দ্বাদশ ষোড়শ॥
> অষ্টাদশাপি কথিতা হস্তাঃ শঙ্খাদিভির্যুতাঃ।
> সহস্রান্তাস্তথা তাসাং বর্ণবাহনকল্পনা॥
> শক্তিসেনাকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যেবং হি পঞ্চধা।
> কল্পিতস্য শরীরস্য তস্য সেনাদিকল্পনা॥
>
> রামতাপনীয়োপনিষৎ। পূর্ব্বভাগ, প্রথমখণ্ড।

ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত এবং অশরীরী হইলেও উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ তাঁহার রূপ কল্পনা হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইল, তবে তাঁহার অস্ত্রাদিও কাল্পনিক। যে সকল দেবতা রূপবান্, তাঁহাদের পুংস্ত্ব, স্ত্রীত্ব, অঙ্গ, অস্ত্র, সেনাদি, বর্ণ, বাহন প্রভৃতি সমুদায় কল্পিত।

তৎপরে বেদ সেই সমস্ত দেব কল্পনার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। গোপালতাপনীয়োপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় রূপক-তত্ত্ব এবং অস্ত্রাদি ও আভরণের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

হিন্দুজ্ঞানীর নিকট দেবদেবী সমস্ত যেমন ঈশ্বরতত্ত্বের কল্পিত রূপ, তাঁহাদের লীলা সকলও দেবত্ত্বের কল্পিত রূপ। হিন্দুধর্ম্ম এই কৌশলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদের নিকট প্রামাণ্য।

হিন্দুধর্ম্ম দেখাইয়াছে, ভক্তের নিকট যাহা বাহ্য জগতের ঘটনা বলিয়া প্রথিত, জ্ঞানীদের নিকট তাহা অধ্যাত্ম-জগতের সত্য বলিয়া উপলব্ধ। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই, যাহারা কেবল উপর উপর দেখে, তাহারা সেই সকল লীলাকে ঐতিহাসিক ঘটনা রূপেই দেখিতে পায়, কিন্তু যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রবল, তাহাদের নিকট সেই সমস্ত লীলা পরমেশ্বরের অন্তর্জগতীয় আভ্যন্তরিক ব্যাপার। যাহা ভক্তি ও জ্ঞান যোগ পথের আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহাই ঈশ্বরের লীলা রূপে হিন্দু জ্ঞানী অতি আহ্লাদ সহকারে উপলব্ধি করেন। সাধক সেই সমস্ত লীলা অন্তর্জগতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। যাহা অজ্ঞানীর পরোক্ষ জ্ঞান ও ভূতসাক্ষী, তাহা জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বর্ত্তমান প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মে সুতরাং যাহা অতীতকালের ঐতিহাসিক প্রমাণ, জ্ঞানীদের জন্য, খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় সেই প্রমাণকে নানা বন্ধনে আরও বলবান করিবার প্রয়োজন হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত রাসলীলা বর্ণনের এক স্থান তুলিয়া দিতেছি।

"অনন্তর কৃষ্ণ, নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা সৌরভ ভরে দিক্ সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী কুমুদ কুমুদিনী ও মধুকর গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। তখন কৃষ্ণ, বলভদ্রের সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদবিন্যাস করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীত অতীব মধুর ও বণিতাপ্রিয় এবং ঐ গানে নানা তীব্রস্বরের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই মনোহর গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অনেক গোপী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে মধুসূদন বিরাজমান, সেই স্থানে আগমন করিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী সেই গানের লয়ানুসারে শনৈঃ শনৈঃ গান করিতে আরম্ভ করিতে লাগিল। কেহ বা তাহাতেই অবধান করিয়া মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কোন গোপী, বারম্বার কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে ডাকিয়া লজ্জিতা হইল। আবার কোন প্রেমান্ধা গোপী বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করিয়া নিমীলিত লোচনে, তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল। অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাস ভাবে পরব্রহ্মস্বরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল।"

বিষ্ণুপুরাণ এই মোক্ষের দুইটী কারণ দর্শাইতেছেন :—

প্রথম। ভগবানের চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদভোগে গোপীর অশেষ পুণ্যক্ষীণ হয়।

দ্বিতীয়। ভগবানের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন মহাদুঃখভোগে তাহার অশেষ পাপক্ষীণ হয়।

হিন্দুধর্ম্মের একটী সারকথা এই, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এ উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। এই হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফলবাদ। এই কর্ম্মফলবাদই হিন্দুধর্ম্মের পাপের শাসন ও পুণ্যের উদ্বোধন। কর্ম্মফল-বাদের তাৎপর্য্য এই, সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয়, আর, দুঃখভোগ হইলে দুঃখকারণ পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীর কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হইল এবং ভগবানের অপ্রাপ্তি নিমিত্ত দারুণ দুঃখভোগে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপও নষ্ট হইল। সুতরাং সংসারস্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিয়া গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখ-রাহিত্য) প্রাপ্ত হইল।

বাস্তবিক, হিন্দুধর্ম্মে দ্বিবিধ জগৎ এককালেই প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানীর জন্য বাহ্যজগৎ এবং জ্ঞানীর জন্য অন্তর্জগৎ। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ও নরকাদি সমস্ত অন্তর্জগতের বিষয় স্থূল অবয়বে প্রকটিত। সূক্ষ্ম, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব তদ্রূপ স্থূল অবয়বে দেবদেবী রূপে প্রতীয়মান। ভক্তিযোগের সমস্ত ব্যাপারই কৃষ্ণলীলা। যাঁহারা সংসার হইতে দূরে গিয়াছেন, অথচ নামমাত্র সংসারে (পদ্মপত্রে জলবৎ) লিপ্ত আছেন, তাঁহারাই ব্রজধামে আসিয়াছেন। ব্রজপুর শব্দের অর্থই তাহাই। ব্রজধামে গোপরূপ জীব আসিয়া দেখেন, সেখানে যখন সংসারের বিষময় চিন্তারূপী কালিয় এবং পাপপ্রলোভনের ভীষণ প্রলম্বাসুর ব্রজের উৎপাত আরম্ভ করে, তখন জীবে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং ভগবান রূপে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করে। যাঁহার হাতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, তিনি নিজে ব্রজের অনিষ্টপাত নিবারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন। কৃষ্ণের এই সমস্ত লীলা অন্তজগতের নিত্য ব্যাপার। হিন্দু শাস্ত্রে অনেকগুলি রূপক ভাঙ্গা আছে, অনেক নাই। কিন্তু যাহা ভাঙ্গা আছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন যে, তজ্জাতীয় সমস্ত লীলা সেই এক শ্রেণীর পদার্থ। নহিলে একটি হইবে বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা, অন্যটি হইবে রূপক, এমত যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই

দেখুন মহাভারত সম্বন্ধে নিজে ব্যাস কি বলিতেছেন—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

হে জগদীশ! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করিয়াছি। তুমি অখিল গুরু এবং বাক্যাতীত, অথচ আমি স্তবদ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি। তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনষ্ট করিয়াছি। হে পরমেশ! তুমি আমার এই ত্রিবিধ দোষ ক্ষমা কর।

ব্যাসেরই কৃত সমুদায় পুরাণ। তিনি পুরাণে যে কবিত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে খুলিয়া বলিলেন। নিম্নাধিকারী জনগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্যই তিনি কাব্যাকারে জাজ্জ্বল্যরূপে ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্য জনগণের ভক্তি উদ্রেকের জন্যই দেবদেবীর সৃষ্টি। যাহাতে সেই ভক্তি অপনীত না হয়, তজ্জন্য তিনি পৌরাণিক সৃষ্টি ও কল্পনার বিষয় সাধারণের নিকট গোপন রাখিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কারণ, গোপন না রাখিলে বিপরীত ফল ঘটিবারই সম্ভাবনা। যখন লোকে অধিকারী হইবে, তখন পৌরাণিক রহস্য সমুদায় আপনিই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সপ্তষষ্টি শ্লোক এই রূপ একটি উপদেশ-বাক্য। এই উপদেশ-বাক্যই পৌরাণিক রহস্যের আর একটি প্রমাণ।

হিন্দু জ্ঞানিগণ যদি হিন্দু দেবদেবী এবং তাঁহাদের লীলাদি রূপক বলিয়াই জানিলেন, তাহা হইলে গীতোক্ত অবতারবাদের সামঞ্জস্য হয় কই? যাঁহারা ঈশ্বরের অবতারবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন:—যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার শরীর ধারণেরই বা প্রয়োজন কি? শরীর ধারণ করিলে বরং তাঁহার শক্তি পরিমিত হইয়াই যাইবে। অনন্ত কখন পরিমিতদেশে নিঃশেষিত হইতে পারেন না। অনন্ত যাঁহার শক্তি, বিশ্বরূপ দেহও তাঁহার অনন্ত। পরিমিত দেহধারণের কোন আবশ্যকতা নাই।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোন নিগূঢ় শক্তিরই বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়। সেই শক্তিকে ব্রহ্মই বল, বা ঈশ্বরই বল, বা অদৃষ্ট বল, সে সমস্তই এক কথা। যখন ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য প্রণালী এই শক্তির অধীন হইয়া চিরদিন চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাতেই বিশ্ব সুনিয়মিত ও সুশাসিত হইয়া রহিয়াছে, তখন তদতীত একজন মাত্র দেশকালদ্বারা পরিমিত পুরুষ কি করিবেন? তাঁহার আবশ্যকতাই বা কি? গীতার অভিপ্রায় যাহা, তাহা মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টির অতীত, এই অদৃষ্ট শক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইবার বাধাই বা কি? আর তাহা যদি তদ্রূপে সিদ্ধ হয়, তবে কি তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক ঘটিতেছে না? যদি ঘটে, তবে গীতোক্ত বচন অপ্রামাণ্য নহে। যখনই বিশ্বে দৈবশক্তি ও সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই বলা যাইতে পারে:—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ না করিলে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে না, এ শ্লোকের এমত অভিপ্রায় নহে। সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব অথবা যে তমোগুণদ্বারা পাপনাশ হয়, তাহার আবির্ভাব, ঈশ্বরত্বের সম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান যদি শরীর ধারণ না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি না করিতে

পারেন, তবে তাঁহার নিজ নামের সার্থকতাই থাকে না। অতএব ঈশ্বরে সকলই সম্ভব।

ঈশ্বরাবির্ভাবের নামই যে ঈশ্বরের সম্ভব, পুরাণেও তাহা কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সেই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, দেখুন :—

"যৎকালে কাল সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং সাতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল,—রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল; যখন আকাশে তারকা সমূহ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল; নদী সকলের সলিল নির্ম্মলভাব ধারণ করিল, কমল দ্বারা জলাশয়ের শোভা হইল, বনবৃক্ষগণের স্তবক ফুটিয়া উঠিল এবং তাহাতে বিহঙ্গকুল মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল, সমীরণ সুগন্ধবাহী পবিত্র এবং সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল, যৎকালে দ্বিজাতিদিগের অগ্নি সকল শান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল, অসুরদ্বেষী সাধুদিগের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বিষ্ণুর সম্ভব কাল আসন্নপ্রায় দেখিয়া কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ গান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরী সকল অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তৎকালে দেব ও ঋষিসমূহ হর্ষান্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তৎকালে সাগরের সঙ্গে সঙ্গে জলধর মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল, পূর্ব্বাদিক হইতে পূর্ণিমা চন্দ্রের ন্যায়, দেবশক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন।—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥"
ভাগবত। ১০-৩-৮।

এস্থলে বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, এই শব্দেরই প্রয়োগ আছে। বিষ্ণুর আবির্ভাব কোন্ সময়ে ঘটে? যখন সাত্ত্বিক ভাবে বিশ্ব আনন্দে ভাসিতে থাকে, সেই সময়েই বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। জগতে সেই সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব ভাগবত পৌরাণিক ভাষায় অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই আবির্ভাবই শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব। পুরাণ স্থূলাবয়বী হইলেও বেদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল কেমন বজায় রাখিয়াছে!

নিজে গীতা বলিতেছেন :—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
১০অ—২।৩।

স্বামী এইরূপ অর্থ করেন। "আমার প্রভব অর্থাৎ আমি জন্ম রহিত হইলেও নানা বিভূতি দ্বারা আমার যে আবির্ভাব, তাহা দেবতা ও মহর্ষিগণও অবগত নহেন। কারণ আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের উৎপাদক এবং তাঁহাদের বুদ্ধ্যাদির প্রবর্ত্তক। যে ব্যক্তি আমাকে অজ (জন্মরহিত) অনাদি এবং মহেশ্বররূপে জানেন, তিনি মোহ ও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন।" তবেই দাঁড়াইতেছে, তিনি দেবতুল্য মহাজনগণের বুদ্ধ্যাদিতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর কার্য্যসাধনার্থ অবতীর্ণ হয়েন।

এখন কথা এই, নিজ কৃষ্ণরূপ যে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রতিরূপ এবং কৃষ্ণলীলা যে অধ্যাত্ম-জগতের সত্য, অধ্যাত্ম-জগতের সেই অধ্যাত্ম তত্ত্ব সমুদায় কি সত্য যে, তাহাদের প্রতিরূপকে সত্য বলিতেছ? সেই অধ্যাত্ম-জগৎ যদি সত্য হয়, তবে তাহার নিয়মাবলির প্রতিরূপ সত্যকেই প্রদর্শন করিতেছে, আর যদি মিথ্যা হয়, তবে এই লীলা সকলও মিথ্যা। অনেকগুলি লীলা ঈশ্বর-সাধনতত্ত্বের প্রতিরূপ। যাহা সাধনার বিষয়ীভূত, তাহা ভক্তিজগতে প্রতীয়মান। ভক্ত নিজ জীবনে তাহা অনুভব করেন। ভক্তির সাধন সমস্তই ভক্তিযোগ। কতকগুলি লীলা এই ভক্তিযোগের নিদর্শন মাত্র। অপর

কতকগুলি তদ্রূপ জ্ঞানযোগের নিদর্শন। যাঁহারা সেই ভক্তি অথবা জ্ঞানযোগে নিরত, তাঁহারাই তাহাদের প্রামাণ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, অন্যে পারিবে না।

কিন্তু, যে কৃষ্ণরূপ পরমাত্মতত্ত্বের প্রতিরূপ এবং সেই পরমাত্মতত্ত্বের সহিত জীবের মিলন যে কৃষ্ণরাধার মিলনে এবং ব্রজলীলায় পরিব্যক্ত, তাহার প্রামাণ্য কোথায়? বেদ এই সমস্ত নিগূঢ় আত্মতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞান বিকাশ করে। তাই যদি হইল, তবে বেদের প্রামাণ্য কি? এই বেদের প্রামাণ্য লইয়া হিন্দুদর্শন অনেক বিচার করিয়াছে। আমরা একে একে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। আমরা দেখাইতেছি, হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ যে বেদ, সেই বেদপ্রচারিত অলৌকিক তত্ত্বাবলির প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নাই। অতএব, হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ অলঙ্ঘনীয়।

(১) লোকসমাজে প্রধান প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু ধর্ম্ম এই প্রত্যক্ষকেই প্রামাণ্যরূপে স্থির করিয়া সেই নিকষে বৈদিক ধর্ম্মতত্ত্ব সকল পরীক্ষা করিতে চান। প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,—বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষ। বাহ্য জগৎ, বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ-বিষয়; সুতরাং বাহ্য জগতের প্রামাণ্য পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয়। কিন্তু যাহা বাহ্যজগৎ হইতে অতীত, তাহার প্রমাণ কিছু বাহ্য ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে পারলৌকিক বিষয়ের প্রামাণ্য রূপে স্থির করিলে, ধর্ম্ম যে রূপ হাস্যাস্পদ হয়, চার্ব্বাকদর্শন তাহা প্রদর্শন করে। ধর্ম্ম যে সেরূপ প্রমাণে পরীক্ষিত হইতে পারে না, চার্ব্বাকদর্শন তাহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। এজন্য চার্ব্বাকদর্শনও হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কারণ, তাহা স্পষ্টই বলিতেছে, জ্ঞানি! তুমি যদি স্থূলদর্শীর ন্যায় বাহেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা ধর্ম্মের পারলৌকিক বিষয় বিচার করিতে চাও, তবে তুমি ধর্ম্মের সত্য কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ধর্ম্মের সত্য প্রতিপাদনার্থ অন্যরূপ প্রত্যক্ষের প্রয়োজন। এই জন্য চার্ব্বাক দর্শন বলিলেন, প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং অন্তঃপ্রত্যক্ষ।

"কঃ খলু জ্ঞানোপায়ো ভবেৎ। ন তাবৎ
প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্যমান্তরং বাভিমতম্।
সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

চার্ব্বাক বলেন, এই আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। বাহ্যপ্রত্যক্ষের ভ্রান্তি হইতে পারে, আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রমাণ। দেখুন, বাহ্য প্রত্যক্ষে ইন্দ্রধনু একখানি ধনু, আভ্যন্তরিক জ্ঞানে তাহা ধনুই নহে। বাহ্য প্রত্যক্ষে চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র বস্তু, আভ্যন্তরিক জ্ঞানে, তাহা এক বৃহদায়তন জ্যোতিষ্ক। এই ভ্রান্তিপূর্ণ বাহ্য প্রত্যক্ষ কি ধর্ম্মের প্রামাণ্য হইতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম বলেন, ধর্ম্মে যাহা বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা বাহ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ কর, যাহা নহে, সেই অলৌকিক বিষয়সকলকে বাহ্যপ্রত্যক্ষের কষ্টি দিয়া যদি পরীক্ষা করিতে চাও, তবে ধর্ম্মের দশা যাহা হয়, তাহা চার্ব্বাক দর্শনে দেখ। অলৌকিক ধর্ম্ম পরীক্ষার নিমিত্ত যে বাহ্যপ্রত্যক্ষ গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত নহে, চার্ব্বাকদর্শন তাহা প্রতিপন্ন করে। চার্ব্বাকদর্শন এজন্য অভাব পক্ষে প্রমাণ, ভাব পক্ষে নহে।

২। বেদের ভাবপক্ষীয় প্রমাণ আভ্যন্তরিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগীরা এই পথের নেতা। বৈশেষিক দর্শনকার

কণাদ তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ধর্ম্ম কি, তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। বেদমতে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ নিয়ম। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম শব্দ এই বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্ম সাংসারিক নিয়ম, আহারের নিয়ম, সংযমের নিয়ম, পারিবারিক নিয়ম—যে সমস্ত নিয়ম আত্মাকে পরমার্থপথে নিয়োজিত, শাসিত ও উদ্বোধিত করে, সেই সমস্ত নিয়মই হিন্দুধর্ম্ম। সর্ব্ববিধায়ে ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিয়মিত করে। নিয়মিত করে কি অভিপ্রায়ে? মনুষ্যকে নিঃশ্রেয়স পথে আনিবার জন্য। তাই বৈশেষিক দর্শনকার বলিলেন :—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

যদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়স সাধন হয়, তাহাই ধর্ম্ম। নিঃশ্রেয়স কি? নৈয়ায়িকদিগের মতে অপবর্গই নিঃশ্রেয়স। তবে অপবর্গ কি? আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নাম অপবর্গ। ন্যায় দর্শনে তাহা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, মিথ্যাজ্ঞান নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। প্রবৃত্তি নাশে জন্ম নষ্ট হয়। জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয় এবং এই দুঃখের নাশেই অপবর্গ লাভ। অপবর্গই নিঃশ্রেয়স এবং পরম পুরুষার্থ।" বাৎস্যায়ন।

নৈয়ায়িকেরা নিঃশ্রেয়স কি তাহা বলিয়া সেই নিঃশ্রেয়স লাভের সাধন প্রণালীও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কণাদ বলেন, এই নিঃশ্রেয়স লাভ করাই ধর্ম্ম। নৈয়ায়িকেরা বলিলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই ধর্ম্ম লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান কি? তত্ত্বসকল নিরূপণ করাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্ব কি, তাহা দর্শনকারেরা বিবৃত করিয়াছেন। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই আত্মজ্ঞান জন্মে। আত্মার সহিত জগতের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ জানিলে যে বিবেকোদয় হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান। এই বিবেকোদয় শুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান নহে। তাহা যোগোপলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। শাস্ত্রজ্ঞানের পরিপাক সাধন হইলে যখন তাহা আত্মাতে উপলব্ধ হয়, তখনই তাহা বিশিষ্ট-জ্ঞান বা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতে ক্রমে বিবেকোদয় হয়। বিবেকোদয়ে প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়। এই আত্মজ্ঞান লাভে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়। এই আত্মজ্ঞান অনুষ্ঠানের ফল। তুমি মহর্ষিগণ-নির্দ্দিষ্ট যোগ পথ অবলম্বন করিয়া অষ্টসাধন কর, সিদ্ধ হইবে; সিদ্ধ হইয়া বেদোক্ত বাক্যের সত্য উপলব্ধি করিবে। এই জন্য কপিল বলিয়াগিয়াছেন, বেদ স্বতঃপ্রামাণ্য।

"নিজ শক্ত্যাভিব্যক্তঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং।"

নিজ শক্তিতে বেদ অভিব্যক্ত হইয়া আপনাকে আপনি সপ্রমাণ করে। এই শক্তি যোগবল। যোগবলে বেদ স্বতঃই প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হয়। বেদের অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। এই যোগধর্ম্মে বেদের সত্য প্রতীয়মান বলিয়া কণাদ বলিতেছেন:—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"

ধর্ম্মের বচন হইতে বেদের প্রামাণ্য। ধর্ম্মই বেদকে প্রমাণ করিতেছে। যে ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়স সাধন করে, সেই ধর্ম্ম বেদকে প্রমাণ করে। শঙ্কর মিশ্র এ সূত্রের এইরূপ অর্থ করেন। কারণ, তাহা ধর্ম্মব্যাখ্যার পর সূত্রেই কথিত হইয়াছে।

কিন্তু কেহ কেহ "তদ্বচনাৎ" পদের অর্থ "ঈশ্বরবচনাৎ" বলিয়া অর্থ করেন। কারণ দার্শনিক ভাষায় তদ্ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে ঈশ্বরকে বুঝায়। তদ্ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে ঈশ্বরবাচক হইলেও আমরা এস্থলে তাহার পক্ষপাতী নহি। কারণ, কণাদ তাঁহার দর্শনের অন্য কোন স্থলে ঈশ্বরের নাম মাত্র করেন নাই। তিনি এক অদৃষ্টশক্তি স্বীকার

করিতেন। যাহা মনুষ্যের সামান্য চক্ষে দৃষ্ট নহে, সেই অদৃষ্টশক্তি যিনি স্বীকার করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবাচক ঈশ্বর মানিবার প্রয়োজনই বা কি ? সুতরাং যিনি অদৃষ্টবাদী ছিলেন, তিনি তদ্ শব্দ ঈশ্বরকে বুঝাইবার জন্য যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এমত যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন যে "তদ্বচনাৎ" এ কথা ১ম সূত্রে লিখিত ধর্ম্মবচনের পরেই স্থাপিত হওয়াতে সেই ধর্ম্মবচনই বুঝাইবে। অতএব, শঙ্করমিশ্রের অর্থ গ্রহণ করিলেই বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, কণাদ মোক্ষধর্ম্মকেই বেদের প্রামাণ্য বলিয়া গিয়াছেন।

কৈবল্যদায়ক মোক্ষধর্ম্মই যে বেদের প্রামাণ্য, তাহা সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগে প্রতীয়মান। এই দুই যোগ-পথের প্রধান বিভিন্নতা "প্রণিধানের" অবলম্ব লইয়া। সাংখ্যযোগ বিনা ঈশ্বরাবলম্বে যোগ সাধন করে, পাতঞ্জল যোগের প্রধান অবলম্ব ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর কিরূপ ? তাহা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবাচক ঈশ্বর নহে, যোগের ঈশ্বর যোগের বিষয়ীভূত পুরুষ। তাহা :—

"ক্লেশকর্ম্মাবিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

যিনি ক্লেশের হেতু অবিদ্যা এবং কর্ম্ম-ফলের অতীত বা নির্লিপ্ত পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর।

যে তত্ত্বের জন্য যোগের সাধনা, ঈশ্বর সেই তত্ত্ব। এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইলেই যোগ-সিদ্ধি লাভ হয়। তখন বেদ স্বতঃ সপ্রমাণ হইয়া যায়। বেদে যে মোক্ষপদের কথা লিখিত আছে, তাহার সমুদায় যাথার্থ্য তখন বিলক্ষণ প্রতীত হয়। যোগের প্রমাণ যোগ-সিদ্ধি। যদি তুমি যোগসিদ্ধ হইতে পার, তবে তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, এবং বেদোক্ত মুক্তিলাভ করিয়া আত্মাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ পূর্ণতা দর্শন করিতে পারিবে। যোগসিদ্ধি-তেই আত্মপ্রত্যক্ষ হয়। আত্মপ্রত্যক্ষই যোগের প্রমাণ এবং বেদবাক্যেরও অকাট্য প্রমাণ। হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ বেদ, বেদের প্রমাণ আত্মপ্রত্যক্ষ। অতএব হিন্দুধর্ম্ম আত্ম-প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

৩। বেদের তৃতীয় প্রামাণ্য দার্শনিক অনুমানমূলক। জৈমিনি এই অনুমানতর্কের স্থাপয়িতা। বেদ যে প্রামাণ্য বাক্য, তাহা কি জৈমিনি, কি গৌতম উভয়েই স্বীকার করেন। সে প্রামাণ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়াতে তৎসম্বন্ধে কাহারই বিবাদ নাই। তাঁহাদের বিবাদ বেদের কর্ত্তা লইয়া। বেদের কর্ত্তা কে ? নৈয়ায়িক বলেন, বেদ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত, জৈমিনি বলেন, বেদ যে কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত, এমত প্রমাণ হয় না। নৈয়ায়িকের তর্ক এই ন্যায়াবয়বে আইসে :—

প্রতিজ্ঞা—বেদবাক্য পৌরুষেয়।

হেতু—বেদবাক্য উচ্চারিত বাক্যবিশেষ।

দৃষ্টান্ত—কালিদাসাদির বাক্য।

অতএব, বেদবাক্য পৌরুষেয়।

কিরূপ পুরুষের বাক্য ? বেদবাক্য শব্দ দ্বারা উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহা অবশ্য পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে। কারণ, কোন পুরুষ ভিন্ন শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু যখন এই বাক্য সমুদায় নির্দ্দোষ বাক্য, তখন তাহা অবশ্য অভ্রান্ত বাক্য। স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন এমত অভ্রান্ত বাক্য কেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। ঈশ্বর মানবলীলা পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। এ তর্ক এই ন্যায়া-বয়ব ধারণ করিয়াছে:—

বেদবাক্যান্যাপ্তপ্রণীতানি প্রমাণত্বেসতিবাক্যত্বাৎ মন্বাদি বাক্যবদিতি।'

প্রতিজ্ঞা—বেদবাক্য আপ্তবাক্য।
হেতু—বাক্যত্ব।
দৃষ্টান্ত—মন্বাদি বাক্য।
অতএব, বেদ আপ্তবাক্য।

এ যুক্তি বেদকে প্রমাণ করিবার জন্য নহে, কিন্তু বেদের কর্ত্তা নিরূপণ জন্য। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মীয় পূর্ব্বোক্ত স্বতঃ প্রমাণের আপত্তি এ যুক্তি নিরসনে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

নৈয়ায়িকের এই পৌরুষেয়বাদ সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, তাহাও অপৌরুষেয়বাদে পরিণত হইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের ব্যক্তিত্ব রূপ (Personal God) নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া সকলে তাহা স্বীকার করেন না। তবেই দাঁড়াইতেছে, ঈশ্বর যদি ব্যক্তিত্ব বিরহিত হন, তাহা হইলে বেদ অপৌরুষেয়। জৈমিনি ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। জৈমিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর পুরুষ স্বীকাব কবেন না। যাঁহাব ব্যক্তিত্ব ও শবীরআছে,শরীবেব ব্যবধান বশতঃতাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যকাব কপিলও বলেন, বেদ এমত গ্রন্থাবলি, যাহা কোন ভ্রান্তি-বিশিষ্ট, অমুক্ত, বদ্ধাত্মা কর্ত্তৃক লিখিত হইতে পারে না। আব যিনি শুদ্ধ,বুদ্ধ ও মুক্ত, তিনি সর্ব্ববাসনা পরিশূন্য, এই নিমিত্ত বেদের কর্ত্তৃত্বও তাঁহাতে সম্ভবে না। অতএব বেদ অপৌরুষেয়।

জৈমিনি এই পৌরুষেয়বাদ অন্য এক তর্কেও প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। তিনি বলেন,শব্দ নিত্য; বেদ সেই নিত্য শব্দবিন্যাস মাত্র, এজন্য বেদ নিত্য। বেদ নিত্য বলিয়া আত্মার ন্যায় অপৌরুষেয়। শব্দের নিত্যত্ব সপ্রমাণ হইলেই এ তর্ক দাঁড়াইতে পারে। এজন্য জৈমিনি অনেক তর্কজালে শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্মার্ত্তচূড়ামণি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন এই তর্কের যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। মূলে তাহাব বিস্তৃত বাদ আছে, কাহারও প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা দেখিতে পারেন। মাধবাচার্য্য কৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থেও তাহার কথঞ্চিৎ সমালোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।—

"নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি প্রদান করেনঃ—

(১) "কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ।

শব্দ যত্ন করিলেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ যত্নসাপেক্ষ এবং কর্ম্ম। অতএব, শব্দ নিত্য হইতে পারে না। যেহেতু যাহা নিত্য, তাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকিবে এবং যত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না।

(২) অস্থানাৎ।

শব্দ ক্ষণস্থায়ী, যে সমযে উৎপন্ন সেই সময়েই বিনষ্ট হয়, সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পাবে না।

(৩) করোতি শব্দাৎ।

শব্দং করোতি—শব্দ কবে, এই রূপ ব্যবহার হয় বলিয়া শব্দ নিত্য হইতে পারে না; কাবণ ইহা কৃত।

(৪) সত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ।

এক কালেই নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তিব কর্ণগোচর হইযা থাকে। সুতরাং শব্দ এক ও নিত্য কি রূপে হইবে?

(৫) প্রকৃতি বিকৃত্যোশ্চ।

যে পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল তাহা নিত্য হইতে পারে না। শব্দেরও প্রকৃতি বিকৃতিভাব দৃষ্ট হয়। যথা—দধি অত্র-দধ্যত্র। সুতরাং শব্দ নিত্য নহে।

(৬) বৃশ্চিক কর্ত্তৃভূম্নাস্ত।

শব্দকর্ত্তার সংখ্যাভেদে শব্দের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দশ ব্যক্তি যদি এককালীন গো শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে দশটি গো শব্দ একেবারে উচ্চারিত হইল। সুতরাং মীমাংসকদিগের নিত্যত্ব স্বীকার নিষ্ফল। এইরূপ শব্দের নিত্যত্বে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা পায় না।

মীমাংসকেরা এই আপত্তি গুলির বক্ষ্যমাণ প্রকারে উত্তর দেন। যথা—

(১) সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।

শব্দ নিত্য হইলেও যে সর্ব্বকালে উপলব্ধ হয় না তাহার হেতু এই যে, সর্ব্ব সময়ে উচ্চারণকারী ব্যক্তির সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ থাকে না। গ কার এই শব্দ শ্রবণ করিলেই আমাদিগের এই রূপ জ্ঞান হয় যে, সর্ব্বদা আমরা যে গ কার শ্রবণ করিয়া থাকি ইহাও সেই গ কার, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র গ কার নহে।

(২) প্রয়োগস্থ পরমং।

শব্দং করোতি—এই বাক্যের অর্থ শব্দ নির্ম্মাণ নহে, কিন্তু শব্দের উচ্চারণ মাত্র।

(৩) আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং।

যেরূপ এক সূর্য্য নিকটস্থ এবং দুরস্থ সকল লোকেরই দৃশ্য হইতেছে, তদ্রূপ এক শব্দ বহু ব্যক্তির শ্রাব্য হইতে পারে।

(৪) বর্ণান্তরমবিকারঃ।

বর্ণান্তরকে বর্ণের বিকার বলা উচিত নহে। যেহেতু ইকার স্থানে যকার হইলে বর্ণান্তর প্রয়োগ হইল। ইকারের কোন বিকার হইল না।

(৫) নাদবৃদ্ধিঃ পরা।

দশ ব্যক্তি এক গো শব্দ উচ্চারণ করিলে দশটি গো শব্দ উচ্চারিত হইল বটে; কিন্তু তাহা কেবল নাদবৃদ্ধি মাত্র, শব্দ বৃদ্ধি নহে। এক গো শব্দ একই রহিল। তবে দশবার উচ্চারিত হইল বলিয়া গোলমাল অধিক হইল। অতএব, কোন প্রকারেই শব্দের একত্ব এবং নিত্যত্বের হানি হইতে পারে না; সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব অব্যাহত রহিল। অতঃপর মীমাংসাকার শব্দের নিত্যত্ব-প্রমাণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন :—

(১) নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনাস্ত পরার্থত্বাৎ।

শব্দ উচ্চারিত হইলেই অন্যব্যক্তি ঐ শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন, এজন্য শব্দ অবশ্য নিত্য হইবে। যদি শব্দ নিত্য না হইত,তবে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না। কারণ, শব্দ উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে। এবম্বিধায় উচ্চারণ অবধি অর্থবোধ পর্য্যন্ত শব্দের স্থিতি মানিতেই হইবে, নচেৎ বিষম দোষ ঘটে। এইরূপ শব্দের স্থিতি মানিলেই স্বীকৃত হইল যে, তাহা বস্তু। কোন বস্তুর ঐকান্তিক বিনাশ নাই। স্থিতি মানিলেই শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃপ্রমাণ হইল।

(২) সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে এক শব্দের সমভাবে এবং অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা * করিতে পারেন, যেহেতু শব্দ নিত্য এবং এক স্বরূপ।

(৩) সংখ্যাভাবাৎ।

শব্দের সংখ্যাবৃদ্ধি নাই। একটি গো শব্দের বারম্বার উচ্চারণ করিলে ঐ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত শব্দগুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পরস্পর বিভিন্ন নহে। মস্তকের কেশ কাটিয়া

* প্রত্যভিজ্ঞা—জ্ঞানের প্রতীতি। গ বলিলে কেহ ঘ মনে করেন না। পূর্ব্বকালেও গো শব্দে যে প্রতীতি হইত, আজিও তাহা হইতেছে। তুমি, গ, এই ধ্বনি উৎপন্ন হইলে তাহাকে গ বল কেন? তোমার মনে যে গ শব্দের প্রতীতি আছে, তাহার সহিত মিলে বলিয়া।

ফেলিলে যে নূতন কেশের উদ্ভব হয়, সেই নূতন কেশের মত বারম্বার গো শব্দ উচ্চারিত করিলে প্রতিবার নূতন শব্দের উদ্ভব হইতেছে না, সেই একই গো শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতেছে মাত্র। প্রত্যভিজ্ঞা তাহার প্রমাণ।

(৪) অনপেক্ষত্বাৎ।

শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোন কারণ বা অবলম্বন নাই, সুতরাং শব্দ অনিত্য কেন হইবে?

(৫) লিঙ্গদর্শনাৎ চ।

বেদ সংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। যথা—

বাচা বিরূপ নিত্যয়া।

ঋগ্বেদ ৮মং ৬৪ সূ, ৬ ঋক্।

এইরূপ বহুবিধ যুক্তি দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়া মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেন। বেদ শব্দরাশি মাত্র। শব্দ নিত্য এবং প্রামাণ্য।"

জৈমিনির মতে যখন শব্দ নিত্য, তখন আত্মার ন্যায়, নিত্য শব্দের কল্পে কল্পে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

শব্দ যদি নিত্য হইল, তবে শব্দ-বিন্যস্ত অন্য গ্রন্থ নিত্য নহে কেন? অন্য গ্রন্থ নিত্য নহে এজন্য যে, তাহা কোন না কোন কালে শরীরী মনুষ্যকৃত। যাহা এক বিশেষকালে এবং বিশেষ পুরুষ কর্তৃক রচিত, তাহা নিত্য নহে; এজন্য অভ্রান্তও নহে। শ্রুতিতে এ দোষ স্পর্শ করে না। খ্রীষ্টধর্মীয় বাইবেলাদি গ্রন্থ মনুষ্যরচিত, এজন্য অনিত্য এবং ভ্রান্ত। যাহা নিত্য তাহাই সত্য।

বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া জৈমিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহা নিত্য ও অপৌরুষেয়, তাহা স্বতঃ-প্রমাণ। সেই স্বতঃ-প্রমাণ, জৈমিনি অনুমান তর্কে এই রূপ স্থাপন করিলেন।

(১) স্বতঃ-প্রমাণ বলিলে এমত বুঝাইবে না যে, প্রামাণ্যই প্রামাণ্যের জন্মদাতা। যে হেতু, সেরূপ তর্কে কারণ হইতে কার্য্য এবং কার্য্য হইতে কারণের উদ্ভব বুঝায়। কার্য্য কারণ একই হইয়া যায়। সুতরাং আত্মাশ্রয় দোষ পড়ে।

(২) তাহার অর্থ এমতও নহে যে, স্বাভাবিক সামান্য জ্ঞান সমস্তই প্রামাণ্যের কারণ। যেহেতু, জ্ঞান সমস্ত কারণ হইলে, তাহা উপাদান কারণ (Material cause) বা সমবায়িকারণ হইল। সমবায়ি কারণ অবশ্য দ্রব্য হইবে; কিন্তু জ্ঞান তো দ্রব্য নহে, জ্ঞান গুণ মাত্র। অতএব স্বাভাবিক জ্ঞান প্রামাণ্যের কারণ নহে।

(৩) তবে কি জ্ঞান-সামগ্রীই প্রামাণ্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র? তাহাও নহে। যেহেতু ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানই সকল জ্ঞানের সামগ্রী। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান হয় উপাধি-জ্ঞান, না হয় জাতি-জ্ঞান। উপাধিজ্ঞান কি? যেমন আম্রবৃক্ষ, অশ্বজ্ঞান ইত্যাদি। এস্থলে বৃক্ষ উপাধি; অশ্ব উপাধি। এই উপাধি-জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রকার ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান জাতি-জ্ঞান; যেমন বৃক্ষত্ব জ্ঞান, অশ্বত্বজ্ঞান। এই দ্বিবিধ জ্ঞানেরই অন্য প্রামাণ্যের জনন শক্তি নাই। বৃক্ষত্ব জ্ঞান বলিলে কেবল বৃক্ষেরই প্রামাণ্য হয়। তাহাতে অশ্বত্বের প্রামাণ্য হইতে পারে না। অতএব, জ্ঞানসামগ্রী হইতে সমগ্র বেদের প্রামাণ্য হয় না।

(৪) জ্ঞানসামগ্রী জনিত বিশেষ জ্ঞান কি প্রামাণ্যের আশ্রয়-স্থান? তাহাও নহে। যে হেতু আম্র বৃক্ষ এই একটি বিশেষ জ্ঞান; এই বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে দুই প্রকার জ্ঞান

আছে। প্রথমতঃ, আম্র উৎপাদক বৃক্ষের বিশেষ লক্ষণাদি বিশিষ্ট বিশেষ জ্ঞান: আম্র বৃক্ষ বলিলে কাহারই কদলী বৃক্ষের জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, আম্রবৃক্ষেতে বৃক্ষত্ব আছে। বৃক্ষ বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার সমুদায় লক্ষণ সেই আম্রবৃক্ষে আছে। এই জাতি-জ্ঞানই সামান্য জ্ঞান। সুতরাং সামান্য জ্ঞানও বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্গত। পূর্ব্বেই সপ্রমাণ হইয়াছে, জাতি জ্ঞান বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণ্য হইতে পারে না। আর আম্রবৃক্ষজ্ঞান কেবল আম্র বৃক্ষেরই প্রামাণ্য, তাহা কদলী বৃক্ষের প্রামাণ্য নহে। এজন্য জ্ঞান-সামগ্রী জনিত জ্ঞানবিশেষেও বেদের প্রামাণ্য অধিষ্ঠিত নহে।

(৫) তবে কি বেদের প্রামাণ্য জ্ঞান সামগ্রী মাত্র জন্য হয়? জ্ঞান-সামগ্রীমাত্র জন্যও নহে; যেহেতু বেদ যখন নির্দ্দোষ বাক্য, তখন সেই জ্ঞানের সঙ্গে দোষের অভাব সহকৃত আছে। নির্দ্দোষ জ্ঞান নহিলে বেদের প্রামাণ্য হইবে না। তবেই দোষের অভাব সহকৃত না হইলে প্রামাণ্য জ্ঞান হয় না। স্বাভাবিক জ্ঞান মাত্রই বেদের প্রামাণ্য নহে, তাহা দোষ-রহিত হওয়া চাই। জ্ঞান দোষশূন্য হইতে হইলে তাহার প্রমাণান্তর আবশ্যক। যাহার প্রমাণান্তর আবশ্যক, তাহা পরতঃ-প্রমাণ-সাপেক্ষ। এরূপ পরতঃ-প্রামাণ্য দোষযুক্ত জ্ঞান বেদের প্রামাণ্য হইতে পারে না। পরতঃ-প্রামাণ্যে অনবস্থা দোষ ঘটে।

তবেই জৈমিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন, পরতঃ-প্রামাণ্যের কোনরূপ দোষাশ্রিত জ্ঞান স্বতঃ-প্রামাণ্য নহে। জৈমিনির যুক্তি এই:—

পরতঃ-প্রামাণ্য মাত্র দোষাশ্রিত। তদ্দ্বারা আপ্তবাক্য বেদ প্রমাণিত হয় না। বেদ অপ্রামাণ্যও নহে; যেহেতু তাহা নিত্য সত্য। বেদ অপ্রামাণ্য নহে, পরতঃ-প্রামাণ্যও নহে; অতএব, বেদ স্বতঃ-প্রামাণ্য।

আত্ম-জ্ঞানই বেদ। যাহা অধ্যাত্মজগতের নিত্য নিয়ম, তাহাই বেদ। এজন্যও বেদ নিত্য। আত্মা, বেদ, নিত্যবস্তু ব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ চিন্ময়ত্ব, এ সমস্তের একই প্রমাণ। চিন্ময়-ত্বই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রামাণ্য। সেই চিন্ময়ত্বই বেদ, চিন্ময়ত্বই আত্মা, চিন্ময়ত্বই ব্রহ্ম। বেদ নিত্য শব্দব্রহ্ম *। এই জন্য ব্যাস বলিয়াছেন যে, বেদই ব্রহ্ম †। বেদ নিত্য বলিয়া বৈদিক ধর্ম্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম হইয়াছে।

এই সনাতন ধর্ম্ম যেমন অধ্যাত্ম জগতের নিত্য নিয়মাবলি প্রচার করিতেছে, তেমনি তাহার অভ্রান্ত প্রচারকও দিয়াছে। নিত্য নিয়ম গ্রন্থে আবদ্ধ থাকিলে কি হইবে? তাহা তো মনুষ্য কর্ত্তৃক বিচারিত, উপদিষ্ট এবং গৃহীত হইবে? তোমার বাইবেল, কোরাণ ও ত্রিপিটক বিদ্যমান থাকিলে কি হইবে? ভ্রান্তিবিশিষ্ট মনুষ্য তো তাহা গ্রহণ করিবে? ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্য নিজ মত সমস্তই ক্ষুদ্র করিয়া লইবে। নানাবিধ মনুষ্য তাহাদের নানা ব্যাখ্যা বাহির করিবে। এই নিমিত্ত অসংখ্য সম্প্রদায় হইবারই সম্ভাবনা। তাহাতে মূল বস্তুর বিলক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অন্যান্য ধর্ম্মে এই দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু

---

* গীতায় বেদ শব্দ ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছে।

"জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে।"

৬ অ—৪৪।

ব্রহ্মের রূপ যেমন প্রতিমায় প্রকাশিত, তেমনি মন্ত্রেও অভিব্যক্ত। বেদ মন্ত্র ব্রহ্মময়। বেদজ্ঞান—আত্ম জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান।

† ব্যাস মহাভারতের গোড়াতেই মূলমন্ত্রে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির রূপ মহাবৃক্ষের মূলে আছে—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ বেদ এবং ব্রাহ্মণ।

'মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ'—।

সনাতন ধর্ম্মে তাহা ঘটিবার যো নাই। কারণ, বেদের উপদেশক গুরুগণ সমস্তই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা আত্মজ্ঞানে বেদকে অভ্রান্ত দেখিয়াছিলেন। সেই সিদ্ধপুরুষগণ বেদপাঠ যেরূপে নিয়মিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা বেদার্থের যাথার্থ্য সম্যক্ প্রতীত হয়। অনধিকারী ব্যক্তি বেদপাঠ করিবেন না। বেদপাঠের নিমিত্ত অধিকারী হইতে হইলে পূর্ব্বে তজ্জন্য জ্ঞানাধিকার হওয়া চাই। সেই জ্ঞানাধিকার জন্মিলে তবে নিয়মমত পাঠ করিতে হইবে। অনধিকারী ব্যক্তি বেদের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ। সেই তাৎপর্য্য গ্রহণের নিমিত্ত বেদোপদেশকগণ বেদাঙ্গ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই বেদাঙ্গ ছয় প্রকার—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ। এই বেদাঙ্গে বেদপাঠের নিয়ম সমস্ত প্রকাশিত আছে। তাহারাই বেদের চক্ষু স্বরূপ। সেই চক্ষু ব্যতীত বেদকে দেখিলে বেদার্থের প্রতীতি হইবে না। তুমি অনধিকারী, তুমি পাঠ করিতে যাও, তোমার চক্ষে সমস্ত বিকৃত, বিশৃঙ্খল, বিসম্বাদী বোধ হইবে। কিন্তু অধিকারী হইয়া ঐ ছয় চক্ষু দিয়া বেদ পাঠ কর, বেদকে নির্দ্দোষ দেখিতে পাইবে। যাঁহারা বেদের দোষ দেখিতে পান, তাঁহারা অনধিকারী এবং যথানিয়মে বেদপাঠ করেন নাই।

অন্যান্য ধর্ম্মে আপ্তবাক্য আছে, একথা যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই আপ্তবাক্যের অভ্রান্ত উপদেশক কই? সেই অভ্রান্ত গুরূপদিষ্ট আপ্তবাক্য বুঝিবার অভ্রান্ত পথ কই? সেই আপ্তবাক্য বুঝিবার জন্য যে জ্ঞানাধিকার আবশ্যক, সে জ্ঞানাধিকার কিসে জন্মিবে? যাঁহারা সে আপ্তবাক্যের প্রমাণ, তাঁহাদের প্রত্যক্ষে কিছুই উপলব্ধ নহে। সুতরাং তাঁহারা অভ্রান্ত ভাবে কিরূপে উপদেশ দিবেন? তাঁহাদের অনুমান মাত্র প্রমাণ। কিন্তু সে অনুমানের প্রমাণ কি? আপ্তবাক্য থাকিলে কি হইবে? অভ্রান্ত উপদেশক বিহনে সে আপ্তবাক্য সাধারণ জনসমাজে ভ্রমবিহীন হইতে পারে না।

বেদে যে মুক্তিপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই বেদ প্রতিপন্ন। সেই মুক্তিপথে আসিবার সময় যোগী যখন যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন, তখন তিনি সমাবিষ্ট হইয়া বেদের সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকেন। তখন তিনি ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া ত্রিকালজ্ঞ হয়েন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হয়। যোগী জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বজন্ম পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান দেখিতে পান। তখন তিনি কর্ম্মফলবাদের সত্যতা উপলব্ধি করেন।

হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফলবাদ ইহজন্মে সামান্য বুদ্ধিতেও প্রতীত হয়। জীবের স্বাভাবিক পার্থক্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেরই প্রমাণ। লোকে যাহা অদৃষ্ট শক্তি বলে, তাহাও এই কর্ম্মফলবাদের প্রমাণ। লোকের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বাভাবিক পার্থক্য আর কিসে মীমাংসিত হয়? সদ্যোজাত শিশুর হাস্য ক্রন্দন ও ক্রীড়াদি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারাধীন বলিয়াই প্রতীত হয়। কিন্তু এ সমস্ত কথা অনুমানমাত্র। চূড়ান্ত প্রমাণ যোগের আত্মপ্রত্যক্ষ।

বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড মুক্তি-পথের সোপান মাত্র। তাহাদিগকে সেই ভাবেই দেখা উচিত। বেদের ব্রহ্মবিদ্যা তদ্রূপ নানা আকারে প্রথম অধিকারীর নিমিত্ত বিবৃত হইয়াছে। নানাদেবদেবী নির্গুণ পরব্রহ্মের বিশ্বরূপের প্রতিরূপ মাত্র—যে বিশ্বরূপে তিনি প্রথম অধিকারীর নিকট ব্যক্ত—যে বিশ্বরূপ ধরিয়া উপাসক ক্রমে নিস্ত্রৈগুণ্যে

উঠিতে পারেন। এজন্য হিন্দুধর্ম্মে সগুণ ও সাকার * এবং নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমস্ত উপাসনা পথের সর্ব্বশেষ পরিণাম মুক্তি হওয়াতে তাহারা বিভিন্ন হইয়াও একই হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদক হইয়াছে। বেদ ও হিন্দুধর্ম্ম এই ব্রহ্মেরই সাক্ষীস্বরূপ। সুতরাং বেদ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে। যাহা ব্রহ্মস্বরূপ তাহা আত্মজ্ঞানে প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্বতঃপ্রামাণ্য। হিন্দুধর্ম্মে এই জন্য ব্রহ্মের প্রমাণ দেবলীলা নহে, কিন্তু দেবলীলার প্রমাণ ব্রহ্ম হইয়াছে। কারণ, হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মেরই রূপ মাত্র, পরব্রহ্ম বিশ্বরূপে অবস্থিত এবং বিশ্বরূপেই লীলা করিতেছেন।

এক্ষণে বোধ হয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য ত্রিবিধ—পৌরাণিক, দার্শনিক এবং যোগসিদ্ধ। জনসমাজের জ্ঞানাধিকার ভেদোপযোগী এই ত্রিবিধ প্রমাণ। যাঁহারা পৌরাণিক প্রমাণে পরিতুষ্ট নহেন, তাঁহারা নৈয়ায়িকের অনুমান গ্রহণ করিতে পারেন, যাঁহারা সে প্রমাণেও পরিতুষ্ট নহেন, তাঁহারা মীমাংসকের অনুমান অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের কাছে, পৌরাণিক ও আনুমানিক প্রমাণ, এই উভয়বিধ প্রমাণই দুর্ব্বল, তাঁহাদের জন্য যোগপথের প্রামাণ্য। হিন্দুধর্ম্মের এই প্রমাণত্রয় অন্য কোন ধর্ম্ম প্রণালীতে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই বিশেষ উপযোগী। যোগপথের প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের আর উৎকৃষ্ট প্রমাণ নাই। এই প্রামাণ্য আর কোন ধর্ম্মে নাই। এ প্রামাণ্য কাহারও অগ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ হিন্দু ধর্ম্ম বলিতেছেন, যোগপথ ত পড়িয়া রহিয়াছে, যোগ করিয়া দেখ, হিন্দুধর্ম্ম স্বতঃই সপ্রমাণ হইয়া যাইবে। তৎপূর্ব্বে, হিন্দুধর্ম্মকে অপ্রামাণ্য বলিবার যো নাই। বেদ প্রামাণ্য হওয়াতে তদনুসারী সমস্ত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র প্রামাণ্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

* হিন্দুধর্ম্মে সাকার উপাসনা দ্বিবিধ, সূক্ষ্ম বা মানসিক সাকার এবং স্থূল বা বাহ্য সাকার। উভয়বিধ সাকারই সগুণ ঈশ্বরের শক্তিরূপ মাত্র। মন্ত্র ও প্রতিমা সগুণ ব্রহ্মের শক্তিরূপ। মন্ত্র মানস রূপের বিকাশ, প্রতিমা মন্ত্রের বিরাট বিকাশ।

মাংসাদ উদ্ভিদ।

আজ প্রায় দশ বৎসর হইল, আমরা শীর্ষস্থ আখ্যায় একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। ইহার কিয়দংশ ভারতীর কোন দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টাংশ আজও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সম্প্রতি ভারত-বিজ্ঞান-সভার সুপ্রশস্ত গৃহে এতৎ সম্বন্ধে Dr. S. B. Mitra, B. Sc., M.B. (London) একটি অতি সুন্দর, সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী ইংরাজী বক্তৃতা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকগণের জন্য, যদি আমরা মাংসাদ উদ্ভিদ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করি, বোধ হয় আমাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইবে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পুনর্ল্লিখিত হইল।

আমেরিকার উদ্ভিদবেত্তা কার্টিস্ ও

কর সর্ব্বপ্রথমে (১৮৩৪ খৃঃ অব্দে) উদ্ভিদদিগের এই জান্তব ধর্ম্মের অর্থাৎ জন্তুর ন্যায় আহার ক্রিয়ার উল্লেখ করেন। ইহার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, স্বনাম খ্যাত উদ্ভিদবেত্তা হুকার উদ্ভিদদিগের এই নবাবিষ্কৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃটিশ য়্যাসোসিয়েশনে প্রথম আধিবেশনিক বক্তৃতা করেন। হুকারের পূর্ব্বে পণ্ডিত গ্রে উল্লিখিত আমেরিকান উদ্ভিদবেত্তাদ্বয়ের মত সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত মাংসাদ উদ্ভিদ একটি কৌতূহলাবহ বিষয় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ইহার পর প্রকৃতি-তত্ত্ববিশারদ অমর চার্লস ডারউইন অবিশ্রাম পঞ্চদশ বর্ষ পতঙ্গ ভোজী কতক গুলি প্রধান প্রধান উদ্ভিদ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক ও সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্বকীয় অভিজ্ঞান পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে, মাংসাদ উদ্ভিদ, বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক—সাধারণের পরিচিত হইয়াছে।

মাংসাদ উদ্ভিদগুলি সাধারণতঃ আমেরিকা, ইয়ুরোপ ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির স্থানে স্থানে জন্মিয়া থাকে। অবশ্য সকল বিভাগ (Order) বা সকল বংশের (Species) মাংসাদ উদ্ভিদ কোন এক দেশে পাওয়া যায় না। তবে আমেরিকায় অধিকাংশ গুলি পাওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষে সচরাচর দুই তিন প্রকারের মাংসাদ উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক প্রকার অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা যথা স্থানে তাহার বিষয় উল্লেখ করিব। মাংসভোজী উদ্ভিদগণ প্রায় সকলেই অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ও জলা স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটী প্রধান প্রধান ও সুপরিচিত মাংসাদ উদ্ভিদের বিবরণ প্রদান করিব। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রবন্ধ বর্ণিত মাংসাদ উদ্ভিদগুলির মধ্যে কাহার কাহারও এক একটী পত্রের ছবি দেওয়া হইল।

সূর্য্যশিশির। ইহার ইংরাজী নাম ড্রুসেরা। ইহা ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের সিকিম, আসাম, বর্ম্মা, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, মগরা, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি স্থানের বালুকাময় স্থানে ও জলাভূমিতে পাওয়া যায়*। ইহার পত্রগুলি গোলাকার ও ক্ষুদ্র; মূলের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃন্তদ্বারা সংলগ্ন হইয়া মৃত্তিকার উপরেই অবস্থান করে। বস্তুতঃ ইহাদের কাণ্ড একেবারেই নাই বলিয়া, পত্রগুলি যেন মাটির সহিত মিশাইয়া থাকে। পুষ্প বিকাশের কালে মূলদেশ হইতেই একটি শীষ উত্থিত হয় এবং ইহার শিরোদেশে পুষ্প বিকাশ হয়। এইরূপ শীষ উঠিলে কোন কোন সূর্য্যশিশির অর্দ্ধ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, কিন্তু সাধারণতঃ শীষ এত বড় হয় না। উচ্চতার গড় চার পাঁচ ইঞ্চি হইয়া থাকে। পত্রের উপরিভাগের সমুদয় অংশ শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশে পূর্ণ। প্রত্যেক কেশের শিরোদেশে একটি করিয়া কোষ-গ্রন্থি (Gland) থাকে। এই কোষ-গ্রন্থি বেষ্টন করিয়া শীত, বাত, গ্রীষ্ম সকল কালেই প্রাকৃতিক শিশির কণার ন্যায় সুনি-

* গত বৎসর শীতকালে আমরা ড্রুসেরার অন্বেষণে মগরা ও বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। বর্দ্ধমানে দুই দিবস ও মগরায় একদিবস পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জলা, মাঠ, নদীতীর, বালুময় স্থান এবং অন্য নানা স্থান অন্বেষণ করিয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ একটিও ড্রুসেরা দেখিতে পাই নাই। সম্ভবতঃ সে সময় ড্রুসেরা জন্মিবার সময় নয়। আরো একটু বিলম্বে অর্থাৎ বসন্তের প্রারম্ভে বা মাঝামাঝি সময়ে হয় ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ওয়াট হুগলী, মগরা, বর্দ্ধমান এই তিন স্থানেই ড্রুসেরা পাইয়াছিলেন।

র্ম্মল কিন্তু চট্‌চটে একবিন্দু নির্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যোদয় হইলেও এই নির্যাস বিন্দু অদৃশ্য হয় না। এই নিমিত্ত ইংরাজী চলিত ভাষায় এই উদ্ভিদ "সূর্য্যশিশির" (Sun-dew) নামে আখ্যাত। সূর্য্যশিশির পত্রের কিনারার কেশগুলি মধ্যস্থ কেশ নিচয় অপেক্ষা দীর্ঘতর ও ঈষৎ বেগুণে বর্ণের। ডারউইন এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশ গুলিকে উত্তেজনীয় বা অনুভব শক্তি বিশিষ্ট শুয়া (Sensitive tentacles) বলেন। * সূর্য্যশিশির পত্রের শুয়াগুলির স্পর্শানুভব শক্তি এত তীক্ষ্ণ ও প্রবল যে, যদি ক্ষুদ্রতম মশকের ক্ষীণতম চরণ কোন একটি কেশের শীর্ষস্থ শিশির কণা স্পর্শ করে, উক্ত কেশটি তৎক্ষণাৎ তাহা অনুভব করিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক গ্রেণের ৭৮,৭০০ অংশ পরিমিত ভার, যাহা স্থূল কথায় বলিতে গেলে অনন্তগুণে অল্প ভার, অর্থাৎ যাহা কিছুই নয় বলিলেই হয়, শুয়ার শিশিরোপরি সংন্যস্ত হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ তাহা অনুভব করিয়া আনত বা বক্র হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও একদিকে এত সামান্যতম ভারেই ইহা উত্তেজিত হইতে পারে বটে, অপরদিকে অপেক্ষাকৃত একটু গুরুভার অর্পিত হইলে ইহা তাহাতে অনুত্তেজিতই থাকে। এই নিমিত্ত বায়ুসঞ্চালনে কি বৃষ্টি পতনে কি অন্য নানা কারণে আলোড়িত হইলেও শুয়া তাহা গ্রাহ্য করে না অর্থাৎ তাহাতে উত্তেজিত হয় না।

কোন ক্ষুদ্র কীট বা মক্ষিকা সূর্য্যশিশিরের কোন একটী শুয়ার শিশির কণার উপর বসিলেই প্রথমে আঠাতে জড়িতহইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এদিকে সেই শুয়া বা কেশ গাছি ধীরে ধীরে বাঁকিতে আরম্ভ করে এবং তৎসঙ্গে অপর কেশগুলিও বাঁকিতে থাকে। এই বাঁকিবার সম্বন্ধে দুটি প্রধান নিয়ম দেখা যায়। একটী এই যে, যদি মক্ষিকা পত্রের মধ্যদেশস্থ কোন কেশের শিশিরে বসে, তাহা হইলে উক্ত কেশের কোষগ্রন্থি এমনি একটি শক্তি চতুঃপার্শ্বস্থ কেশনিচয়ে সঞ্চালিত করিয়া দেয় যে তদ্দ্বারা উত্তেজিত হইয়া উক্ত কেশ নিচয় বাঁকিতে আরম্ভ করে—এবং এরূপ ভাবে ক্রমশঃ বাঁকে যে উহাদিগের কোষ গ্রন্থিগুলি মক্ষিকার উপর আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে কোষগ্রন্থি হইতে প্রচুর পরিমাণে রস নিঃসারিত হইয়া হতভাগা মক্ষিকার উপর বর্ষিত হইতে থাকে। অপরটি এই যে, যদি মক্ষিকা কিনারার কোন একটি কেশের শিশির বিন্দুর উপর বসে, তাহা হইলে সেই কেশটি প্রথমে নুইয়া (পত্রের মধ্য দেশের দিকের) পরবর্ত্তী কেশটিকে, এ কেশ গাছি নুইয়া তৎপরবর্ত্তী কেশটিকে, সেটি আবার নুইয়া তৃতীয় পরবর্ত্তী কেশের উপর মক্ষিকাকে স্থানান্তরিত করিয়া, ক্রমে উহাকে পত্রের মধ্যদেশে লইয়া ফেলে। এখানে পৌঁছিলে পর, পূর্ব্বের ন্যায় চারিদিক হইতে শুয়া গুলি বাঁকিয়া আসিয়া হতভাগ্য মক্ষিকার উপর রস নিঃসরণ করিতে থাকে। এই দুটি নিয়ম হইতে আমরা দেখি যে, যদি মক্ষিকা নিজে পত্রের মধ্যস্থ শুয়াতে আসিয়া না বসে, তবে শুয়াগুলি আপনারা তাহাকে মধ্যদেশে আনিয়া স্থাপন করে। ইহার পর পত্রের মধ্যদেশও ক্রমশঃ একটু গর্ত্তের মত হয়। সমুদয় শুয়াগুলি বাঁকিতে ও পত্র-মধ্যদেশ একটু গর্ত্তের মতন হইতে ৮ ঘণ্টা হইতে

* আমরা এই প্রবন্ধে 'অনুভব' শব্দটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলাম। প্রচলিত সংজ্ঞা বা বোধ পরিজ্ঞাপক অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই।

১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে। কীটেরা নিঃসারিত অম্লরসে ডুবিয়া ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই মরিয়া যায়। আমাদের ছবিতে একদিককার শুয়াগুলিকে আনত ও অপর দিকের শুয়াগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে দেখান হইয়াছে। ছবি দেখুন।

বস্তু বিশেষ অনুসারে সূর্য্যশিশির পত্রের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ কালের ব্যবধানের তারতম্য হইয়া থাকে। যবক্ষারজান যুক্ত পদার্থ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেই ইহার সঙ্কোচন কাল সুদীর্ঘ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে দশ দিবসের মধ্যেও পুনঃ প্রসারিত হয় না। কিন্তু যদি স্পৃষ্ট পদার্থ যবক্ষারজান বিহীন হয়, যেমন, অঙ্গার, শৈবাল, কাগজ ইত্যাদি, তাহা হইলে শীঘই, ১৭।১৮ ঘণ্টার মধ্যে পাতা খুলিতে আরম্ভ করে। একবার কুঞ্চিত হইয়া পুনঃ প্রসারিত হইবার সময় রসনিঃসরণকারী কোষ-গ্রন্থি সমূহ রস নিঃসরণ করে না; পত্রপৃষ্ঠ শুষ্কভাব ধারণ করে। পরে যখন পাতাটি সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া পড়ে, তখন কোষ-গ্রন্থিগুলি পুনরায় রস জমাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রত্যেক গাছি কেশের মস্তকে শিশির বিন্দুটি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইলে, সূর্য্যশিশির পত্রটি দ্বিতীয়বার মক্ষিকা সংহারে সক্ষম হয়। একটি পত্র দুই চারি বারের অধিক ঈদৃশ ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হয় না। তদনন্তর ইহা শুষ্ক হইয়া যায় এবং নূতন পত্র তৎস্থানাধিকার করে। যদিও এত অল্পে অল্পে সূর্য্যশিশির পত্রের কীট-সংহারী-কার্য্য সাধিত হয় বটে, তাহা হইলেও একটি গাছ দ্বারা বড় অল্প সংখ্যক কীট নষ্ট হয়না। ডারউইন একটী পত্রে ত্রয়োদশটি মক্ষিকার মৃতাবশেষ দেখিয়াছিলেন। সুতরাং যদি আমরা মনে রাখি যে একটি সূর্য্যশিশিরের সচরাচর ছয়টি, সাতটি পাতা থাকে, এবং সূর্য্যশিশিরও প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাহা হইলে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি সূর্য্যশিশির কত শত কীট নাশ করিয়া থাকে।

জীব শরীরে যে মূলপ্রণালীতে মাংস কিম্বা তৎসদৃশ পদার্থ ভুক্ত হইবার পর দ্রবীভূত হইয়া শরীর সাধনোপযোগী উপাদানে পরিণত হয়, ঠিক সেই উপায়ে সূর্য্যশিশিরের পত্রোপরি মাংস বা কীটদেহ পরিপাক অর্থাৎ দ্রবীভূত হইয়া উহার দেহ পোষণের সাহায্যতা করে। পাঠকেরা জানেন মাংস হজম করিবার জন্য দুটি প্রধান উপাদান আবশ্যক। একটি, অম্লরস; অপরটি পেপসিন নামক এক প্রকার ফার্মেণ্ট। এই দুইয়ের কোন একটির অভাবে, মাংস বা য়্যালবিউমেন ঘটিত পদার্থ জীর্ণ হইবার নয়। জন্তু শরীরে মাংস পাকস্থলীতে উপস্থিত হইয়া, একপ্রকার অম্লরস ও পেপসিন নামক ফার্মেণ্টের সমবেত কার্য্য দ্বারা জীর্ণ হইয়া জলবৎ হয়, এবং ইহাই পাকস্থলীর গাত্রস্থ অসংখ্য কোষ-গ্রন্থি দ্বারা শোষিত হইয়া এবং পরে রক্তের সহিত মিশিয়া শরীর পোষণ করে। সূর্য্যশিশিরের পত্রোপরি কোষ-গ্রন্থি বিশিষ্ট বহুল শুয়া হইতে যে রস নিঃসৃত হইয়া কীটদেহকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে, সেই রস অম্লাক্ত। এই অম্লাক্তরসে কীটদেহ বা মাংস ক্ষণকাল থাকিলেই পেপসিন ফার্মেণ্ট উপজিত হয়। অতঃপর, অম্লরস ও পেপসিন সহযোগে কীটদেহ দ্রবীভূত হইয়া পড়ে। এই দ্রবীভূত কীটদেহ পত্রপৃষ্ঠস্থ উল্লিখিত শত শত কোষ-গ্রন্থি দ্বারা শোষিত হইয়া সূর্য্যশিশির দেহের পোষণকার্য্য সমাহিত হয়।

প্রকৃত পরিপাক ক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। এইজন্য যবক্ষারজান বিহীন পদার্থ সহ শুয়া-

হইলে পত্র শীঘ্রই পুনরুন্মুক্ত হয়। কিন্তু জান্তব-পদার্থ-সহ আকুঞ্চিত হইলে পুনঃ প্রসারণ বিলম্ব সাপেক্ষ। ডারউইন সূর্য্যশিশিরের এই ব্যবহার দেখিয়াই প্রথমে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, হয় ত সূর্য্যশিশির জন্তুদিগের ন্যায় উহার আহার্য্য সামগ্রী পরিপাক করিতে পারে। পরে বহুল পরীক্ষা দ্বারা স্বীয় অনুমানকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যশিশির বাস্তবিক পরিপাক করে কি না এবং কি রকম পদার্থ পরিপাক করিতে পারে, ইহা নিশ্চয় জানিবার জন্য ডারউইন নানাবিধ খাদ্য ব্যবহার করিতেন। ডিম্বের শ্বেতাংশ, অপক্ক ও পক্ক মাংস, বিড়ালের কাণের টুকরা, কুকুরের দাঁতের চোকলা, সিদ্ধ কপি, পনীর, পুষ্পরেণু, মানুষের নখের টুকরা, বেঙের অস্ত্রের ছিলকে, মানুষের মাথার চুল ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থ দিয়া নিঃসংশয়িতরূপে দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যশিশির যবক্ষারজান সম্বলিত পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই পরিপাক করিতে পারিত না। জন্তু-শরীর-ধর্ম্মের সঙ্গে সূর্য্যশিশিরের আর একটী বিশেষ সাদৃশ্য এই যে, চর্ব্বি, তৈল, পত্রের সবুজ অংশ (Chlorophyll), শ্বেতসার (Starch), মূত্র প্রভৃতি যবক্ষারজান সংযুক্ত পদার্থ যেমন জন্তুর পাকস্থলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ জীর্ণ হয় না, সেইরূপ সূর্য্যশিশির কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যশিশির মাংসাদ বলিয়া যে একেবারেই মাংস ভিন্ন উদ্ভিদ সম্পর্কীয় কোন পদার্থ গ্রহণ করে না, এমত নহে। সূর্য্যশিশির-পত্র দিবানিশি প্রসারিতই থাকে; অন্য অনেক উদ্ভিদের পত্রের ন্যায় রাত্রিকালে মুদ্রিত হয় না। এই জন্য কীট পতঙ্গ ব্যতীত অন্য অনেক জিনিসের উহার উপর পড়িবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ বায়ু সহযোগে অনেক পুষ্পরেণু ও বীজ শুয়ার উপর আসিয়া পড়ে এবং উহাকে উত্তেজিত করিয়া রস নিঃসারণ করায়। এই রসে নিমজ্জিত হইয়া পরাগ বা বীজ উহার যবক্ষারজান অংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং তাহাই পত্রের আহার্য্য হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, পক্ক অর্থাৎ সিদ্ধ শাক সবজি, কপি, ইহারা পরিপাক করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং সূর্য্যশিশির আমাদের অনেকের ন্যায় আমিষ ও নিরামিষ উভয়ভোজী। অপক্ক মাংস বা পনীর অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে, অনেক পেটুক মনুষ্যের ন্যায়, সূর্য্যশিশিরও অতিভোজন দোষে অকালে মরিয়া যায়।

কেহ কেহ বলিতেন যে সূর্য্যশিশির হয় ত মক্ষিকা ও কীট ধরিয়া, ঔষধের ন্যায় তাহাদের মাংস গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সন্দেহ মীমাংসা করিবার জন্য ফ্রান্সিস ডারউইন (চার্লস ডারউইনের পুত্র) কয়েক বৎসর হইল কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন: জার্ম্মেণির কতিপয় পণ্ডিতও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সকলেই পরীক্ষা লব্ধ অভিজ্ঞান-বলে মুক্তকণ্ঠে ও সুদৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন, সূর্য্যশিশিরের কীট পতঙ্গ সংহার ক্রিয়া ঔষধ সেবনার্থ নহে, শরীর পোষণের জন্য। ফ্রান্সিস ডারউইন দুটি স্বতন্ত্র সুপ-প্লেটে কতকগুলি সূর্য্যশিশির রাখেন। পাছে উড্ডীয়মান মক্ষিকা বা কীট কোন গাছের পত্রের উপর পড়িয়া পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মায়, এইজন্য উভয় প্লেটস্থ গাছগুলিকে সর্ব্বক্ষণ সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন। দুটি প্লেটের গাছগুলির অন্যান্য সব অবস্থা সমান ছিল। কেবল, একটি প্লেটের

গাছগুলিকে সিদ্ধ মাংস খাওয়াইতেন, অপরটির গাছগুলিকে অভুক্ত রাখিতেন অর্থাৎ তাহারা অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত। যথাসময়ে দুই পাত্রস্থ সূর্য্যশিশিরগুলি পুষ্পিত হইল। সমুদয় ফলগুলিও পরিপক্ক হইল। তখন দেখা গেল, ভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরগুলিই অপেক্ষাকৃত সতেজ ও বড় এবং বীজ সংখ্যায় ভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরের বীজই বেশী; অভুক্তের অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ অধিক। আর ভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরের বীজগুলি অভুক্তমাংস সূর্য্যশিশিরের বীজাপেক্ষা চারিগুণ ভারী। এই চরম ফল দেখিয়া বোধ হয় কেহ আর সন্দেহ করিতে সাহসী হইবেন না, কীট পতঙ্গ সূর্য্যশিশিরের ভোজ্য কি ঔষধ। যদি ঔষধই হইত, তাহা হইলে ভুক্তমাংস সূর্য্য শিশির কখনই এত অধিক পরিমাণে এরূপ সারবান্ বীজ প্রসব করিত না। আমরা যদি স্মরণ রাখি যে, সারবান ও অধিক সংখ্যক বীজোৎপাদন করাই এ সংসারে- যেখানে সকলেই বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ব্যস্ত, যেখানে কেবল যোগ্যতমদেরই উদ্বর্ত্তিত, দীর্ঘজীবী, ও স্বকীয় বংশ স্থায়ী করিবার সবিশেষ সম্ভাবনা— প্রত্যেক জন্তু বা উদ্ভিদের পক্ষে নিতান্তই দরকার, তাহা হইলে সহজে বুঝিতে পারি যে, সূর্য্যশিশির মক্ষিকা ও কীট বধ করিয়া অপেক্ষাকৃত সারবান্ ও পুষ্টিকর আহার করে কেবল নিজের পুষ্টিসাধন জন্য এবং নিজের বংশের কল্যাণের জন্য, অন্য কোন কারণের জন্য নহে।

মক্ষিকাপাশ। ইহা ড্রসেরা অর্থাৎ সূর্য্য শিশির পরিবারান্তর্গত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ডাইওনিয়া এবং ইংরাজী চলিত নাম Venus' fly trap "মক্ষিকাপাশ"। (ছবি দেখুন।) ইহা উত্তর কারোলিনার পূর্ব্বাংশেই কেবল পাওয়া যায়; সূর্য্যশিশিরের ন্যায় আর্দ্রস্থান ও জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহার কাণ্ড নাই; পাতাগুলি মূল হইতেই উঠিয়া থাকে। পত্র সদৃশ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও লম্বা বোঁটার পর পাতাটি অন্য সাধারণ পত্রের ন্যায় দুই অংশে (lobes) বিভক্ত হয়। পত্রের একটি অংশ অপরটির সহিত প্রায় সমকোণ করিয়া খাড়া থাকে। পত্রাংশের কিনারা খাঁজ কাটা কাটা অর্থাৎ মূষিকহারী জাঁতিকলের যেমন দাড়া বা দাঁত থাকে, মক্ষিকাপাশ পত্রের কিনারায় তেম্নি কিন্তু খুব সরু সরু ও নমনীয় দাঁত থাকে। মূষিক পড়িলে জাঁতিকলের দুটি ভাগ যেমন খাঁজে খাঁজে পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়, মক্ষিকাপাশে পোকা মাকড় পড়িলে পত্রের অংশদ্বয়ও বন্ধ হইবার সময় কিনারার দাঁতগুলি ঠিক তেমনি খাঁজে খাঁজে পড়িয়া বন্ধ হয়। প্রত্যেক পত্রের অংশের উপরিভাগে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুয়া এরূপে উত্থিত হয় যে, যদি রেখা দ্বারা তাহাদের মূলদেশ কি শিরোদেশ পরস্পরের সহিত সংযোজিত হয়, একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত হইবে। শুয়াগুলি প্রত্যেকে এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের অপেক্ষা একটু বড়। এই শুয়াগুলির উত্তেজনীয়তা বা স্পর্শানুভব শক্তি অতি প্রখর ও আশ্চর্য্য জনক। অতি মৃদু ও ধীরভাবে কোন একটি শুয়া স্পর্শ করিলে সমুদয় পাতাটী তৎক্ষণাৎ খাঁজেখাঁজে বন্ধ হইয়া যায়। সূর্য্যশিশিরের শুয়ার ন্যায় ইহার শুয়া কুঞ্চিত বা আনত হয় না। উহা স্পর্শ করিলেই, বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চারের ন্যায় সে স্পর্শন সমুদয় পত্র শরীরকে উত্তেজিত করে এবং নিমেষের মধ্যে পত্রাংশদ্বয় জাঁতি কলের ন্যায় বন্ধ হইয়া পড়ে। সূর্য্যশিশিরের ন্যায়

সূর্য্যশিশির।

মক্ষিকাপাগ।

আলদোভাণ্ডা।

স্থালী উদ্ভিদ।

একটী স্থালী।

(অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত।)
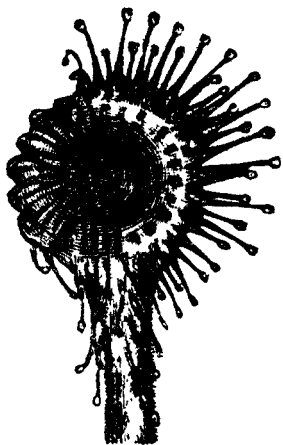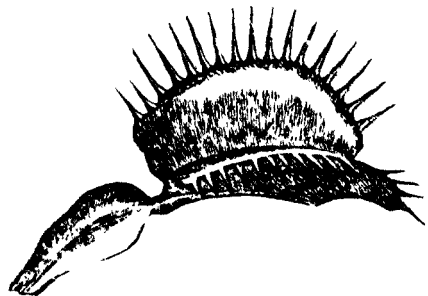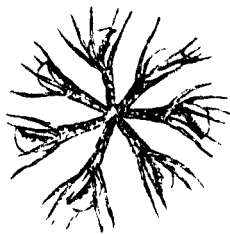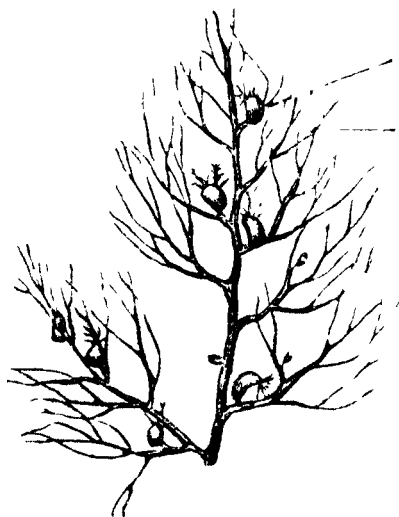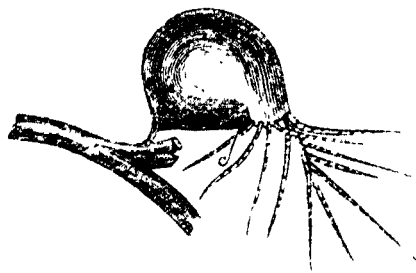
মক্ষিকাপাশের পত্রকার্য্য ধীরে ধীরে সম্পাদিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, সূর্য্যশিশিরের চটচটে শিশিরের উপর বসিলেই ক্ষুদ্র কীট আবদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং ধীরে ধীরে পত্রকার্য্য সম্পন্ন হইলেও শিকারের পলায়নের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। বাস্তবিক, সূর্য্যশিশিরের শিশিরকণার উপর যে কীট একটিবার বসে, তাহার নিয়তির পরিণাম নিতান্তই অতি অদূরে। কিন্তু মক্ষিকাপাশের শুয়াতে তেমন কোন নির্যাস থাকে না; শুয়ার স্পর্শানুভব শক্তিই অতি প্রবল। এই জন্য পতঙ্গ বা মক্ষিকার ক্ষীণতম চরণ-স্পর্শে একেবারে উত্তেজিত হইয়া নিমেষের মধ্যে দুর্ভেদ্য কবাটের ন্যায় বন্ধ হইয়া হতভাগ্য কীটকে হঠাৎ পত্র মধ্যে বদ্ধ করিতে না পারিলে, শিকার সংগ্রহের সম্ভাবনা অতি অল্প। সেই নিমিত্ত মক্ষিকাপাশের পত্র এত সত্বর উত্তেজিত হয় এবং এত হঠাৎ বন্ধ হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র মক্ষিকার বা পতঙ্গের ক্ষীণতম চরণ বা সূক্ষ্মতম পক্ষ সংস্পৃষ্ট হইলেই, তৎক্ষণাৎ জাঁতি কলের ন্যায় সবেগে বন্ধ হইয়া পত্রাংশদ্বয় শিকারকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। একবার আবদ্ধ হইলে হতভাগ্য কীটেরসে ভীষণ কারাবরোধ হইতে পলায়ন করিবার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। আবদ্ধ কীট অতিশয় ক্ষুদ্র হইলে, কখন কখন, পত্রদন্তের সম্মিলন পথের সূক্ষ্মতম ছিদ্র-দ্বার দিয়া টানাটানি করিয়া পলাইয়া থাকে। কখন বা কোন প্রবল কীট পাতা কাটিয়াও পলাইয়া যায়। কিন্তু সচরাচর এরূপ ঘটে না। কারণ পত্রাংশদ্বয় খাঁজে খাঁজে বদ্ধ হইয়া নিবদ্ধ কীটকে চাপিয়া মারিয়া ফেলে এবং পত্রের দুটি অংশ এরূপ দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হয় যে, বল পূর্ব্বক স্বতন্ত্র করিয়া ছাড়িয়া দিলেও পুনর্ব্বার সবেগে ও সশব্দে বদ্ধ হয়।

শুয়ার কার্য্য সম্বন্ধে মক্ষিকাপাশ ও সূর্য্যশিশিরের ভিন্নতা এই যে, মক্ষিকাপাশ মৃদুতম বারেক স্পর্শনেই কার্য্য আরম্ভ করে। সূর্য্যশিশির সামান্যতম কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিকতর কাল স্থায়ী সংস্পর্শনে উত্তেজিত হয়। অতি মৃদু ভাবে ক্ষণকাল ধরিয়া স্পর্শ কর, মক্ষিকাপাশ অনুত্তেজিত থাকিবে; কিন্তু একটি বার অতি ধীরে স্পর্শ কর, পত্র তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত হইবে। দেখা গিয়াছে, এক টুকরা চুল, যাহার দশমাংশ মাত্র সূর্য্যশিশিরকে উত্তেজিত করিয়া আকুঞ্চিত করিতে পারে, যদি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে মক্ষিকাপাশের শুয়ার উপর সংস্থাপিত হয়, উহার পত্র মুদ্রিত হয় না। কিন্তু যদি এক ইঞ্চ পরিমিত কেশ দ্বারা একবার মাত্র স্পৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ পত্রাংশদ্বয় পরস্পরের দিকে আনত হয়। সূর্য্যশিশিরের ন্যায় মক্ষিকাপাশও বৃষ্টিধারা বা বায়ু সঞ্চালনে বা অন্য কোন কারণে বেগে আলোড়িত হইলে মুদ্রিত হয় না।

মক্ষিকাপাশ পত্র যদিও সূর্য্যশিশির পত্র অপেক্ষা অতি শীঘ্র মুদিত হয়, তথাপি উহার পুনঃ প্রসারণ অনেক বিলম্ব সাপেক্ষ। কোন কীট পতঙ্গ না ধরিয়া, অপর কোনরূপ উত্তেজনায় বারেক মুদ্রিত হইলে, পুনঃ প্রসারিত হইতে ৩৮ঘণ্টা লাগে। একটি ছোট গোছের পোকা লইয়া বদ্ধ হইলে ৮।১০ দিবসের কম পুনরুন্মুক্ত হয় না। অনেক সময় একটি পত্র যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সহ মুদ্রিত হইয়া আর প্রসারিত হয় না, ক্রমে শুকাইয়া যায়। সতেজ পত্র স্বদেশে দুই তিনবার মুদ্রিত ও প্রসারিত হয়, এরূপ উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ট্রিট নাম্নী জনৈক আমেরিকান প্রকৃতিতত্ত্ববিদ মহিলা বলেন, মক্ষিকা

পাশ পত্র তৃতীয়বার মক্ষিকা বা পতঙ্গ পরিপাক কালে পরিশ্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়।

পত্রের উপরিভাগ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও ঈষৎ বেগুণে বর্ণের কোষ-গ্রন্থি পূর্ণ। এই কোষ-গ্রন্থিনিচয়ের পরিপাক ও শোষণ ক্ষমতা আছে। যবক্ষারজান সম্বলিত পদার্থ সহ সংস্পৃষ্ট না হইলে কোষ-গ্রন্থি রস নিঃসারণ করে না। সূর্য্যশিশির জান্তব বা অজান্তব যে কোন পদার্থ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেই রস নিঃসরণ করিয়া থাকে। মক্ষিকাপাশ যদি কাষ্ঠ, প্রস্তর, শৈবাল বা কাগজের টুকরা সহ মুদ্রিত হইয়া পুনঃ প্রসারিত হয়, উক্ত পদার্থ শুষ্কই থাকে। কিন্তু যদি এক টুকরা মাংস শুয়াতে না ছোঁয়াইয়া পত্রের উপরেই রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মাংসস্থ যবক্ষারজান সমক্ষে কোষ-গ্রন্থিগুলি প্রচুর পরিমাণে রস নিঃসরণ করিতে থাকে এবং পত্রের পুনঃ প্রসারণ হইতেও অনেক বিলম্ব হয়। সূর্য্য শিশিরের ন্যায়, মাংস বা কীটদেহ এই রস মধ্যে জীর্ণ হয় অর্থাৎ জলীয় অবস্থাপন্ন হয় এবং পরে উল্লিখিত কোষ-গ্রন্থি নিচয় দ্বারা শোষিত হইয়া পত্রের পোষণ কার্য্য সম্পন্ন করে। সূর্য্য-শিশির যেমন অনেক পরিমাণে মাংস পরিপাক করিতে পারে, মক্ষিকাপাশ তদ্রূপ পারে না। ইহার পরিপাক শক্তি দুই চারিটি পোকার দেহ পরিপাক করণেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

আলদ্রোভাণ্ডা। ইহাও ড্রসেরা পরিবার ভুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ রূপেই জলজ। শিকড় আদৌ হয় না; স্রোত বিহীন জলে ভাসিয়া থাকে। ইহার পাতাগুলি কাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া এক একটী আবর্ত্তের (whorl) ন্যায় স্তবকে স্তবকে জন্মায়। (আমাদের ছবিতে সেইরূপ একটী আবর্ত্তের স্তবক দেখান হইয়াছে।) পত্রের বৃন্ত অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও কিছু বড়। পত্রগুলি মক্ষিকা-পাশের পত্রের ন্যায় দ্বিভক্ত। বৃন্তের বহিঃপ্রান্ত হইতে দ্বিভক্ত-পত্র ও পত্র বেষ্টন করিয়া চারিটি কিম্বা ছয়টি অতি সরু সরু কাঁটার মত অংশ (process) উঠিয়া থাকে। পত্রের উপরে মধ্য শিরার (mid rib) সন্নিকটস্থ স্থান কোষ-গ্রন্থি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশে পূর্ণ। পত্রাংশ দ্বয় ঈষৎ স্বচ্ছ, এবং সচরাচর ঝিনুকের দু'টী খোলার মত অর্দ্ধোন্মুক্ত থাকে। আলদ্রোভাণ্ডার পত্রকার্য্য ও গঠন, অনেকাংশে মক্ষিকাপাশের ন্যায় বলিয়া ইহাকে একপ্রকার ক্ষুদ্র "জলজ মক্ষিকাপাশ" বলিলেও হয়।

ষ্টিন্ নামক জনৈক প্রকৃতিতত্ত্ববিদ সর্ব্বপ্রথমে আলদ্রোভাণ্ডা পত্রের উত্তেজিত হইবার গুণ ও তদুদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। ইহার পরে কোন্ নামক অপর একজন প্রকৃতিতত্ত্ববেত্তা বর্দ্ধিষ্ণু আলদ্রোভাণ্ডার পত্রাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের মৃতাবশেষ দেখিয়া ষ্টিনের অনুমান সমর্থন করেন। আলদ্রোভাণ্ডা পৃথিবীর অনেক দূর ব্যাপিয়া বাস করে। কিন্তু যেখানে জন্মে, তাহার অল্প সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। কোন এক স্থানে হয় ত দুই চারিটি গাছ হইলে, তারপর দুহাজার পাঁচহাজার ক্রোশ অন্বেষণ করিলেও আর একটীও আলদ্রোভাণ্ডা খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। ইহা অষ্ট্রেলিয়া, ইয়ুরোপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতির স্থানে স্থানে জন্মে। সমুদয় ফ্রান্সের মধ্যে কেবল দুটি স্থানে ইহা পাওয়া যায়। আমাদের কলিকাতার দক্ষিণে কোন কোন ঝিলে এবং মাতলার সান্নিধ্যে ইহা পাওয়া গিয়া থাকে। আমরা কিন্তু এক দিবস মাতলার সমস্ত পুকুর, ডোবা ও জলযুক্ত স্থান এবং

বাদা খুঁজিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও এক-টিও আলদ্রোভাণ্ডা খুঁজিয়া পাই নাই। মাতলার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসন বাঁশড়ার কাছে, যেখানে আগে লবণ প্রস্তুত হইত, সেখানকার বাদায় (Salt pans) বোধহয় আলদ্রোভাণ্ডা পাওয়া যাইতে পারে। কেননা যাঁহারা পাইয়াছেন, তাহারা সল্ট প্যানেই পাইয়াছেন বলেন। আমরা সল্ট-প্যান কোথা ঠিক না জানিয়াই নিজ মাতলা বা পোর্টক্যানিংয়ে গিয়া পড়িয়াছিলাম। বোধ হয় সেই জন্যই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয় নাই। কলিকাতার রয়াল বটা-নিকাল গার্ডেনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কলিকা-তার সন্নিহিত স্থান হইতে আলদ্রোভাণ্ডা সংগ্রহ করিয়া ডারউইনকে পাঠাইয়াছিলেন। আলদ্রোভাণ্ডা অতি অল্প পরিমাণে ও অল্প-স্থানে জন্মে বলিয়া ইহা উদ্ভিদ-জগতে একটী দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ।

আলদ্রোভাণ্ডা-পত্রের মধ্যশিরা ও তৎসন্নিকটস্থ প্রদেশে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ-গ্রন্থি থাকে, সে গুলি উত্তেজনীয়তা গুণ-সম্পন্ন। ক্ষুদ্র কীটাণু, উন্মুক্ত পত্রাংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে এই কোষ গ্রন্থি নিচয় স্পর্শ করিলে, এক উত্তেজনা প্রভাবে পত্রাংশদ্বয় মক্ষিকা পাশের ন্যায় মুদ্রিত হয় এবং আবদ্ধ কীট বা কীটাণু পত্রাংশদ্বয়ের পেষণে মরিয়া যায়। পরে উল্লিখিত কোষ-গ্রন্থি নিচয় হইতে প্রচুর রস নিঃসৃত হইয়া উহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলে এবং জীর্ণ অর্থাৎ দ্রবীকৃত কীট-দেহ কোষ-গ্রন্থি নিচয় দ্বারা শোষিত হইয়া আলদ্রোভাণ্ডার শরীর পোষণ করে।

সূর্য্যশিশির, মক্ষিকাপাশ ও আলদ্রো-ভাণ্ডা ব্যতীত এই বিভাগে (Order) আরো অনেকগুলি মাংসভোজী উদ্ভিদ আছে। ইহাদের সকলেরি একটু না একটু বিশেষত্বও আছে। কিন্তু ড্রসেরা বিভাগ ছাড়া অন্য দুটি তিনটি বিভাগে অনেক উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যাহারা কতক পরিমাণে মাংসাদ এবং কীট পতঙ্গ ধরিবার জন্য অত্যাশ্চর্য্য গঠন সম্বন্ধীয় উদ্ভাবন বিকাশ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বটারওয়াট পরিবারান্তর্গত পিঙ্গি-কুলা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ পার্ব্বত্য ও জলাময় দেশে জন্মে। পত্রগুলি এক ইঞ্চ হইতে দেড় ইঞ্চ লম্বা হয়। পত্রোপরি কোষ গ্রন্থি বিশিষ্ট কেশ বা শুয়া থাকে। কোষ-গ্রন্থি অত্যন্ত চটচটে এক রকম রস নিঃসরণ করিতে পারে। এই আঠাময় রসে অনেক ছোট ছোট কীট পতঙ্গ আবদ্ধ হইয়া, পরে উক্ত উদ্ভিদের ভোজ্য হয়। ইহারও পরিপাকক্রিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত মাংসাদ উদ্ভিদের ন্যায়। অর্থাৎ এক প্রকার অম্ল রস ও পেপসিন ফার্মেণ্ট সাহায্যে, ধৃত কীট দেহকে দ্রবীভূত করিয়া ইহা শরীরসাৎ করে। ইহার পর এক বার মুদ্রিত হইয়া সূর্য্যশিশির অপেক্ষা অতি শীঘ্রই পুনরুন্মীলিত হয়। এমন কি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পত্র পুনঃপ্রসারিত হইয়া থাকে।

স্থালী-উদ্ভিদ।—ইহা পিঙ্গিকুলা পরি-বারান্তর্গত ও আট্রিকুলেরিয়া জাতি (Genus) ভুক্ত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম আট্রিকুলেরিয়া এবং চলিত ইংরাজী নাম (Bladder-wort) অর্থাৎ "স্থালী উদ্ভিদ"। (আমাদের ছবিতে ইহার একটি গাছের খানিক অংশ এবং উহার একটি স্থালীকে অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেখান হইয়াছে।) স্থালী উদ্ভিদের অনেক প্রকারের বিভিন্ন বংশ (Species) আছে। ইহারা প্রায় সকলেই

পচা, বদ্ধ অগভীর জলাশয়ে ও আবর্জ্জনা পূর্ণ খানাখন্দের মধ্যে জন্মে। আমাদের দেশে ইহা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা কলিকাতার সান্নিধ্য হইতে মাতলা, হুগলী, মগরা, বর্দ্ধমান, মধুপুর প্রভৃতি নানা স্থানে পচা পুষ্করিণী, নর্দ্দমা ও খানা খন্দের মধ্যে ইহাকে দেখিয়াছি। যেখানে হয়, সেখানে ইহা প্রচুর পরিমাণে পানা ও ঝাঁজির দামের মত জলাশয়কে পূর্ণ করিয়া রাখে। ইহাদের পত্র পালকের মত সরু সরু এবং ক্রমাগত দ্বিভক্ত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। (চিত্র দেখুন।) বিভক্ত পত্রের গায়ে বা মূলদেশে দুটি তিনটি এবং কোন কোন জাতীয় স্থালী উদ্ভিদে (আমরা এদেশে যেরূপ দেখিয়াছি) অসংখ্য পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল ও ঈষৎ স্বচ্ছ স্থালী ছোট ছোট বৃন্ত সহ সংলগ্ন থাকে। আমরা যখন প্রথম একটা পচা পুকুর হইতে স্থালী উদ্ভিদের একটা গাছ তুলিয়া দেখি, তখন মনে হইয়াছিল যে, এই স্থালীগুলি ছোট ছোট গেঁড়ি শাবক; বাস্তবিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁড়ি শাবকের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য এত যে, আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া ছোট লেন্স দিয়া দেখিবার পর বুঝিয়াছিলাম যে এগুলি গেঁড়ি শাবক নহে। অবশ্য তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, ঐ ক্ষুদ্র স্থালীগুলি, উহাদের অপেক্ষা আরো ক্ষুদ্রতর কীটগণের, অতি ভীষণ জীবন্ত সমাধি-মন্দির। বড় অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে স্থালীগুলির প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম।

লোকে পূর্ব্বে মনে করিত, এই স্থালীগুলিই বয়ার ন্যায় সমস্ত গাছটিকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখে। কিন্তু স্থালীর কার্য্য প্রকৃত, তাহা নহে। সহজ দৃষ্টিতে মনে হয়, যেন স্থালীটি আগাগোড়া মোড়া, উহার মধ্যে প্রবেশের কোন পথ নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে স্থালীর কোন একদিকে কতক গুলি সরু সরু শুয়া রহিয়াছে। এই দিকেই স্থালীর মুখ। এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারস্বরূপ স্থালীর মুখদেশকে বন্ধ করিয়া রাখে। এই দ্বার বা ভ্যালভ্ এমনি কৌশলে স্থাপিত যে, ভিতর হইতে কোন মতেই খোলা যায় না, কিন্তু অনায়াসেই বাহির হইতে ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায়। ইঁদুর ধরিবার খাঁচা কলের দ্বার দেখিয়া অনেক পরিমাণে ভ্যাল্ভের কার্য্য বোঝা যাইতে পারে। এই ভ্যালভ্ স্থিতি-স্থাপক ধর্ম্মী। ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় সহজেই নুইয়া দ্বার অবারিত করিয়া দেয়, কিন্তু পরে আপনাআপনিই স্প্রিংয়ের দ্বারের ন্যায় বদ্ধ হইয়া যায়। এই ভ্যালভের উপরে এক যোড়া করিয়া দু যোড়া—চারিটি, এবং উহার যে অংশ ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে হয়, সেই দিকে স্থালীতে সংলগ্ন অনেকগুলি সচল শুয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, এই শুয়াগুলি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের ন্যায় ভ্যালভ্ পথ রক্ষা করে। চিংড়িমাছের জাতীয় এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু (ইহাদিগকে ইংরাজীতে Cypris বলে) সচরাচর এই স্থালীতে আবদ্ধ হয়। পোকার মধ্যে মশার পোকা (Larvae) ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। আমরা অনেক স্থালীর মধ্যে জীবন্ত সাইপ্রিস বদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে চারি দিকে ছুটিতেছে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অনেক স্থালীতে সাইপ্রিসের ঝিণুকের ন্যায় কাঠিন আবরণ পড়িয়া রহিয়াছে, সহজ চক্ষেও দেখা যায়। ডারউইন এক একটি স্থালীতে দশটি সাইপ্রিসের খোলা

পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। আমরা পাঁচটি ছয়টির খোলা পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।

স্থালীর ভ্যালভের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে উক্ত চিংড়িমাছের জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগুলি ভ্যালভ্ ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। বহির্গমনের কোন পথ না পাইয়া অবশেষে অম্লজান অভাবে স্থালী মধ্যে মরিয়া যায়। স্থালী সাধারণতঃ জলে পূর্ণ থাকে, কখন বা এক এক বিন্দু বুদ্‌বুদও ইহার মধ্যে দেখা যায়। এই জলে নিমজ্জিত সাইপ্রিস দেহ পচিতে থাকে। স্থালীর গাত্রে ও ভ্যালভে যে নানা কোষ-গ্রন্থি থাকে, তাহাদের শোষণ ক্ষমতা আছে। এই কোষ-গ্রন্থি গুলিই পচিত জান্তব পদার্থ শোষণ করিয়া উদ্ভিদের পরিপোষণ করে।

স্থালী-উদ্ভিদ সূর্য্যশিশির বা মক্ষিকা পাশের ন্যায় জান্তব পদার্থ পরিপাক করিতে পারে না। কিন্তু উহা পচিলে তাহা শোষণ করিয়া আপনার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এই জন্য ইহা অনেকটা পচন ভোজী (Putrivorous); কিন্তু তাহা হইলেও, তাহাতে ইহার মাংসাদ আখ্যার কিছুই অসঙ্গতা দেখা যায় না। কারণ পরিপাক করিতে না পারিলেও ইহা পচিত জান্তব পদার্থ হইতেই আপন কোষগ্রন্থি দ্বারা আহার্য্য শোষণ করিয়া থাকে।

ঘট-উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম নেপেন্থেস, ইংরাজী চলিত নাম Pitcher plants "ঘট-উদ্ভিদ"। আমরা আমাদের চিত্রে ইহার ছবি দিই নাই। কারণ, ইহার জীবন্ত নমুনা কোম্পানীর বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সিংগাপুর, পিনাং ও অষ্ট্রেলিয়ায় সচরাচর পাওয়া যায়. ঘট-উদ্ভিদের পত্রের ডগা হইতে একটি করিয়া ঘট ঝুলিয়া থাকে। প্রত্যেক ঘটের একটি করিয়া ঢাকনি থাকে এবং উহা ঘটের মুখদেশে কব্জার মত কৌশলে আবদ্ধ থাকে। সকল ঘটের মধু নিঃসরণকারী কোষ-গ্রন্থি থাকে না। যাহার থাকে, তাহার দ্বারপথ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় না; আর যার সুগন্ধ মধু না থাকে, তার দ্বারপথ সম্পূর্ণরূপেই খুলিয়া থাকে। মধু নিঃসরণকারী কোষ-গ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ ঘটের মুখের কাছেই থাকে। ঘটের মুখ হইতে অভ্যন্তর দেশের গাত্রের খানিকটা চতুর্দ্দিকে সরু সরু নিম্নমুখী কেশে পূর্ণ থাকে। কেশগুলি অতি মসৃণ ও নিম্নমুখী হওয়াতে উহাদের উপর দিয়া ঘটের ভিতরে যাইবার পথ বিলক্ষণই পিচ্ছিল হয়। কিন্তু ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার কালে নিম্নমুখী কেশগুলি বড়ই অসুবিধা জনক হয়। এই কেশময় অংশের পরই ঘটাভ্যন্তর নির্ম্মল বারিতে পূর্ণ থাকে। এই অংশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ-গ্রন্থি সকল বিদ্যমান থাকে এবং ইহারাই প্রচুর পরিমাণে রস নিঃসরণ করে। এই জলরাশিতে নিমজ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গগণ মরিয়া যায়।

মধু লোভেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ক্ষুদ্র কীটগণ ঘটের মুখদেশে আকৃষ্ট হয়। যে দুর্ভাগা কীট মুখদেশ অতিক্রম করিয়া একবার নিম্নমুখী কেশময় পথে বিচরণ করিতে সাহসী হয়, ঘটস্থ সঞ্চিত জল মধ্যে তার নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী। কীট জল মধ্যে নিমজ্জিত হইলেই ঘটের কোষ-গ্রন্থি সকল কীটদেহস্থ জান্তব পদার্থ সংস্পর্শনে রস নিঃসরণ করিতে থাকে। ঘটের এই রস অম্লাক্ত। এখানেও পেপসিন ফার্ম্মেণ্ট জন্মে। অম্লরস ও পেপসিন সহযোগে কীট-দেহ দ্রবীভূত হয় এবং পরে কোষ-গ্রন্থি নিচয় দ্বারা শোষিত হইয়া ঘট-উদ্ভিদের শরীর

পোষণ করিয়া থাকে। সূর্য্যশিশিরও মক্ষিকা-পাশের ন্যায় ঘট-উদ্ভিদ প্রকৃত পক্ষেই মাংসাশী।

ভেরী। ইহার ইংরাজী নাম (Sarracenia) সারাসেনিয়া। ইহা সচরাচর উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়। ইহা জলা ভূমিতেই উৎপন্ন হয়। ঘট উদ্ভিদের সহিত সারাসেনিয়ার সম্পর্ক অতি নিকট। ইহাকে ঘট-উদ্ভিদের এক উপবংশ (Variety) বলিলে অন্যায় বলা হয় না। ইহার কতকগুলি পত্র মুড়িয়া ভেরীর ন্যায় এক চমৎকার আকার ধারণ করে। এই ভেরীগুলি-৩া৪ ইঞ্চ গভীর, এক ইঞ্চ দেড় ইঞ্চ প্রশস্ত হইয়া থাকে। ঘট-উদ্ভিদের ন্যায়, ইহারও একটী করিয়া ঢাকনি থাকে। এই ঢাকনি নিয়মিত সময়ে উন্মুক্ত বা বদ্ধ হয়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে ঢাকনি খুলিয়া যায়, নিশাগমে পুনরায় বদ্ধ হয়। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে ভেরী স্ফটিক বারিতে পূর্ণ হয় এবং তখন মুখাবরণটি আবদ্ধ থাকে। দিবসের উত্তাপে উন্মুক্ত ভেরীর সুনির্ম্মল বারির প্রায় অর্দ্ধাংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, কিন্তু রাত্রির মধ্যে ভেরী পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রণালীতে ভেরীর দৈনন্দিন কার্য্য চলিতে থাকে।

পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন, তৃষাতুর পক্ষী পতঙ্গের জন্য বিধাতা সারাসেনিয়ার ভেরীর মধ্যে সুনির্ম্মল পানীয় সঞ্চিত রাখিয়াছেন। স্মরণীয় লিনিয়স, যাঁহা হইতে উদ্ভিদ শাস্ত্রের প্রকৃত সূচনা হইয়াছে, সেই তীক্ষ্ণদর্শী লিনিয়সও এই প্রবাদে ভুলিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পেলী প্রকৃতি মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও সংকল্প দেখাইতে গিয়া তাঁহার Natural Theology গ্রন্থে ঘট-উদ্ভিদের জল সঞ্চয়ের কথা উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই বর্ত্তমানে সেরূপ ভ্রম সঙ্কুল প্রবাদ ও মতবাদ কেহই আর বিশ্বাস করিবেন না। সারাসেনিয়ার এই সঞ্চিত রস জীবন-প্রদায়ী সুশীতল পানীয় নহে। প্রত্যুত ইহা এরূপ তীক্ষ্ণ যে অর্দ্ধমিনিট নিমজ্জিত থাকিলে কীট পতঙ্গেরা মৃতকল্প হইয়া পড়ে।

উড্ডয়নশীল ছোট ছোট পোকা ভিন্ন পক্ষবিহীন কীটেরাও সারাসেনিয়ার পানীয় লোভে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, সারাসেনিয়ার পত্র পিপীলিকা ও পিপীলিকা-ধেনু (Aphides) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ইহারা রস পান করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না। কীটেরা ভেরীর জল পান করিলে মাতালের মত সংজ্ঞাবিহীন হইয়া পড়ে। চারিটি ছয়টি পা থাকিলেও মত্তাবস্থায় দ্বিপদ মনুষ্যের ন্যায় ইহাদেরও পায়ের ঠিক থাকে না; টলিয়া ভেরী মধ্যে নিপতিত হয়। কেহ কেহ রস-বিজড়িত পক্ষ ছাড়াইবার জন্য চরণ উত্তোলন করিতে গিয়া সাম্য হারায়, আর তৎসঙ্গে উল্টাইয়া ভেরী মধ্যে চিরজীবনের জন্য নিমগ্ন হয়। রমণী ট্রিট একদা একটা তৈলপায়ীকে একটা নূতন ভেরীর টাট্‌কা রস পানকরিতে দেখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য তৈলপায়ী লোভান্ধ হইয়া কোন প্রকারে ভেরী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর বাহির হইতে পারে নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে ভেরী কাটিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তৈলপায়ীর আপাদ-মস্তক অভ্যন্তর দেশ হইতে নিঃসৃত একপ্রকার রস দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। আর্সলাটি তখনও জীবিত, কেবল পাগুলি খসিয়া গিয়াছে। সারাসেনিয়ার পরিপাক প্রণালী ঘটউদ্ভিদের ন্যায়। পরিপাকের সময় ওপরে,

সারাসেনিয়ার পত্র হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত কীট পতঙ্গের সংখ্যা অল্প হইলে দুর্গন্ধ বড় অধিক হয় না।

জনৈক লেখক এই 'ঘট' ও 'ভেরী'র কথা বলিতে বলিতে বলিয়াছেন —

The Pitcher plant dies if it eats excess of animal food, but is the least fastidious and most carnivorous of all carnivorous plants. Flies, beetles, cockroaches disappear in three or four days leaving wings etc.,

ইহার অর্থ এই—

ঘট-উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে মাংস খাইলে মরিয়া যায়। অন্যান্য মাংসভোজী উদ্ভিদের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মাংসখোর। আর মাংস সম্বন্ধে ইহার কোন বাছ বিচার নাই। মক্ষিকা, গুবরেপোকা, আর্সলা ইহার মধ্যে পড়িলে দুই তিন দিবসের মধ্যেই ডানা পালকগুলি রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়!!

এই প্রবন্ধ মধ্যে যে যে মাংসাদ উদ্ভিদের উল্লেখ করা হইল, অনুল্লিখিতগুলির তুলনায় উহারা অতি সামান্য। উদ্ভিদরাজ্যে অনেক গাছ গাছড়া মাংসাদধর্ম্মী। বলা বাহুল্য এখনও আবিষ্কার করিবার অনেক অবশিষ্ট আছে। মাংসাদধর্ম্মী উদ্ভিদের পত্রের সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা, উহার শুয়ার উত্তেজনীয়তা, কীট পতঙ্গ ধরিবার নিমিত্ত নানাবিধ ফন্দী ও গঠনগত বিচিত্র উদ্ভাবন এবং সর্ব্বাপেক্ষা জন্তুদিগের ন্যায় জান্তব পদার্থ পরিপাক করিয়া যবক্ষারজান সংগ্রহ করণ — উদ্ভিদ রাজ্যে অতীব বিস্ময়কর ও রহস্য পূর্ণ ব্যাপার। সাধারণতঃ উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতেই প্রয়োজন মত যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া থাকে। বায়ুরাশি মধ্যে যবক্ষারজান বাষ্প প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, এরূপ বিমুক্ত যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে উদ্ভিজ্জ সকল নিতান্ত অক্ষম। মৃত্তিকার সহিত যে যবক্ষারজান নানাপ্রকারে মিশ্রিত থাকে, তাহাই শিকড় দ্বারা জলীয় রস সাহায্যে শোষণ করিয়া, তরুলতা আপনাদের আবশ্যক পূরণ করিয়া লয়। মাংসভোজী উদ্ভিদ সে সাধারণ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, জন্তুদিগের ন্যায় সাক্ষাৎভাবে জান্তব পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া, সন্নিহিত যবক্ষারজান অংশ সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদের ঈদৃশ ক্ষমতা অথবা জন্তুর সহিত উদ্ভিদের এই সাদৃশ্য নিতান্তই বিস্ময়কর।

আমরা সচরাচর উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

১: খাদ্য ও খাদ্য পরিপাক প্রণালী।
২: গতি শীলতা।
৩: জনন ক্রিয়া।
৪. বোধশক্তি।

আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে মাংসাদ উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে প্রথম পার্থক্যটি টিকিল না। কারণ, আমরা জানিলাম যে, অনেক না হইলেও কতকগুলি উদ্ভিদ ঠিক জন্তুদিগের ন্যায় জান্তব পদার্থ পরিপাক করিয়াই আপনাদের পুষ্টিসাধন করে। কেবল তাহাই নয়। আমরা দেখাইতে পারি, এমনও আবার কতকগুলি জন্তু আছে, যাহারা উদ্ভিদের ন্যায় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা অলবণাক্ত জলজাত স্পঞ্জের (Fresh water sponge বা Spongilla) কথা উল্লেখ করিতে পারি।

গতিশীলতার মঞ্চে দাঁড়াইয়াও আমরা উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে পার্থক্য পরিজ্ঞাপক কোন রেখা টানিতে পারি না। বড় বড়

বৃক্ষলতা গতিশীল নয় বটে, কিন্তু এমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ আছে, যাহারা জন্তুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপেই গতিশীল। দৃষ্টান্তঃ—ভলভক্স,প্যাণ্ডোরাইনা,প্রটোককস ইত্যাদি। আমরা এস্থলে অনেক উদ্ভিজ কোষের গতিশীলতার কথা ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করিলাম না। আবার এমনও অনেক জন্তু আছে, যাহারা বৃক্ষলতার ন্যায় স্থিতিশীল ও গতিহীন। যেমন স্পঞ্জ,পলিপ্স,প্রবাল ইত্যাদি।

জনন ক্রিয়া সম্বন্ধে আপাততঃ মনে হয়, উদ্ভিদ ও জন্তু স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক প্রাচীন কাল হইতেই জানা আছে যে, মূলতঃ দুইটুকু প্রোটোপ্লাজমের সংমিশ্রণ বই জনন-রহস্য আর কিছুই নহে। এই সংমিশ্রণ প্রণালী উদ্ভিদ ও জন্তু মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই একরূপ। সুতরাং এ বিভিন্নতাও কোন কাযের নয়।

বোধশক্তি। সাধারণতঃ ইহা একটি বিশেষ পার্থক্য বলিয়া সকলেই মনে করেন। কিন্তু ইহাও বালির বাঁধের ন্যায় গভীর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভারে ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা মনে করি সকল জন্তুই বোধশক্তি বিশিষ্ট। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেন, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অগণ্য এমন কত নিকৃষ্ট জন্তু আছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপেই বোধশক্তি বিহীন। অথবা যদি ইহাদের বোধশক্তি আরোপ করা যায়, তাহা হইলে এমন অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে,যাহাদের উপর বোধশক্তি আরোপ না করিয়া থাকিবার নয়। সুতরাং বোধশক্তির একটা পার্থক্যও সমগ্র উদ্ভিদ ও সমগ্র জন্তু মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়কে স্বতন্ত্র করিতে পারে না।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, উদ্ভিদ ও জন্তু মধ্যে কোন বিষয়েতেই একটা বিশেষ পার্থক্য নাই, কোন বিশেষ কারণ দর্শাইয়া কেশাপেক্ষাও সূক্ষ্মতর রেখার সম্পাতে এতদুভয়কে স্বতন্ত্র করা যায় না। আমরা অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, উদ্ভিদ ও জন্তু, জীবনরূপী এক মহাকাণ্ডের দুই মহাশাখা মাত্র। জন্তু-জগতের শ্রেষ্ঠ-বিকাশ মনুষ্য এবং উদ্ভিদ-জগতের শ্রেষ্ঠ-বিকাশ এক বিশালায়তন বনস্পতি, যদিও পরস্পর হইতে অনেক স্বতন্ত্র, তথাপি মূলে এক। উক্ত দুই মহাশাখার শাখদেশ হইতে যতই কাণ্ডাভিমুখে অবতরণ করা যায়, ততই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় যে, উদ্ভিদ ও জন্তু এই দুইয়ের উৎপত্তি স্থান, দুইয়ের মূল এক, দুইই এক। যে মৌলিক উপাদানে জন্তুশরীর পরিগঠিত, সেই মৌলিক উপাদানেই উদ্ভিদ শরীর পরিগঠিত। সেই একই প্রোটোপ্লাজম—যাহা অঙ্গার, যবক্ষারজান, অম্লজান,উদজান,গন্ধক ও ফস্ফরাসের সমষ্টি—জন্তুশরীর ও উদ্ভিদ শরীর গঠনের মূলভিত্তি। সুতরাং উদ্ভিদ ও জন্তুর মধ্যে যে এক কাল্পনিক প্রাচীরস্থাপন করিয়া উহাদিগকে স্বতন্ত্র করিতে যাই, সে প্রাচীর অরুণোদয়ে কুজ্ঝটিকা জালের ন্যায় বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং এক অতি সুন্দর, বিস্ময়কর ও সুগভীর একত্বের দৃশ্যপট স্বতঃউন্মুক্ত হইয়া মানবজ্ঞানকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। জড় উদ্ভিদ জন্তু; চেতন অচেতন; মনুষ্য পশু পক্ষী তরু লতা গুল্ম; সূর্য্য চন্দ্র তারকা; গিরি নদী সাগর;—সকলি মূলতঃ এক, সকলেই সেই এক মৌলিক উপাদান নিহিত। আমরা মাংসাদ উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে যখন কঠোর বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতে, দার্শনিকভাবে, চিন্তা পথে, স্থান কালের ব্যবধান অতিক্রম

করিয়া, বিশ্ব রহস্যের মূলদেশাভিমুখে অগ্রসর হই, তখনি এই এক সার্ব্বভৌমিক মহাতথ্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই এবং ইহা এতই অনিবার্য্যবেগে ও অসংশয়িতরূপে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয় যে, চিরাগত মত ও বিশ্বাসের বিরোধী হইলেও স্থির অবিচলিত মহান্ সত্যের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহা না মানিয়া কোন সুধীজন স্থির হইতে পারেন না।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

খ্রীষ্টের জন্মকাল এবং খ্রীষ্টীয় শক।

খ্রীষ্টীয় শক এবং খ্রীষ্টের জন্মকাল বহু বিতণ্ডার বিষয় হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যতই গবেষণা করা যায়, ততই খ্রীষ্টীয় শক অথবা খ্রীষ্টের জন্মকাল নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব বিবেচনা হয়। মহাবিজ্ঞ বর্ষীয়ান্, ইহাদের ঐকমত্য সংস্থাপনার্থ ঐকান্তিক যত্ন এবং ঐকাগ্র্য স্বীকার করিয়া হতাশ হইয়াছেন, সুতরাং খ্রীষ্টীয় শক গণনায় খ্রীষ্টের জন্মকাল অবধারণ করা ঠিক নহে।

বিখ্যাত ঘটনাসূত্রে শক গণনারম্ভ হইয়া থাকে। সংবৎ, শকাব্দা, ওলিম্পিয়ড্, হেজিরা, রোমনির্ম্মাণ প্রভৃতি অব্দ প্রসিদ্ধ ঘটনাসূত্রে আরব্ধ হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় শক খ্রীষ্টের জন্মসূত্রে আরম্ভ হইয়াছিল, আপনি এ কথা বলিতে পারেন না। কোন্ সময়ে, কিরূপে কাহা কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের জন্মাব্দ প্রচারিত হইয়াছিল, ইহার চিন্তা করা আবশ্যক; বস্তুতঃ খ্রীষ্টের জন্ম দিনে, জন্ম পক্ষে, জন্ম মাসে অথবা জন্ম বৎসরে খ্রীষ্টীয় শক গণনার উপক্রম হয় নাই। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৫৩২ বৎসর পরে ইতালিতে দাওনিসিয়স্ নামে এক খ্রীষ্টীয় যাজক খ্রীষ্টীয় শকের প্রচার আরম্ভ করেন; দাওনিসিয়স্ এক্সিগুয়স্ খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের যে কাল অবধারিত করেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ, ফরাসী খ্রীষ্টোপাসকেরা উক্ত ভ্রমাত্মক শক খ্রীষ্ট জন্মের ৮০০ আট শত বৎসর পরে স্বদেশে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে স্পেনবাসিগণ খ্রীষ্ট জন্মের ১৪০০ শত এবং পোর্টুগালের খ্রীষ্টোপাসকেরা ১৫০০ শত বৎসর পরে প্রচার করেন। পরে সমস্ত খ্রীষ্টোপাসক মণ্ডলীতে ভ্রমাবহ খ্রীষ্টাব্দ প্রচারিত হইয়াছিল। তীব্র সমালোচনা নাই সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না। ভ্রমের অন্ধকারে সমস্ত বিশ্বময় হইতেছে। সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি, খ্রীষ্ট অমুক সালে জন্মিয়াছেন, প্রকৃত কিন্তু কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আদৌ জানি না।

'Christian era is usually supposed to begin with the year of the birth of Christ, but there are various opinions with regard to the year in which that event took place"
Britanica.

খ্রীষ্টের জন্ম হইল আশিয়ায়, খ্রীষ্টীয় শকের আরম্ভ হইল ইউরোপে, খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দ পরে। আবার ইউরোপীয়েরা চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দ পরে স্বদেশে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, খ্রীষ্টীয় শক খ্রীষ্ট জন্মের বহু পরবর্ত্তী। পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দে ইউরোপের কোন কোন দেশে খ্রীষ্টীয় শকের আদৌ ব্যবহার ছিল না,

ইদানীং খ্রীষ্টীয় শক ইউরোপে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রাচীন খ্রীষ্টীয় সমাজ কিরূপে খ্রীষ্টের জন্মকাল অবধারিত করিয়াছিলেন? এস্থলে বলা বাহুল্য যে, পৌত্ত-লিকদিগের ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত শক আদি খ্রীষ্টোপাসকগণ অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক পরি-ত্যাগ করিয়া ইহুদী শাস্ত্র সম্মত গণনার অনু-বর্ত্তী হন। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট অব্দ গণনার রীতি ছিল না।

"The Jews had no general era properly so called." Britanica.

কিন্তু ইহুদী শাস্ত্রীয় গণনা খ্রীষ্টীয় শক নিরূপণ বিষয়ে যথোপযুক্ত হইতে পারে না। ওল্ড টেষ্টমেণ্টের সৃষ্টিকাল সম্বন্ধীয় গণনা অতিশয় ভ্রান্তিমূলক বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"In the system of chronology generally adopted, the date of the creation of the world is fixed at 4004 B. C.; but this is uncertain, and many different dates have been assigned to this event: thus according to the Septuagint it took place in the year 5872 B. C.; according to the Julian period, 4710 B. C.; and according to the mode of reckoning used by the Jews 3761 B. C." * Beeton's Dict.

ইহুদী শাস্ত্রীয় গণনা যে কিরূপ অকিঞ্চিৎ-কর, উপরোক্ত লিপি দৃষ্টে অনুভূত হইতে পারে। খ্রীষ্টোপাসকেরা উক্ত শাস্ত্রীয় অবলম্বনে খ্রীষ্টের জন্মকাল স্থির করিয়াছিলেন। ইহাতে খ্রীষ্টের জন্মকাল কতদূর প্রামাণ্য হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ লোকেই বুঝিতে পারিবেন।

Chronology of sacred History নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দে ভেগ্নোল সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, সৃষ্টি সম্বন্ধীয় দুইশত প্রকার গণনা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৃষ্টি অবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত ন্যূন কল্প গণনায় ৩৪৮৩ বর্ষ অতীত, এবং সুদীর্ঘ কল্পে ৬৯৮৩ বৎসর গত হইয়াছে। সৃষ্টিকাল গণনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের কিরূপ বোধ বিকশিত হইয়াছিল, পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এই জন্য একজন সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন,—

"From compatation founded on loose and conflicting date, it would be vain to look for knowledge or even for concord of opinion. From the very nature of the case discussion is hopeless labour. The subject is one to which the saying *"quod homines tot sentintioe* (নানা মুনির নানা মত) applies with almost literal truth."

এক্ষণে সপ্রমাণ হইতেছে যে, আদি খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহুদীয় শাস্ত্র মতের গণনার অনুগামী হইয়া ঘোর বিপাকে নিপতিত হইয়াছিলেন, কালদীয় দেশের সৌর অব্দ, গ্রীসের ওলি-

---

* The chronological elements on which both Jews and Christians founded their computations for *determining this period* were derived from the Old Testament-narratives which have been transmitted to us though three distinct channels. There are the Hebrew text of the Scriptures, the Samaritan text and the Greek version known as the Septuagint, in respect of chronology the three accounts are totally irriconcilable with other and no conclusive reason can be given for prefering any one of hem to another. We have no concurrent testimony with which to compare them nor is it even known which of them was regarded as the most probable by the Jews themselves when the books of the Old Testament were revised and transcribed by Ezra. The ordinary rules of probabi lity cannot be applied to a state of things in which the duration of human life is represented as extending to nearlya thousand years.

Britanica.

লিম্পিয়ড্ অব্দ এবং রোমের ইণ্ডিক্সন অব্দের অনুগামী হইলে খ্রীষ্টীয় শক এত অন্ধকারময় হইত না। প্রাচীন ইতিবৃত্ত অন্ধকারাবৃত, কাল নিরূপণের জন্য যে শকের আড়ম্বর করা হইয়াছে, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বলিয়াছেন।

"The history of the early ages of the world is involved in almost impenetrable obscurity, and chronology, comparatively speaking is only of recent origin. Britanica.

রোম ধ্বংসাবধি আমেরিকা আবিষ্কার পর্য্যন্ত কালকে পাশ্চাত্য লোকেরা মধ্য সময় বলেন, উক্ত সময়ে কাল গণনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

"In the chronicles of the Middle Ages much uncertainty frequently arises respecting dates." Britanica

প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর পঞ্জিকার গণনা ভ্রান্তিমূলক।

"The ancient church calendar was founded on two suppositions both erroneous." Britanica.

বাইবেলে এবং যোষেফসের লিপি মধ্যে ঘোর বিসম্বাদ ঘটিয়াছে। বাইবেলে উক্ত আছে, হেরোদ রাজার রাজত্ব কালে কুরিনীয় সুরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু যোষেফস্ তাহার বিপরীত কথা বলিয়াছেন।

"During the last years of Herod Sentius Saturninus and after him Quintilius Varus were governors of Syria. And it was not till long after the death of Herod that Quirinus undertook a census of Judea we know certainly from Josephus."*

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গের আদিকবি শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর। (২)

সাধুগণ কখন কাহারও দোষ গ্রহণ করেন না। চণ্ডীদাস সেই কালে প্রসন্নবদনে সকলের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া তুষ্ট করেন ও বহু প্রকার শিক্ষা দেন। চণ্ডীদাসের গুণে সেই কালে সকলে বাধ্য হইয়া সেই দিন হইতে অনেকেই শ্রীচণ্ডীদাসের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য ও বৈষ্ণব হন।

পূর্ব্বে যাহারা গণতা করিয়া চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন রহিত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে গ্রামের কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, কি ভদ্র, কি ইতর সকলেই সেই কীর্ত্তন গানে অর্থাৎ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের সেই অলৌকিক ঘটনা শেষে দেশবিদেশে রাষ্ট্র হয়। সেই কালে সাধারণ কর্ত্তৃক ইহাই রটনা হইয়াছিল,—

"রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হোল।
নিশ্চয় সাধন গুরু, সেই রসের কল্পতরু
তাই ছলে চণ্ডীদাস মোল॥"

রামমণির সহিত যে চণ্ডীদাসের কোন গুপ্ত প্রণয় ছিল না, ঐ পদে তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত আছে। মহাত্মা চণ্ডীদাস সঙ্গীতোপযোগী সাধনতত্ত্ব ও নির্য্যাসতত্ত্ব চৌষট্টি রস পরিপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলার পদপদাবলীরচনা ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কেবল নানা ছন্দোবন্ধে গদ্য পদ্য লিখিয়াছিলেন। ফলতঃ সেকালের গদ্য একালের মত নহে; চণ্ডীদাসের কৃত যে ছন্দের প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় ছন্দের মিল নাই অর্থাৎ ছন্দভঙ্গ তাহারই নাম গদ্য।

* Antique. 18, 1, 1.

আর যে ছন্দের প্রথম চরণাবধি শেষ পর্য্যন্ত মিল আছে, অথচ যতি পতন দোষ নাই, তাহারই নাম পদ্য।

চণ্ডীদাসের সমকালীন কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরও গদ্য পদ্যময় গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, এইজন্য প্রাচীন কবি, বৈষ্ণবদাস, উভয় কবি সম্বন্ধে এই মত লিখিয়াছেন,—

'জয় জয়দেব কবি, নৃপতি শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসধাম
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর, অখিল ভুবন অনুপাম॥
যা'কর রচিত, মধুর রস নিরমল, গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র, আস্বাদলা, রায় স্বরূপ সহিত॥'

মহাত্মা চণ্ডীদাস, ভক্তিরসে বিভোর হইয়া উদ্ভাবন শক্তিতে কত শত পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তা কে বর্ণিতে সক্ষম? তাহার সংখ্যা নাই। পূর্ব্বে একজন সহজ সম্প্রদায়ের নেতা বিবর্ত্ত বিলাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মহাত্মা চণ্ডীদাস জীবিতকালে লক্ষ পদ রচনা করিয়াছিলেন। কবিদিগের তুণ্ডে যখন সরস্বতীর অধিষ্ঠান, তখন সেকথা বড় বিচিত্র নহে।

মহাভারতে ব্যক্ত আছে, দেবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় লেখক গণপতি গণরাজের সাহায্যে ভগবান বেদব্যাস এমন ভাবে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন যে, নিমেষ কালের জন্য গণপতিকে কলম বিশ্রাম করিতে দিতেন না, অনর্গল কবিতা প্রকাশ করিতেন, আর গণপতি লিখিতেন। বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের রচনাকালে যদি কেহ লেখার সাহায্য করিতেন বা লিখিয়া রাখিতেন, ভাবনা কি ছিল? লেখা নাই বলিয়া পদের অভাব হইয়াছে। যাহা কিছু লোকে অভ্যাস করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লোকের শিক্ষা ও অভ্যাস ছিল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ অতীব কষ্টে সৃষ্টে তাহাই সংগ্রহ বা উদ্ধার করিয়া অতি প্রাচীন পদসমুদ্র নামা প্রকাণ্ড গ্রন্থ অর্থাৎ যাহার ভিতর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যাবতীয় মহাজনকৃত কিছু কম পঞ্চদশসহস্রের অধিক পদ আছে, সেই গ্রন্থের মধ্যে মহাত্মা চণ্ডীদাস কৃত পাঁচ শতের অধিক পদ বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়।

মহাত্মা চণ্ডীদাসের উপনাম বড়ু। বড়ু শব্দের প্রকৃত অর্থ (১) পূজারী ব্রাহ্মণ, (২) অবিবাহিত। মহাত্মা চণ্ডীদাস পূজারী ছিলেন এবং বিবাহ করেন নাই, এজন্য অনেকেই পরিহাস বা আহ্লাদ করিয়া তাঁহার নামের পূর্ব্বে বড়ু শব্দ ব্যবহার করিতেন। তিনিও কোন কোন পদের ভনিতা স্থলে ঐ বড়ু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কোন কোন পদে দ্বিজ শব্দেরও পরিচয় দিয়াছেন। এবং একটী পদের ভিতরে যে একটী সঙ্কেত অঙ্কের পরিচয় দিয়াছেন তাহা কাল নির্ণয় কি শক সংখ্যা, তা বুঝিবার যো নাই। সেই পদটী এই,—

'বিধুর নিকট নেত্র, পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্ক নিজ্জা।
চণ্ডীদাস রস কৌতুক কিজ্জা।'

বিধু (১) নেত্র (৩) পক্ষ (২) বাণ (৫) একত্রে ১৩২৫। নিজ্জা শব্দে লওয়া, কিজ্জা শব্দে কিয়া, ইহা ব্রজবুলী যথা, লিজীয়ে, কিজীয়ে; যদি ইহা কৌতুক স্থলে শক গণ্য করা যায়, তাহা হইলে ১৩২৫ শকে তৎকর্ত্তৃক নবহুঁ নবহুঁ অর্থাৎ নূতন নূতন রসে কবিতাকুসুম বিকশিত হইয়াছিল। ধরিতে গেলে সে আজি ৪৯০ বৎসরের কথা।

বিদিত আছে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ১৪০৭শকে প্রকট হইয়াছিলেন। সেই শকের সহিত পূর্ব্বোক্ত শক বিয়োগ করিলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আরো

এক কথা; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুর এক সময়ের লোক, পরস্পর মিলনও হইয়াছিল; যথা, পদে আছে;—

"চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস গুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল। ইত্যাদি

বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে এই এক কথা বিদিত আছে, ১৩২৩ শকে বিদ্যাপতি ঠাকুর রাজা শিবসিংহের নিকট উপহার স্বরূপ বিদকী গ্রাম প্রাপ্ত হন, এইসময়েই তাঁহারকবিতাকদম্ব-রাজী প্রস্ফুটিত হইয়া ভাবুক ভ্রমরবৃন্দের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল। অতএব চণ্ডীদাসের লিখিত অঙ্কগুলি শক গণনারই সংখ্যা, ইহাই বোধ হয়। এবং এই অনুমান অযৌক্তিক নহে। কেননা উভয় কবিই সমসাময়িক।

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর নিজের কবিতায় যে সঙ্কেত-পরিচয় দিয়াছেন, চণ্ডীদাস ঠাকুর কোন পদে সেইরূপ আপনার পরিচয় দেন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় কি? তা তাহার কৃত পদে এই রূপ পাওয়া যায়;

"জন্মদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর,
মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপ,
কৃপাকরি লেউ নিজপাশ॥
বিদকী গ্রাম, দান করল মুঝে,
রহতহি রাজ সন্নিধানে।
লছমী চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকসয়ী,
বিদ্যাপতি ইহ ভাণে॥"
* * * * পদসমুদ্র।

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে;—

"সারস্বতা কান্যকুব্জা, গৌড় মৈথিলিকোৎকলা।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতঃ বিন্ধ্যাসোত্তরবাসিন॥"

রাজা শিবসিংহ যৎকালে এই পঞ্চগৌড়ের রাজা ছিলেন, সেইকালে বিদ্যাপতি ঠাকুর ঐ রাজসংসারে সভাপণ্ডিত বা রাজার প্রধান অমাত্য ছিলেন। মৈথিলা দেশে তাঁহার বাস ছিল। রাজা তাঁহাকে (বিদ্যাপতি ঠাকুরকে) যে গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই গ্রামের নাম বিদকী (ঐ গ্রাম দ্বারবঙ্গের নিকট)। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পিতার নাম গণপতিঠাকুর। রাজা শিবসিংহের পত্নীর নাম শ্রীলছিমাদেবী, এই লছিমাদেবীর সন্দর্শনে শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের-লীলা বিষয়ক কবিতা স্ফুরিত হইত। রাজা শিবসিংহের পারমার্থিক নাম শ্রীরূপনারায়ণ; তাঁহার রাজত্বকালে, সংবৎ,শকাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ এবং বঙ্গে বঙ্গাব্দ এই কতিপয় শক প্রচলিতছিল; তৎসম্বন্ধে যাহাকিছু নিদর্শন আছে, তাহা পরে বলিব।

কিম্বদন্তী, রাজা শিবসিংহ (বা রূপনারায়ণ) রাজ্যসীমা পর্যাবেক্ষণের নিমিত্ত শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর ও অন্যান্য পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে মধ্যে মধ্যে গৌড়ে আগমন করিয়া মঙ্গল কোটে দরবার করিতেন। বীরভূমের সন্নিহিত অধুনা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গল-কোট একটী প্রসিদ্ধ স্থান।

মহাত্মা শ্রীমুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ঐ স্থান গৌড় উজ্জয়িনী বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন; এবং মহাভারত-রচয়িতা মহাত্মা কাশীরামদাস আত্মপরিচয়ে ঐ প্রদেশ ইন্দ্রাণী নামে প্রদেশ বলিয়া লিখিয়াছেন। ঐ মঙ্গল-কোটে পূর্ব্ব রাজধানী ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট বহু চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

ঐ প্রদেশ মধ্যে যে কয়েকটী স্রোতস্বতী নদনদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে দামোদর নদ সর্ব্বপ্রধান। ঐ নদ আস্তগঙ্গা

দামোদর নামে প্রসিদ্ধ। রাঢ় দেশের লোকে পূর্ব্বে ও এখনও ঐ নদকে স্বরনদী গঙ্গাজ্ঞানে গঙ্গাস্নান যোগে স্নানাবগাহন করিয়া পবিত্র বলিয়া মনে করে।

রাজা রূপনারায়ণ যে সময় বিদ্যাপতি ঠাকুর সমভিব্যাহারে গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় মহাত্মা চণ্ডীদাসের মৃত্যু ও পুনর্জীবন প্রাপ্তির অলৌকিক ঘটনা লোক পরম্পরা অবগত হইয়া তাঁহার সহ মিলন ইচ্ছায় (বিদ্যাপতি ঠাকুর) বিশেষ উৎকণ্ঠিত হন্। শেষে বিদ্যাপতি ঠাকুর, রূপনারায়ণ সমভিব্যাহারে সেই উৎকণ্ঠাতিশয়ে মঙ্গলকোট হইতে নান্নুর গ্রামে যাত্রা করেন। সেইকালে, শ্রীশ্রীবাশুলীদেবীর প্রত্যাদেশে রাজা রূপনারায়ণ সমভিব্যাহারে বিদ্যাপতি ঠাকুর আগমন করিতেছেন, চণ্ডীদাস ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে সম্মানের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া গ্রহণ করিবার অভিলাষে উৎকণ্ঠিত হইয়া নান্নুর গ্রাম হইতে মঙ্গলকোটাভিমুখে শুভযাত্রা করেন।

ইতাবসরে দৈবানুকূলে দিবা ২ প্রহরের সময় পথিমধ্যে অর্থাৎ ঐ আদাগঙ্গা সরিতীরে উভয়ের প্রিয়দর্শন ও শুভ সম্মিলন হয়। পদে আছে ;—

"সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝই, বটতলে সুরধনী তীর।
চণ্ডীদাস, কবি রঞ্জনে, মিলিল পুলকে কলেবর গীর॥"

বিদ্যাপতি ঠাকুরের উপাধি কবিরঞ্জন। "গীর শব্দে" ধরায় পতিত। যে সময়টীতে পরস্পর সাক্ষাৎ মিলন হয়, সে সময়টী মধু চৈত্র মাস। একটুকু প্রখর রৌদ্র জন্য উভয়ে একটী বটবৃক্ষ তলে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রাম-সুখ অনুভব করেন। সেইকালে গুরুজাতীয় ভজনতত্ত্ব লইয়া ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে পরস্পর অনেক কথা ও পরস্পর পদে পদে অনেক প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়। উভয়ের বর্ণিত সেই সকল পদ্যে আধ্যাত্মিক ও প্রশ্নদূত তত্ত্ব আছে। সে সকলের অর্থ বড়ই কঠিন এবং জটিল। নির্য্যাস তত্ত্ব ভেদ না করিলে ও তাহাতে জ্ঞান না থাকিলে, সহজে সে রস বোধগম্য হইবার নহে। বিশেষতঃ সাধক ভিন্ন অপরে তা জানেও না, বুঝেও না।

বর্ত্তমানে সাহজিক সম্প্রদায় যাহা কিছু অর্থ ও অনুকরণ করে, সে সকল পদকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বিপরীত ও ঘৃণিত। আর সে কেবল প্রজ্বলিত প্রদীপের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার নিমিত্ত পতঙ্গের ন্যায় পাথ ধারণ। মহাত্মা চণ্ডীদাস নিজেই বলিয়াছেন ;—

"সে রসতত্ত্ব বুঝিবে কে ?
রসিকা রমণী পেয়েছে যে॥
চণ্ডীদাস কহে, বুঝন কেরে।
অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরে॥"

তা যাহাই হউক ; সে বিচার অন্য প্রবন্ধে প্রয়োজন, ইহাতে নহে।

অনন্তর, বিশ্রাম সুখলাভের পর বিদ্যাপতি ঠাকুর এবং রূপনারায়ণ শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের সমভিব্যাহারে নান্নুর গ্রামে আগমন এবং শ্রীশ্রীবাশুলী দেবীর দর্শন এবং রামমণির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া প্রীত হওনান্ত কয়েকদিন সুখে অতিবাহিত যাবৎ করিয়া পশ্চাৎ মৈথিল দেশে গমন করেন। সেই হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয় ঠাকুরের অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ প্রণয়-বন্ধনে উভয় রচিত পদ আদান প্রদান ও সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর এক সময়ের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু বয়সে কে ছোট ও কে বড় ছিলেন, তা জানিবার যো নাই, তবে পদের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিলে চণ্ডীদাসই বড় বলিয়া বোধ হয়। কেন না, তিনি পদের এক স্থানে ধরা দিয়াছেন ; যথা ;—

"পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥" ইত্যাদি।

এই আদি শব্দ লইয়া তিনিই বড়। তাঁহা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে রস প্রচার হয়। মহাত্মা চণ্ডীদাসের জীবনী সম্বন্ধে অনেক আষাঢ়ে গল্প আছে। কিন্তু সে সকল কথা শুনিতে নাই ও বিশ্বাস করিতে নাই। কারণ, পূর্ব্ব মহাজন শ্রীজ্ঞানদাস, শ্রীশ্রীঠাকুর নরহরিদাস এবং বুধরীর কবিনৃপবংশজ শ্রীগোবিন্দ,শ্রীঘন শ্যাম ও শ্রীবলরামদাস প্রভৃতি মহাত্মা চণ্ডীদাস সম্বন্ধে পদ পদাবলীতে যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন, পদসমুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও পদে পদে পদগুলি মিলাইয়া দেখিলে তাহা অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। পদে আছে ;—

"ভজমন, কিশোর কিশোরী।
রাধানামে দেহ ডঙ্কা, ঘুচিবে শমন শঙ্কা,
অবহেলে ভবে যাবে তরি॥
গোবিন্দ ভজবে মন, কি করিতে পারে যম,
রাধাকুণ্ডের তীরে কর বাস।
আসিবে এক ব্রজচরী, লয়ে যাবে করে ধরি,
দেখাইবে, রাসবিলাস॥"

* * * ইত্যাদি

চণ্ডীদাস ঠাকুর শেষদশায় শ্রীবৃন্দাবন আনন্দধামে স্বজ্ঞান স্বইচ্ছায় গমন করিয়া এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত হইয়া ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল পদ সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

আজি পর্য্যন্ত সেই অনন্ত সুখধামে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে। পশ্চাৎ রামমণিও সেই পথ অনুসরণ করেন। ইহাই চণ্ডীদাস ঠাকুরের জীবনের আখ্যায়িকা। এবং ইহাই তাঁহার শেষ জীবনের পরিচয়!!

এখন সমালোচনা স্থলে কিছু বলিতে হইতেছে। একটা ভাষাকথায় আছে যে, "কুনা ডাণা কাণা, পথ পায় না, এ তিন জনা", কোন উদ্ভটকারও বলিয়াছেন ; "অন্ধস্য স্কন্ধ গমনে, তস্য বিঘ্ন পদে পদে।" বস্তুতঃ কথা সত্য "কাণার কাঁদে গমন করিলেই খানায় পড়িতে হয়।" কারণ, যে কথার মূল নাই, সে কথা বিশ্বাস করা বড় দোষ। আর যে কথার কোন না কোন মূল আছে, তাহা অসম্ভব হইলেও সম্ভব হয়। যথা রামায়ণে ; 'শীলা তরতি পানীনাং' ইত্যাদি।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আমি কাহারও নিন্দা করিতেছি না, আমার সে উদ্দেশ্যও নহে। তবে এই একটা কথা ; বাঙ্গালা-সাহিত্যের ওয়ারিস নাই ; কোন এক প্রাচীন ঘটনার অনুসন্ধান করিবার কালে,হয় লিখিত কথা, নয় লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিতে হয়। মনে করুন, অনুসন্ধান কালে কেহ বলিল, চণ্ডীদাস শাক্ত ও ঘোর মাতাল ও বামাচারী এবং অধিক মাত্রায় তামাক-খোর ছিল; এজন্য সকলে"চণ্ডে" মাতাল বলিত। আবার কোন লেখক সংবাদ পত্রে লিখিয়া প্রকাশ করিলেন, চণ্ডীদাস বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী। আবার কেহ বলিল, "চণ্ডে" একটা ধোপানীর সহিত প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছিল ; তন্নিবন্ধন চণ্ডীর পিতা মাতা বিষম দায়ে পড়িয়াছিলেন। শেষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক উদ্ধার হয়।" আবার সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন পোষকতা করিল, "চণ্ডে" যখন সমাজ হইতে উদ্ধার হয়, আর যেদিন তাঁহার বাটীতে সমন্বয় ও কুটুম্ব ভোজন, সেদিন স্বজাতিবর্গের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভোজনের কালীন চণ্ডীদাস অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিল, এমন সময়ে রামী ধোপানী হঠাৎ সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া "কিরে চণ্ডে, তুই আমায় ছেড়ে জেতে উঠেছিস্" এই বলিয়া

ভোজনের বাধা দেওয়ায়, সেই একটা হুলস্থূল ব্যাপারে চণ্ডদাস পুনর্মূষিক অবস্থা প্রাপ্ত হন।

আবার অন্যান্য অনুসন্ধান কালে অন্য এক জন বলিল, একদা চণ্ডীদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, চিতা সজ্জিত হইয়াছে, এমন সময় রামিনী উপস্থিত হইয়া চিতার উপর লাথী মারিয়া বলিল, "কিরে চণ্ডে, তুই আমায় ছেড়ে কোথা যাচ্ছিস্" এই বলিয়া বারবার তিনবার পদাঘাত করায়, সেই (লাথীর) চোটে ঘুম ভাঙ্গিবার ন্যায় চণ্ডীদাস পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়।

আবার অন্যজন বলিল, একদা, চণ্ডীদাস মতিপুরে গান করিতে গিয়াছিল, কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় নাটমন্দিরের ছাদ পতনে চণ্ডীদাস ও রামীর এককালে অপমৃত্যু হয়। আর আর কথাগুলি এস্থলে বলিবার আবশ্যক নাই।

প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এ সকল কথার যখন মূল নাই, কেমনে তা সামঞ্জস্য হইতে পারে? পরন্তু, অনুসন্ধিৎসু মহোদয়গণ, বাস্তবিক কথাগুলি কতদূর সত্য, তা আর উল্টাইয়া দেখিলেন না। তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া অবিকল কথাগুলি রঞ্জিত ও অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়া সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিলেন।

একটা কথা আছে "নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল", এখনকার কালে যাঁহারা বাগ্দেবীর বরপুত্র এবং সমাজের অগ্রণী, যাঁহাদের তেজস্বিতা লেখনীর মুখে কাহারও কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, সে কথা কে অন্যথা করিতে পারে? তাহাই একালে সাহিত্যজগতে "মহাজন পন্থা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ ইহা সত্যকাল নয়, ত্রেতাও নয়, দ্বাপরও নয়, কলিকাল। একালে সকলই সম্ভব। প্রকৃত পক্ষের কথা বলিতে গেলে বহু দূরে পড়িতে হয়। সে অনেক কথার কথা; এস্থলে কিছু বলিব। পুরাণে আছে, একদিন, বকরূপী ধর্ম্ম, পাণ্ডুকুলভূষণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাহাকে পথ বলে?" ইহাতে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির উত্তর দান করেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থাৎ মহাজন যাহা দ্বারা গমন করিয়াছেন, তাহারই নাম পথ। আর এক দিন রায় রামানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেন;

"কোন্ পথে গেলে জীব, আর না আইসে।
কোন পথে গেলে না ভাঙ্গয়ে তার দিশে॥"

রায় রামানন্দের উত্তর;—

"যে পথে সাধুর গতি, সেই পথ সার।
অন্য পথ যায় যদি, কি বা আসা তার॥"

দেখা যাইল, এই উভয় প্রশ্নকর্ত্তার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, দ্বিতীয় ধর্ম্ম সংস্থাপক যুগাবতার; উত্তর দাতার মধ্যে প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর আদর্শ স্বরূপ রাজা যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয় ভক্তের প্রতিরূপ রায় রামানন্দ, উভয় পক্ষেরই তাৎপর্য্য এক।

যুধিষ্ঠির যাহা উত্তর দিলেন, ইহাতে ইহাই বোধহয়, ক্রমান্বয়ে মহাজনগণ যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তৎপরবর্ত্তী জীবগণও যদি তাহারই অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে নির্ব্বিবাদে ইহকাল ও পরকাল, এই উভয় কালেই সুখভোগী হইতে পারে। কারণ, পথ শব্দের অর্থ, যাহা অবলম্বন করিয়া গমন করিলে নিজ অভিপ্রেত গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়; তাহারই নাম পথ। এক্ষণে জীবের অভিপ্রেত গন্তব্য স্থান কোথায়? যে স্থানে যাইলে জীব চিরকালের জন্য সুখে অবস্থান করিতে পারে, তাহাই জীবের অভিপ্রেত ভূমি।

কিন্তু নির্ব্বোধ মৃগগণ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া জল পাইলে সুশীতল হইব, ইহা বোধ-

করিয়া মরীচিকা-ভ্রান্ত যেমন জীবনের জন্ম জীবন হারায়, ভ্রান্তজীবগণও আপাততঃ রমণীয় মরীচিকা স্থানীয় কুতার্কিক কুহকীর বাগজালে, পতিত হইয়া, সুখবোধে নরক যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত হইয়া, অনন্তজীবনে অপার যন্ত্রণা ভোগ করে; প্রকৃত অভিপ্রেত স্থানে যাইতে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি চতুর হইবেন, তিনি হঠাৎ কোন কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্ব প্রথা পরিত্যাগ করিবেন না। অথবা আপাততঃ হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তিতে মোহিত হইয়া প্রাচীন পথ ত্যাগ করিয়া আধুনিক পথ অবলম্বন করিবেন না। যিনি সুবোধ হন, তাহাকে ঔদ্ধত্য কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। সুতরাং যিনি বেশ বুঝিতে পারেন যে, শিষ্টগণ (সাধুগণ) যে পথ দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, আমাদেরও সেই পথে যাওয়া উচিত। যে সে একটা পথ পাইলে যাওয়া অবিধেয়। গমনের পূর্ব্বে তাহার বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। কোথাও কোন বিভীষিকা আছে কি না? ইহা দেখিয়া তবে চরণ চালন অথবা লেখনী সঞ্চালন করিতে হয়।

মহাত্মা চণ্ডীদাস একজন সাধক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, স্বয়ং বিশালাক্ষী দেবী যাঁহার উপদেষ্টা, মৃত্যু যাঁহার করতলাধীন, যিনি শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ চতুরাক্ষর মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং অনুক্ষণ হৃদয়পটে সেই যুগলরূপ দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রেমবৈচিত্র্য বর্ণনা করিতেন, তাঁহার কখন কি অপমৃত্যু হইবার সম্ভব?

সাহিত্যবেত্তাগণ যাহাই বলুন, বা যাহাই লিখুন, সরল বিশ্বাসী বৈষ্ণব অর্থাৎ সাধুগণ তাহা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। প্রতিবাদ করিবেন আর বলিবেন, যদি চণ্ডীদাসের মতিপুরে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছিল, তবে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার সমাধি কেন?

এই উপকাহিনী বলিবার তাৎপর্য্য এই, সম্প্রতি, নদিয়া মেহেরপুর নিবাসী উচ্চশিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় বহু পরিশ্রম ও বহু প্রযত্নে মহাত্মা চণ্ডীদাসের জীবনী ও টীকা সহিত এক খানি পুস্তকে বহুসংখ্যক পদ প্রকাশ করিয়া পুস্তক খানির "চণ্ডীদাস" নামকরণ করিয়াছেন। দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, তাঁহার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ ও সৎ। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মহোদয়গণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে চণ্ডীদাসের কিছু কিছু পদ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, রমণী বাবুর পুস্তকে সে সকল অপেক্ষা পদসংখ্যা অধিক। ইহার ভিতর আশাতীত পদ আছে। এত পদ পূর্ব্বে কখন কোন পুস্তকে দেখা-যায় নাই, অথবা কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর। কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, অঙ্গ সৌষ্ঠব ততোধিক ভাল। অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় বিনা সূতায় গাথনি নহে; এমনি সূত্রে পদ গুলিন গাঁথনি যে, মণিময় হার ফেলিয়া তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়। অধিক কি, ক্রীড়াশালিনী কুসুমরূপিণী বালিকা যেরূপ পিতা মাতার গলা জড়াইয়া ধরে, পদগুলি যে কোন সময়ে অধীত হইলে পাঠক শ্রোতার চিত্তকে সেইরূপ বাঁধিয়া ফেলে এবং প্রেমরসে অভিষিক্ত হইতে হয়। ধন্য, রমণী বাবুর অধ্যবসায়কে ধন্য!

তিনি, গ্রন্থখানি প্রকাশে কোন অংশে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। বর্ত্তমানকালে তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে কীর্ত্তনব্যবসায়ীদিগের বিশেষ উপকার ও শিক্ষার সুলভ হইবে ও উত্তম ব্যবসা চলিবে। তন্নিবন্ধন এক একখানি পুস্তক ঘরে ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত।

সংগ্রহ কালে যদিও অন্যান্য পদকর্ত্তার রচিত ২।১ টী পদ, যথা, "যমুনা যাইয়া,

শ্যামেরে দেখিয়া ইত্যাদি” মিশ্রিত হইয়াছে, ফলতঃ তাহা ভুবি মাল নহে, মহাজনী মাল, গঙ্গাতে নদ নদীর জল মিশ্রিত হইয়া যেরূপ সুনির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হয়, উহা তদনুরূপ, সুতরাং কিছু আসে যায় না। কিন্তু পুস্তকে একটা বিষয়ের বড়ই অভাব। মুখবন্ধে বৈষ্ণবের উপাস্য শ্রীগৌরচন্দ্রিকা নাই। বিশেষতঃ “হরি সর্ব্বত্র গীয়তে” বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, ভারতে, যে নামের সার্থকতা করিয়াছে, নান্দীতে সে নাম না থাকা বড় দোষ, পণ্ডিতে তাহা অস্পর্শ্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

দ্বিতীয় কথা ; রমণী বাবু সমস্ত পদ উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; সে কার্য্য সাধন না হইবারই কথা। যেহেতু মহাত্মা চণ্ডীদাসের পদ এখন সমুদ্র গর্ভে নিহিত। সমুদ্রের অপর একটা নাম রত্নাকর,যে কোন রত্নের আবশ্যক হউক না কেন, তাহাতে অবগাহন করিলে পাওয়া যায়,পরন্তু রমণী বাবু সে সন্ধান আদৌ করেন নাই ; সুতরাং এখনও অনেক পদ প্রকাশ হইতে বাকী।

তৃতীয় কথা, রমণী বাবু, চণ্ডীদাসের যাহা কিছু জীবনী লিখিয়াছেন, তাহার ভিতর নূতন বিষয় কিছুই নাই “যথাপূর্ব্ব তথাপর” গোড়াতেও যা ভুল,আগাতেও তা ভুল। তিনি, একা তাহাতে দোষের ভাগী নহেন। নূতন পথে চলিতে গেলে,বা জনশ্রুতি কথায় বিশ্বাস করিলে যেরূপ ভ্রমে পড়িতে হয়, পূর্ব্বেই তা বলা হইয়াছে।

এখন অনুরোধ এবং ভরসা করি, তিনি এখন পদ গুলি মিলাইয়া দেখিবেন, কোন্ পথ সোজা, দ্বিতীয় বারে তাহা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ মহাজন পথে চলিলে অবশ্যই অভিপ্রেত স্থানে গমন করিতে পারিবেন এবং যশোকীর্ত্তি থাকিবে। অধুনা, ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধে পদকর্ত্তার বিশেষ পরিচয়, কোন রসজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, মহাত্মা চণ্ডীদাস কেবল পদ্য কাব্য লিখিবার জন্য কবি নহেন,কেবল শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য শিল্পী নহেন, লোক সকলকে স্বরে মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত গায়ক নহেন ; রমণীর চিত্ত আকর্ষণের জন্য রসিক নহেন ; অথচ তিনি, উৎকৃষ্ট কবি, উৎকৃষ্ট শিল্পী, উৎকৃষ্ট পণ্ডিত, উৎকৃষ্ট গায়ক ও উৎকৃষ্ট রসিক বা রসিক। ভক্ত।

তাহার গীতিকাব্য, তাঁহার শিল্প, তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, এবং তাঁহার রসিকতা, ও তাঁহার শরীর ও তাঁহার মন এ সকলেরই এক উদ্দেশ ; সে উদ্দেশ্য কেবল “শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি আর ব্রজের নিগূঢ় রস প্রচার।” ভক্তি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ, যেরূপ পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আপনাদের ভক্তি প্রকাশ করেন, চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, মনুষ্য সৃষ্টপদার্থমাত্র, চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ঈশ্বর প্রভু, ভক্ত তাঁহার দাস, তাঁহার সেবার জন্য ভক্তের জীবন,সে ভক্তি চণ্ডীদাসের ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ভক্ত ঈশ্বরকে আপনার পুত্র মনে করিয়া নন্দ যশোদার ন্যায় তাঁহার প্রতি বাৎসল্য ভাবে ভক্তি প্রকাশ করে, চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে ভক্ত ঈশ্বরকে বন্ধু ভাবে শ্রীদাম সুদামের ন্যায় ভক্তি করে,চণ্ডীদাসের ভক্তি সে ভক্তি নহে ; যে ভক্তিতে বা প্রেম ভক্তিতে রমণী মনোগত নায়কের প্রতি অনুরক্ত হয়,চণ্ডীদাসের ভক্তি সেই ভক্তি। ইহাতেও একটুকু বিশেষ আছে।

পরিণীতা ভার্য্যা যে ভক্তিতে ধর্ম্ম কামার্থ লাভের উদ্দেশে আপন স্বামীকে আত্মসমর্পণ

করে,সে ভক্তি চণ্ডীদাসের ভক্তি নহে ; রমণী যেরূপ প্রেমচাঞ্চল্যের বশীভূত হইয়া পর পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হয়, ভক্ত যদি সেইরূপ প্রেমচাঞ্চল্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে,তাহা হইলেই চণ্ডীদাসের ভক্তি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন। যথা গৌতমীয় তন্ত্রে; প্রেমৈব গোপ রামাণাং কামইত্যা গমৎ প্রথাং। ইত্যাদি।

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের সহিত যে দিন চণ্ডীদাস ঠাকুরের মিলন আর আধ্যাত্মিক বিচার হয়,সেই দিন প্রশ্নচ্ছলে চণ্ডীদাস ঠাকুর বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন।

"ধৈরয ধরি তুল, নিভৃতে আলাপই,
পুছত মধুর রসিক।
রসিক হইতে কিয়ে রস উপযায়ত,
রস হইতে কি রসিক॥
রসিক হইতে কিয়ে, রসিক হোয়ত,
রসিকা হইতে কি রসিকা।
রতি হৈতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি,
কাঁহে করে মানস অধিকা।
পুছত চণ্ডীদাস, করিবঞ্জনে,
শুনইহি রূপ নারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি, ইহ রস কারণ,
লছিমা পদ করি ধ্যান॥

তিনি, কোন্ ভাবের সাধক ছিলেন, উক্ত পদের অর্থেই তাহা বিশেষ প্রমাণিত হইবে। আমরা ভক্তি গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিলেই দেখিতে পাই,ভক্ত নায়িকা,আর শ্রীকৃষ্ণ নায়ক। কোন একটী রসের বর্ণনা করিতে হইলে অবলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব, স্থায়ী, ও সঞ্চারি প্রভৃতি রসের প্রয়োজনাধিক্য অধিক হয়,এই সকলের সাহায্যে পরমাস্বাদ্য রূপ যে রস উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃত রস,সে রসের ভাণ্ডার কে?

"রসিক শেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ।"

শেখর শব্দে শৈল, পক্ষান্তরে গগন চন্দ্র, যে চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, পরন্তু রসিক শেখর কৃষ্ণচন্দ্র যিনি চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ, কোন কালে তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যথা,—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।"

সেই রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কাম হইয়া ব্রজের গোপরামাগণ যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে শ্রীবিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ঠাকুর উপাসনা করিতেন। এই জন্য তাঁহাদের কৃত ভক্তিরসসমন্বিত পদ সকল চৌষট্টি রসে পরিপূর্ণ।

বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থে নায়ক নায়িকার যে সকল সূক্ষ্ম ভাব প্রদর্শিত আছে, অবৈষ্ণব গ্রন্থে সে সকল অতি বিরল।

এখনকার কালে যিনিই যত কবি হইবার চেষ্টা করুন না কেন, নির্য্যাস রস বিনা নির্য্যাসতত্ত্ব সাধনে কবি নামে অভিহিত হইবার যো নাই। আমি যে এ কথায় একেবারে কবির আসন শূন্য করিতেছি, তা নয়। আমার এইরূপ বলার তাৎপর্য্য, ভক্তি গ্রন্থের আলোচনা ও আস্বাদ বিনা কেহ কখন প্রকৃত প্রেমের কবি হইতে পারিবেন না।

মধ্যকালে এই ভারতে শ্রীভারতচন্দ্র রায় গুণাকর শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে (ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে) কিছুদিন অবস্থিতি করিবার কালে শ্রীবৈষ্ণবের অনুগ্রহ প্রসাদাৎ ভক্তি শাস্ত্র ও নির্য্যাস তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া কবি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরন্তু তিনি কোন ভক্তিগ্রন্থ লেখেন নাই। যে একখানি কাব্য ও রসমঞ্জরী লিখিয়াছেন,তা একখানি উপরস। ঐ উপরসের ভিতর বৈষ্ণবাচার্য্য ও পদকর্ত্তাগণের ছন্দোবন্ধ রস ও শব্দ অলঙ্কার চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া কেবল ভাব উল্টাইয়া লিখিয়াছেন, চৌষট্টি রস যে কি, তা তিনি

জানিতেন। প্রকারান্তরে তা লিখিয়া ধরাও দিয়াছেন ; যথা ;—

"চন্দ্রে সবে ষোল কলা, হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণ চন্দ্র পরিপূর্ণ, চৌসট্টি কলায়॥"

নির্য্যাসতত্ত্ব ভেদ না করিলে কেহ কি এ তত্ত্ব বলিতে বা লিখিতে পারেন ?

মহাত্মা চণ্ডীদাস অলস, সম্ভোগ, রসোদগার প্রভৃতি কবিতায় যাহা কিছু উদগীরণ করিয়াছেন, সেই উদ্গীর্ণ প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে তিনি অনুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই ও লজ্জা বোধ করেন নাই। কেমন চোর দেখুন; চণ্ডীদাস ঠাকুর অলসের পদে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, কবি তাহা চুরি করিয়া নিজ কাব্যের বিরহ বর্ণনের একস্থানে অবিকল লিখিয়াছেন ; যথা ;—

"রতি মদ সাগর, নাগরী নাগর,
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর, রতি রতি নায়ক,
কুলুপিল কুলুপ কপাটে।" পদসমুদ্র।

স্থানে স্থানে এমন অনেক আছে।

বলিতে হইবে, সেই হইতে রস ভাণ্ডারের দ্বারে এক প্রকার কুলুপ পড়িয়াছে। ভারতমাতার এতদূর দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, ভারতে পূর্ব্ববৎ প্রকৃত কবি জন্মেও নাই, জন্মিবেও না। আজি এই পর্য্যন্ত ; পশ্চাৎ শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয়।

শ্রীহারাধন দত্ত।

মগধের পুরাতত্ত্ব।

মগধ অতি প্রাচীন স্থান। ঋগ্বেদে (৩৫৩।১৪) ইহা অনার্য্যজাতির বাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় ও অথর্ব্ববেদ সংহিতায় ইহা কীকট নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কীকটদেশবাসীরা আর্য্যজাতির অনুষ্ঠান করিত না, এজন্য তাহারা ব্রাত্যদিগের ন্যায় অনার্য্যজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। কীকটগণ অতি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। ভগবানে ভক্তিমান্ সাধুগণ কীকটে বাস করিলেও অপবিত্র হইবে না বলিয়া ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। এই কীকটে কলিকালে বুদ্ধদেব ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন *। টীকাকার শ্রীধরস্বামী কীকট শব্দের "গয়াপ্রদেশ" অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ত্রিকাণ্ড শেষ' অভিধানে মগধের পূর্ব্বতন নাম কীকট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটনের পূর্ব্বেই মগধে অতি পরাক্রান্ত রাজা সংস্থাপিত হইয়াছে। মহাভারতে মহারাজ জরাসন্ধের নাম উল্লিখিত আছে। গিরিবেষ্টিত গিরিব্রজপুরে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। কিরূপে ভীমসেন ও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মগধে গমন করিয়া মহাপরাক্রান্ত অসুররাজ জরাসন্ধকে নিহত করেন, তাহা মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে *

---

* যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারা স্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ। (৭।১০।১৮)
ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে, সম্মোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জন সুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি। (১।৩।২৪)

* মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টের সহস্র বা দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বতন মগধের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

উত্তীর্য্য সরযূং রম্যাং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বাংশ্চ কোশলান্।
অতীত্য জগ্মু র্মিথিলাং মালাং চর্ম্মণ্বতীং নদীং॥
অতীত্য গঙ্গাং শোণঞ্চ ত্রয়স্তে প্রাঙ্মুখাস্তদা।
কুশচীরচ্ছদা জগ্মু র্মাগধং ক্ষেত্রমচ্যুতা॥
তে শশ্বদ্ গোধনাকীর্ণং অম্বুমন্তং শুভদ্রুমং।
গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশু র্মাগধং পুরং॥

বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই অতীত কালের ইতিহাস লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অতএব জরাসন্ধের উল্লেখমাত্র করা গেল। মহারাজ জরাসন্ধের পঞ্চপর্ব্বতবেষ্টিত রাজধানী গিরিব্রজপুর অদ্যাপি 'রাজগির' নামে পরিচিত রহিয়াছে।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই পঞ্চপর্ব্বতবেষ্টিত গিরিব্রজ (= কুশাগারপুর, = রাজগৃহ, = রাজগির) নগরে বিম্বিসার রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে কপিলবস্তু-নগরে শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদন আবির্ভূত হন। এই কপিলবস্তু নগর বারাণসী ও গোরখপুরের উত্তরে হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত ছিল। রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থ নামে যে পুত্ররত্ন লাভ করেন, তিনিই উত্তরকালে বুদ্ধদেবনামে জগতের সর্ব্বত্র পূজিত ও আরাধিত হইতেছেন। সমগ্র ভূমণ্ডলের এক তৃতীয়াংশ (৫০কোটী) অধিবাসী ক্ষণে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া শুনা যায়। তিনি প্রথমে বৈশালীতে ও পরে রাজগৃহে এক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন। পরে উরুবিল্ল গ্রামের নিকটে নির্জ্জন পার্ব্বত্যদেশে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করেন। পরে বোধিদ্রুমের নিম্নদেশে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করিয়া "বুদ্ধ" হন। 'ললিতবিস্তর' নামক প্রাচীনগ্রন্থে তাঁহার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে।

একদা ভিক্ষুকবেশে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের পর এই রাজগৃহে প্রবেশ করেন। নগরবাসীরা ভিক্ষুকের অলৌকিক রূপে ও দিব্যকান্তিতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার নগর প্রবেশের বিষয় রাজা বিম্বিসারের কর্ণগোচর করে। রাজা গবাক্ষপথে দৃষ্টিপাত করিয়া ভিক্ষুকবেশী মহাপুরুষের রূপলাবণ্যে মোহিত হন। ভিক্ষুক কোথায় গমন করেন, তাহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত চর নিযুক্ত করেন। নগর হইতে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধদেব প্রবেশ দ্বার পথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বৈভার(গৃধ্রকূট ?) পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ-পূর্ব্বক আপনার ভিক্ষাপাত্র হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া আহার করিলেন। পরে সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

অনুচর মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা বিম্বিসার বহুতর অনুচরসহ শিবিকারোহণে বুদ্ধদেবের সমীপে গমন করিলেন। রাজা বুদ্ধদেবের পরিচয় প্রাপ্তে তাঁহাকে আপনার রাজধানীতে গমনের অনুরোধ করিলেন এবং রাজভোগের প্রলোভন দেখাইলেন। বুদ্ধদেব আপনার সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের বিষয় রাজাকে অবগত করাইয়া নিরস্ত করিলেন। দিব্যজ্ঞান-লাভের পর রাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ স্বীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতে, রাজার অনুরোধে বুদ্ধদেব সম্মত হইলেন। মগধের অসংখ্য পর্ব্বত-মালার নির্জ্জনতা বুদ্ধদেবকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। পক্ষান্তরে ইহাও শুনা যায় যে, বুদ্ধদেব রাজগৃহ প্রবেশের পূর্ব্বে নগরের নিকটবর্ত্তী এক তাল উপবনে অব-

এষ পার্থ মহান্ ভাতি পশুমান নিত্যং অম্বুবান্।
নিরামযঃ সুবেশ্মাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ॥
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা।
তথা ঋষিগিরিস্তাত শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ।
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্ব্বতাঃ শীতলদ্রুমাঃ।
রক্ষন্তীবাভিসংহত্য সংহতাঙ্গা গিরিব্রজং॥
অপরিহার্য্য মেঘানাং মাগধা মনুনা কৃতাঃ।
কৌশিকো মণিমাংশ্চৈব চক্রাতে চাপ্যনুগ্রহং॥
এবং প্রাপ্য পুরং রম্যং দুরাধর্ষং সমন্ততঃ।
অর্থসিদ্ধিমনুপমাং জরাসন্ধো ঽভিমন্যতে।
বয়ং আসাদনে তস্য দর্পং অদ্য হরেমহি॥

স্থিতি করেন। রাজা বিম্বিসার লক্ষাধিক অনুচর সহ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বুদ্ধদেব সকলের সমক্ষে রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আপ্যায়িত ও অনুগৃহীত করেন। পর দিন বুদ্ধদেব মহা সমারোহে বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে প্রবেশ করেন। রাজা নগর প্রান্তে আপনার মনোহর উদ্যানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই উদ্যান 'বেণুবন' নামে পরিচিত ছিল। কলন্দ নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি এই উদ্যানের পূর্ব্বতন অধিস্বামী ছিল, এইজন্য এই বেণুবন (বেলুবন)'কলন্দোপবন' বিহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটস্থ এই পিতা বিহারে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শুদ্ধোদনের ঐকান্তিক অনুরোধে কপিলবস্তুতে ১২ বৎসর পরে পিতামাতাকে দর্শন দেওয়ার জন্য আগমন করেন। পরে তিনি কোশল-রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। এইবেণুবনে অবস্থিতিকালেই কাশ্যপ, সারীপুত্র ও মোগলায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সপ্তদশতম ও বিংশতিতমবর্ষ বুদ্ধদেব রাজগৃহে, এবং একাদশতমবর্ষ নালন্দায় যাপন করেন। সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তিনি পুনরায় রাজগৃহে আগমন করিয়া রাজা বিম্বিসারকে অনুগৃহীত করেন। সারীপুত্র নালন্দায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে গৃহে জন্মগ্রহণ করেন,সেই গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সমাধিস্থ অবস্থায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে সারীপুত্র স্বীয় জননীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পিতার নাম সিংহসেন এবং পিতামহের নাম জয়সেন। সিংহসেনের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শুদ্ধোদন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। শুদ্ধোদন যে সময়ে কপিল বস্তু নগরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে রাজগৃহে মগধের সম্রাট্ ভাতীয় রাজত্ব করিতেছিলেন। কপিলবস্তু তখন মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে মগধ সম্রাটের যে পুত্র জন্মে, তিনি বিম্বিসার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পঞ্চদশতম বর্ষে বুদ্ধদেব রাজগৃহে উপনীত হইয়া, তাঁহারই সমীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমতঃ প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের বয়ক্রম তখন ৩৫ বৎসর মাত্র। ৫২বৎসর রাজত্বের পর বিম্বিসার পরলোক গমন করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া মগধে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসন লাভকরেন। তিনি ৩২ বৎসর কাল মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টমবর্ষে পয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব বৈশালীতে ধর্ম্ম প্রচারের পর কুশীনগর নামক স্থানের বনে নির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন। নশ্বরদেহ পরিত্যাগের সময়ে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ছিল। সিংহলের প্রামাণিক ইতিহাস দীপবংশ ও মহাবংশের মতে এই ঘটনা খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন ৫৪৩ অব্দে ঘটে। অতএব খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে কপিলবস্তু নগরে মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতকে পবিত্র করেন। এই সময় নির্দ্দেশে ৬৫ বৎসরের ভ্রম আছে। পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইবে।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সময় হইতে সিংহলে বৌদ্ধ শকের গণনা আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাঙ্গালার সিংহপুরের রাজা সিংহবাহুর

জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ সাতশত অনুচরসহ অর্ণবপোত আরোহণে সমুদ্র পথে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন। তত্রত্য রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি লঙ্কায় সিংহবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃষ্পুত্র পাণ্ডুবাস্ বঙ্গ হইতে গিয়া সিংহলের রাজপদ গ্রহণ করেন। ৩৭ বৎসর রাজত্বের পর বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়। এক বৎসর অরাজকতার পর, পাণ্ডুবাস রাজত্ব আরম্ভ করেন। ৩০ বৎসর রাজ্য শাসনের পর ৪০৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দের আরম্ভে তাঁহার মৃত্যু হয়। পাণ্ডুবাসের বংশধর মহাসেনের সময়ে (৩০২ খ্রীঃ) দীপবংশ পালিভাষায় লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজা মহাসেনের রাজত্বপর্য্যন্ত দীপবংশে বর্ণিত আছে। সিংহলের রাজা ধাতাসিংহের সময়ে (৪৫৯—৪৭৭খৃঃ) মহানাম মহাবংশ রচনা করেন। অনুরাধপুরে সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অবস্থিত ছিল।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর অজাতশত্রু মহা সমারোহে তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষ কুশীনগর হইতে আনয়নপূর্ব্বক রাজধানী রাজগৃহে সমাহিত করিলেন। রাজগৃহ হইতে কুশীনগর ২৫যোজন দূরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, ২৫ যোজন পথ অতিক্রম করিতে ৭মাস ৭দিন অতিবাহিত হয়। ৮০হাত গভীর গর্ত্ত খনিত হইয়া তন্নিম্নে সুদৃঢ় লৌহশলাকা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে লৌহশলাকা নির্ম্মিত মন্দির প্রবিষ্ট করান হয়। সেই মন্দির মধ্যে ছয়টী স্বর্ণ নির্ম্মিত বাক্সে বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ সংস্থাপিত হয়। বুদ্ধদেবের পিতামাতা এবং ৮০জন প্রধান শিষ্যের প্রতিমূর্ত্তি তৎসঙ্গে লৌহ মন্দিরে সমাহিত হয়।

অজাতশত্রু পুরাতন রাজগৃহ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বৈভার ও বিপুল পর্ব্বতের পাদমূলে নূতন রাজগৃহে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। বৈভার পর্ব্বতের উত্তরাংশে সত্তপাণি গুহার সম্মুখস্থ রাজগৃহের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অনতিবিলম্বে, তাঁহার মত ও উপদেশ সকল একত্র সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধদিগের প্রথম বিরাট সভা আহুত হয়। মগধরাজ অজাতশত্রু তাহা সুনির্ব্বাহ করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহার রাজ্য কোশল, মিথিলা, কাশী ও অযোধ্যা(বৈশালী)পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মিথিলা হইতে তুবাণীয় শকজাতিকে প্রাচীন বিদেহ হইতে দূরীভূত করিয়া স্বীয় রাজ্য সম্প্রসারিত করেন।

অজাতশত্রুর পর হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে যে সকল নৃপতি আরোহণ করেন, তাঁহাদের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের নাম সম্বন্ধেও পালী মহাবংশের সহিত বিষ্ণুপুরাণ, দিব্যাবদান ও অশোকাবদান গ্রন্থের বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত উভয় গ্রন্থের তিনখণ্ড প্রতিলিপি নেপাল হইতে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ হগসন (B. H. Hodgson) সাহেব আনয়ন পূর্ব্বক কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারিস নগরীর এসিয়াটিক সোসাইটী সভায় প্রেরণ করেন। মহারাজ অশোকের গুরু উপগুপ্ত স্বীয় শিষ্যকে যে সকল নীতিবিষয়ক গল্প ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহা গদ্যময় অশোকাবদানের শেষে নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রথমার্দ্ধে সম্রাট অশোকের জীবনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী পাটলী পুত্র (পালিবোথ্র) নগরে মহারাজ অশোকের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার নিকটে কুক্কুট বিহারের সংলগ্ন উপকণ্ঠিকারথ নামক উদ্যানে বৌদ্ধাচার্য্য

জয়শ্রী আপনার শিষ্যদিগকে অশোকের জীবনী বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। এই সকল উপদেশ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় 'অশোকাবদান' লিখিত হয়। ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় এই 'অশোকাবদান' অবলম্বনে রাজাধিরাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। নেপাল হইতে 'অশোকাবদান' চীনদেশে নীত হইয়া অনুবাদিত হয়। অশোকাবদান ও দিব্যাবদানে অশোকের পিতামহ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সিংহলের পালী মহাবংশের নির্দ্দেশ অধিকতর প্রামাণিক বোধে, আমরা মগধের রাজবংশাবলী তাহা হইতে গ্রহণ করিলাম। বিষ্ণুপুরাণে রাজা বিম্বিসারের পূর্ব্বতন চারি পুরুষের নাম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নে এই চারি পুস্তক হইতে মগধের রাজবংশাবলী ডাক্তর মিত্রের প্রবন্ধ হইতে প্রদর্শিত হইল।

পালী মহাবংশ	অশোকাবদান	দিব্যাবদান	বিষ্ণুপুরাণ	সিংহলের রাজা	বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান যাজক
			শিশুনাগ		
			কাকবর্ণ		
			ক্ষেমধর্ম্মন		
ভাতীয়			ক্ষত্রৈয		
বিম্বিসার (৫৭)	বিম্বিসার	বিম্বাসার	বিম্বিসার		বুদ্ধদেব
অজাতশত্রু (৩২)	মহীপাল	অজাতশত্রু	অজাতশত্রু	বিজয়সিংহ	উপালি
উদয়িভদ্রক(১৬)	উদয়ীশ	উদয়ী	দর্ভক		
অনুরুধক		উদয়িভব (মুয়ী)	উদয়াসব		
মুণ্ড	মুণ্ড		নন্দিবর্দ্ধন		
নাগদশক	কাকবর্ণি	কাকবর্ণি	মহানন্দ	পাণ্ডুবাস	দাসক
	সহলি	সহলি			
	তুরকুরি	তুলকুচি	{ সুমাল্যাদি নব নন্দ	পাণ্ডুকাভয়	শোনক
শিশুনাগ (১০)	মহামণ্ডল	মহামণ্ডল			
কালাশোক(৩৬)	প্রসেনজিৎ	প্রসেনজিৎ			
ঐ ১০ পুত্র (২২)	নন্দ	নন্দ	চন্দ্রগুপ্ত		সিগ্‌গব
চন্দ্রগুপ্ত (২৪)			বিন্দুসার		মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য
বিন্দুসার (২৮)	বিন্দুসার	বিন্দুসার			
অশোক (৩৭)	অশোক	অশোক	অশোক	মুতাসিব	মহেন্দ্র

মহাবংশ ও দীপবংশের মতে বিম্বিসার ৫৭ বৎসর, অজাতশত্রু ৩২, উদয়িভদ্রক ১৬, শিশুনাগ ১০, শিশুনাগের দশজন ভ্রাতা ২২, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ এবং অশোক ৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। দীপবংশে কালাশোক বা মহানন্দের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত দেখা যায় না। এই মহানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার নয় পুত্র মগধের সাম্রাজ্য সম্মিলিতভাবে শাসন করেন। পুরাণে ইঁহাদের মধ্যে সুমাল্য, মহাপদ্ম, নন্দ ও ধননন্দের নাম পাওয়া যায়। বিশাখ দত্ত রচিত

মুদ্রারাক্ষস নাটকের পূর্ব্বপীঠিকায় অনন্ত কবি লিখিয়াছেন যে, সুধন্বা রাজা নন্দের ঔরসে রত্নাবলী মহিষীর গর্ভে উদগ্রধন্বা, তীক্ষ্ণধন্বা, বিকটধন্বা, উৎকটধন্বা, প্রকটধন্বা, সংঘটধন্বা, বিষমধন্বা, শিখরধন্বা ও প্রখরধন্বা নামে নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সকল নাম কবির কল্পনা প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ কর্ণালে মহারাজ কুনন্দের নামাঙ্কিত একটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। পালী অক্ষরে তাহাতে 'রাজ্ঞ কুনন্দস্য অমোঘভ্রাতিস্য মহরাজস্য' এই কয়েকটী শব্দ অঙ্কিত ছিল। শেষ নন্দের রাজত্বকালে ৩২৭ খ্রীঃ পূঃ মহাবীর আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। ইহাদের উচ্ছেদ চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলে সাধন করিয়া, অনুমান ৩১৬খ্রীঃ পূঃ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পাটলী পুত্র নগরে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মগধে মৌর্য্যবংশের আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নব যুগের আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক কাল গণনা প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। রাজগৃহ হইতে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী পাটলিপুত্র (কুসুমপুর মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বা পুষ্পপুর) রাজধানী নীত হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মগধ সম্রাটের অপ্রতিহত প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময়ে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধাচার্য্য উপালীর বয়স ৪৪ বৎসর ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে বৌদ্ধশাস্ত্রীয় ত্রিপিটক শিক্ষা দিয়া, বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম সবিশেষ প্রচারিত করেন। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির(৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ) পর ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রধান আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে আচার্য্য উপালির মৃত্যু ঘটে। ৫১৩ খ্রীঃ পূঃ এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উপালির প্রিয় শিষ্যদাসক বৌদ্ধাচার্য্যের গৌরবান্বিত পদে অধিরূঢ় হন।

মহাবংশ ও দীপবংশের নির্দ্দেশ অনুসারে খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন এবং তাঁহার ২১৮ বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে মহারাজ অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অশোকের রাজ্যারম্ভকাল খ্রীঃ পূঃ ২৬০ অব্দ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এই গণনা অনুসারে দীপবংশ ও মহাবংশের সময় নির্দ্দেশে ৬৫ বৎসরের ভ্রম পাওয়া যাইতেছে। আমরা বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৫৫৮ বর্ষ হইতে ১৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত মহাবংশ ও দীপবংশের সুপণ্ডিত টার্ণার ও বুলার সাহেব কৃত আংশিক মূল ও অনুবাদ এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রবন্ধাদি দৃষ্টে যে সময় নির্ণয়তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিলাম। বৌদ্ধ সাহিত্য অপার সমুদ্র বিশেষ। তাহার যথোচিত আলোচনা অদ্য পর্য্যন্তও হয় নাই। যথাসাধ্য চেষ্টায় যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা যে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইবে,এমত আশা করিতে পারি না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সময় নির্ণয় বড়ই দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা হইতেছে,তদ্দ্বারাই ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। সুপণ্ডিত Rhys Davids সাহেব দীপবংশের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া, অশোক ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অন্তর ১৫০বৎসর মাত্র অনুমান করেন। তাঁহার অনুমান যে কল্পিত ও অমূলক,তাহাতে সন্দেহ নাই।

খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮ কপিলবস্তু নগরে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের (বুদ্ধদেব) মহামায়ার গর্ভে জন্ম।

খ্রীঃ পূঃ ৫৪২ কলির রাজা সুপ্রবোধের তনয়া যশোধারার সহিত বুদ্ধদেবের বিবাহ।

খ্রীঃ পূঃ ৫২৯ বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন।

,, ,, ৫৫৩ মগধরাজ ভাতীয়ের পুত্র বিম্বি-সারের রাজগৃহে জন্ম।

,, ,, ৫১৮ রাজা ভাতীয়ের মৃত্যু ও বিম্বি-সারের সিংহাসন প্রাপ্তি।

,, ,, ৫২৩ বুদ্ধদেবের রাজগৃহে আগমন ও বিম্বিসারের নিকট ধর্ম্মপ্রচার।

,, ৫২২ বৌদ্ধাচার্য্য উপালির জন্ম।

,, ৫২০ নালন্দায় সারীপুত্রের নির্ব্বাণ লাভ ও বুদ্ধদেবের রাজগৃহ হইতে কপিলবস্তু নগরে পিতামাতার অনুরোধে গমন।

,, ৪৮৬ রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু ও অজাত-শত্রুর মগধে রাজত্ব আরম্ভ।

,, ৪৭৮ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভ ও সিংহপুরের রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলে রাজত্বপ্রাপ্তি।

,, ৪৫৪ মগধরাজ অজাতশত্রুর মৃত্যু ও উদয়-ভদ্রের রাজপদ প্রাপ্তি।

,, ৪৪৮ প্রধানতম বৌদ্ধাচার্য্য উপালির মৃত্যু ও তাঁহার শিষ্য দাসকের তৎপদে নিযুক্তি।

,, ৪৪১ রাজা বিজয়সিংহের সিংহল দ্বীপে মৃত্যু।

,, ৪৩৯ বিজয়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গ-দেশ হইতে গমন ও সিংহলের রাজপদ প্রাপ্তি।

,, ৪৩৮ মগধরাজ উদয়ভদ্রের মৃত্যু।

,, ৪৩০ নাগদশকের মগধের সিংহাসন প্রাপ্তি।

খ্রীঃ পূঃ ৪০৯ সিংহলরাজ পাণ্ডুবাসের মৃত্যু।

,, ৪০৬ মগধরাজ নাগদশকের মৃত্যু ও শিশু নাগের রাজ্যপ্রাপ্তি।

,, ৩৯৮ প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য দাসকের মৃত্যু ও তাঁহার শিষ্য শোনকের তৎপদে নিযুক্তি।

,, ৩৮৬ রাজা শিশুনাগের মৃত্যু ও তৎপুত্র কালাশোক মহানন্দের রাজ্যলাভ।

,, ৩৭৮ দ্বিতীয়বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের বৈশালী নগরে অধিবেশন।

খ্রীঃ পূঃ ৩৬০ কালাশোকের মৃত্যু ও সুধন্বা নন্দের মগধের সিংহাসন লাভ।

,, ৩৫৪ আচার্য্য শোনকের মৃত্যু ও তাঁহার শিষ্য চণ্ডবজ্রের তৎপদপ্রাপ্তি।

,, ৩৩৮ কুনন্দাদি নব নন্দতনয়ের রাজ্যলাভ, ও নন্দের মৃত্যু।

,, ৩১৬ নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসন লাভ।

,, ৩১৫ সিরিয়ার রাজা সেলিউকাস নাই-কেটরের পঞ্জাব আক্রমণ।

,, ৩০৫ মহারাজ অশোকের জন্ম।

,, ৩০২ আচার্য্য সিগ্‌গবের মৃত্যু ও মোগ্‌গ-লিপুত্র তিষ্যের তৎপদে নিযুক্তি।

,, ২৯২ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু ও তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজপদ প্রাপ্তি।

,, ২৭৭ অশোকের উজ্জয়িনীর শাসনকার্য্যে নিযুক্তি।

,, ২৭৪ অশোকের পুত্র মহেন্দ্রের জন্ম।

,, ২৭২ মহেন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী সঙ্ঘমিত্রার জন্ম।

,, ২৬৪ রাজা বিন্দুসারের মৃত্যু ও রাজকুমার-গণের বিরোধে অশোকের জয়।

,, ২৬০ সাম্রাজ্যে বিদ্রোহদমনের পর মহা-রাজ অশোকের পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষেক।

,, ২৫৭ গুরু উপগুপ্ত হইতে মহারাজ অশো-কের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও নিগ্রোধের বৌদ্ধধর্ম্ম যাজকের পদে অভিষেক।

,, ২৫৬ অশোকের ভ্রাতা তিষ্যের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও এণ্টিয়োকাসের সহিত সন্ধি।

,, ২৫৪ মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ।

,, ২৫২ কুন্তীবংশীয় বৌদ্ধরাজকুমার তিষ্য ও সুমিত্রকের মৃত্যু।

" ২৫১ অশোকের প্রথম খোদিত শাসন-লিপি প্রচার এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার।

" ২৪৯ মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের দ্বিতীয় শাসনলিপি প্রচার।

" ২৪৮ পার্থিয়ায় বিদ্রোহ।

" ২৪৬ বাক্ট্রিয়ায় বিদ্রোহ।

" ২৪৪ রাজকুমার মহেন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক পদে নিযুক্তি।

" ২৪২ তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার সিংহলযাত্রা এবং বরাবর পর্ব্বতগুহায় শাসন লিপি প্রচার।

" ২৩৪ প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য মোগ্গলিপুত্র তিষ্যের মৃত্যু ও রাজকুমার মহেন্দ্রের তৎপদে অভিষেক এবং আলাহাবাদের স্তম্ভলিপি প্রচার।

" ২৩১ অশোকের প্রথমা রাজ্ঞী অসন্ধিমিত্যার মৃত্যু।

" ২২৮ অশোকের দারান্তর গ্রহণ।

" ২২৬ নবীনা রাজ্ঞীর বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম বিনাশের চেষ্টা।

" ২২৫ মহারাজ অশোকের সিংহাসন পরিত্যাগ।

" ২২৪ সহস্রাম ও রূপনাথের খোদিত শিলা লিপি প্রচার।

" ২২৩ মহারাজ অশোকের মৃত্যু।

" ২০২ সিংহল রাজ উত্তিয়ের রাজ্যাভিষেক।

" ১৯৪ প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য মহেন্দ্রের সিংহলে মৃত্যু।

" ১৯৩ মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্রার সিংহলে মৃত্যু।

" ১৬১ সিংহলরাজ দুথগামিনীর রাজ্যাভিষেক।

মগধ বৌদ্ধধর্ম্মের সূতিগৃহ। মগধেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথমবিকাশ হয় এবং বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমের তলে যোগাসনে বসিয়া বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করেন। প্রাচীন ও পবিত্রতায় মগধের সমকক্ষ হইতে পারে, ভূমণ্ডলে এমন স্থান বোধ হয় আর নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতার তীর্থস্থান গুলি এক্ষণে গয়া ও পাটনা জেলার অন্তর্ভুক্ত। মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টমবর্ষে বুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন হইয়া কুশীনগরে নির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন। বুদ্ধদেবের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের রাজগৃহে জন্ম হয়। কাশ্যপ শোকে রাজগৃহের বেণুবনে দীক্ষিত হন। ইন্দ্রগুপ্ত রাজগৃহ হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদিগের সহিত সিংহলে গিয়া অনুরাধপুরের প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের ৬১ দিন পরে রাজা অজাতশত্রুর বিশেষ সাহায্যে ও উদ্যোগে বৌদ্ধদিগের প্রথম মহাসঙ্ঘ রাজগৃহে সমবেত হয়। এই মহাসঙ্ঘে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক গুলি একত্র সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইয়া তিন অংশে (পিটকে) বিভক্ত হয়। বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত শিষ্যপ্রদত্ত উপদেশাবলী সূত্রভাগে, বৌদ্ধধর্ম্মের যাবতীয় নিয়মাবলী বিনয়ভাগে, এবং অভিধর্ম্মপিটকে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও দার্শনিক তত্ত্বাবলী প্রাকৃত মাগধী ভাষায় সংগৃহীত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের চিরস্থায়িত্ব বিধান করে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির শত বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৮ অব্দে) মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। সভাকামী এই মহাসভার সভাপতি ছিলেন। শোনক সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানতম আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উত্তরস্থ বৌদ্ধদিগের মতে এই মহাসভা ৩৬৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পাটলীপুত্র নগরে সমবেত হয়। মহারাজ অশোকের

রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ২৩৬ বৎসর পরে (২৪২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে) জগদ্বিখ্যাত সম্রাট অশোকের বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে পাটলীপুত্র (পালিবোথ্র) নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘ সমবেত হয়। মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বৌদ্ধসঙ্ঘে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বৌদ্ধমতের সামঞ্জস্য বিধানের বিশেষ চেষ্টা হয়। এই মহাসভায় বৌদ্ধসঙ্ঘে সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য চারিদিকে প্রচারক প্রেরণের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। ২৪২ খৃঃ পূঃ রাজকুমার মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য স্বীয় ভগিনী সঙ্ঘমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুরে উপনীত হয়েন। মুতাসিব সেই সময়ে সিংহলের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানতম ধর্ম্মাচার্য্য মহেন্দ্র সিংহলরাজ উত্তিয়ের রাজত্বের অষ্টমবর্ষে ১৯৪ খ্রীঃ পূঃ মানবলীলা সংবরণ করেন। মহেন্দ্রের সিংহল যাত্রার সময়ে গান্ধার, কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক প্রেরিত হয়।

মহেন্দ্র সিংহলে যাবতীয় বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র (ত্রিপিটক) পাটলীপুত্র হইতে নিজের সঙ্গে লইয়া যান এবং তাহা মাগধীভাষা হইতে সিংহলীভাষায় অনুবাদিত করেন। বুদ্ধদেবের সময়ে তাঁহার উপদেশ বাক্য লিখিত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বুদ্ধদেবের প্রিয়শিষ্য অর্হৎ ও শ্রমণগণ গুরুবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ৬১ দিন পরে ত্রিপিটকের মূল নির্দ্ধারণের জন্য রাজগৃহে প্রথম মহাবৌদ্ধসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। ত্রিপিটকের মূল আদ্যোপান্ত শুদ্ধরূপে স্মরণ শক্তির বলে উচ্চারিত হইয়া, সমবেত বৌদ্ধাচার্য্য অর্হৎদিগের অনুমোদন ক্রমে তাহা ভবিষ্যতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহাসঙ্ঘের * অধিবেশনেও প্রথমাধিবেশনের নির্দ্ধারিত মূল আবৃত্ত হইয়া, তাহার শুদ্ধাশুদ্ধতা নিরূপিত হয়। পূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিবৃত ও গৃহীত হয়। ত্রিপিটক এইরূপে লিপিবদ্ধ না হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য অর্হৎ ও ভিক্ষুদিগের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রভাবে ৪০০ বর্ষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়। অবশেষে রাজা বর্ত্তগামিনীর সময়ে (১০৪ ৭৬ খ্রীঃ পূঃ) পিটকত্রয়ন ও তাহার অর্থকথা (ভাষ্য) সিংহল দ্বীপে তাহা প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ হইয়া ত্রিপিটকের চিরস্থায়িত্ব বিধান করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পালীভাষায় লিখিত এবং নেপালীয় বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থাবলী সংস্কৃত ভাষায় প্রথমতঃ লিখিত হইয়া তিব্বতী, চৈনিক ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। সিংহল হইতে প্রাচীনতর বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরাকান, পেগু, ব্রহ্মদেশ, সায়াম, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম পূর্ব্বক জাপানে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সিংহলীয়

* উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদির মূল বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ৫০০ বৎসর (তিব্বতীয় জনপ্রবাদ মতে ৪০০ বৎসর) পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরাক্রান্ত শকরাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে স্থিরীকৃত ও নির্দ্ধারিত হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ২৩৬ বৎসরের মধ্যে যাহার মূল তিনবার মহাসঙ্ঘের অধিবেশনে স্থিরীকৃত ও পরিশোধিত হইয়াছে, তাহা যে ৪০০ কি ৫০০ বৎসর পরের নির্দ্ধারণ অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক ও সাবধান হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। এই কনিষ্ক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি যে শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন, তাহা স্থলান্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন ও অধিক প্রামাণিক, তাহা সুপণ্ডিত হগ্‌সন্ সাহেবকেও অবশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছে। টার্ণার, বিল, ডেভিড্‌স্, কারণ, ওয়েবার প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহুতর যুক্তি তর্কের অবতারণা দ্বারা সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা পালী বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব, সারবত্তা ও প্রামাণিকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। *

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'দীপবংশ' ও পঞ্চম শতাব্দীতে 'মহাবংশ' নামক দুই পালী গ্রন্থে সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও রাজবংশের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থকার তারানাথ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ভট্টঘটি, ইন্দ্রদত্ত ও ক্ষেমেন্দ্রভদ্র তাঁহার পূর্ব্বতন উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তারানাথের গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গলার ইতিহাসও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তারানাথের তিব্বতী ভাষায় রচিত ইতিহাস এবং অন্যান্য তিব্বতীয় ও চীনদেশীয় পুস্তক অবলম্বনে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে সুপণ্ডিত ওয়াসিলজিউ (W. Wassilijew) রুসীয় ভাষায় উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ জার্ম্মেন পণ্ডিত সিফনার তারানাথের গ্রন্থ জার্ম্মেন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিতবর বার্ণুফের ন্যায় রুসিয়াবাসী ওয়াসিলজিউ উত্তরীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস অধ্যয়ন ও সংগ্রহে চিরজীবন অতিবাহিত করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস আমাদের এক্ষণে আলোচ্য বিষয় নহে। যথোচিত ভাবে তাহা লিখিয়া সম্পন্ন করা আমাদের সাধ্যাতীত বিরাট ব্যাপার। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখকের সংস্কৃত, পালী, তিব্বতী, চীনীয় ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তির সহিত ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মগধের পুরাবৃত্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে সংসৃষ্ট বলিয়া, আমরা সংক্ষেপে সেই বিষয়ে দুইচারি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

রাজগৃহের প্রথম মহাবৌদ্ধসঙ্ঘে ৪৭৮ খ্রীঃপূঃ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া, ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বিনয়-পিটক পাঁচ অংশে বিভক্ত। তাহাতে ৪২২৫০ টী গাথা বা শ্লোক আছে। বিনয়-পিটকের ভাষ্যে ২৭০০০ গাথা আছে। সূত্র-পিটক সাতভাগে বিভক্ত। তাহাতে ১৪২২৫০টী গাথা ও তাহার ভাষ্যে ২৫৪২৫০টী গাথা আছে। অভিধর্ম্ম-পিটকে [illegible]২৫০টী গাথা এবং তাহার ভাষ্যে [illegible]টী গাথা আছে

* উত্তরীয় ও দক্ষিণীয় বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত হগসন্ টার্ণার সাহেবের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তর্ক বিতর্ক চলে। ১৮৩৭ খ্রীঃ সিংহলে টার্ণার সাহেব মহাবংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি দীপবংশও অনুবাদ করেন। মূলে উভয় পালী গ্রন্থের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৫০ খ্রীঃ R. Spence Hardy সাহেব Eastern monarchism এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ Manual of Buddhism প্রকাশ করেন। পাদরি Bigandet ব্রহ্মদেশীয় পালী ও Alabaster সায়ামের ভাষা হইতে বুদ্ধদেবের জীবনী অনুবাদিত করিয়াছেন। Fausboll, Rhys Davids, Childers, Mason, Senart, মধুকুমারস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পালী ভাষার আলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

Csoma Korosi, B. H. Hodgson, Foneaux, Schmidt, Feer, Beal, W. Wassiljew, Schiefner, Bumony, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু শরচ্চন্দ্র দাস ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নেপালী ও তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনায় বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বলিয়া শুনা যায়। যাবতীয় পিটকে ৮৪০০০ খণ্ড, ৭৩৭০০০ গাথা (ভাষ্য সহ) এবং ২৯-৩৬৮০০০ অক্ষর আছে।

৩১৬ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত (তমলুক) পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হয়। অনুমান ৩১৫ খ্রীঃ পূঃ সেনাপতি ও সিরিয়ার পরাক্রান্ত রাজা সেলিউকাস নিকেটর পঞ্জাব আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের নিকট আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া, মগধসম্রাটের সহিত সন্ধিবন্ধন করিতে বাধ্য হন। ৩১২ খ্রীঃ পূঃ তিনি স্বরাজ্যের বিদ্রোহ দমনার্থ ব্যাবিলনে প্রত্যাবৃত হন। মিগাস্থিনিস নামে জনৈক সুচতুর গ্রীক সেলিউকাসের দূতরূপে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হন। গ্রীক দূতের লিখিত বিবরণে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সবিশেষ বর্ণিত আছে।

চন্দ্রগুপ্তের মগধ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় রাজগৃহ হইতে ভাগীরথী ও শোনের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলীপুত্র নগরে মগধের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে প্রতিষ্ঠিত হন। এই ঘটনা অবলম্বনে বিশাখদত্ত "মুদ্রা রাক্ষস" নাটক রচনা করেন। ২৪ বৎসর রাজত্বের পর স্বীয় পুত্র বিন্দুসারের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তর গমন করেন। চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার উভয়েই হিন্দুধর্ম্মের অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বিন্দুসার ২৮ বৎসর রাজত্বের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নী নাপিতানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজান্তঃপুরের দাসী মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত এই বংশ মগধে প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া, ইহা মৌর্য্যবংশ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। ৩২৭ খ্রীঃ অব্দে শেষ নন্দের সময়ে আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ পূর্ব্বক শতদ্রুর তীরপর্য্যন্ত অগ্রসর হন। চন্দ্রগুপ্ত মগধ হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে উপনীত হন। আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার শিবিরে তিনি কয়েক দিন অবস্থিতি করেন এবং মগধ আক্রমণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। চন্দ্রগুপ্তের ধৃষ্টতায় দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে, চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক্ সম্রাটের শিবির হইতে পলায়ন করেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্ত্তনের পর চন্দ্রগুপ্ত কিছুকাল পঞ্জাবে অবস্থিতি করিয়া একদল সেনা সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের সাহায্যে ও চাণক্য পণ্ডিত নামে এক নন্দবিদ্বেষী ব্রাহ্মণের মন্ত্রণাকৌশলে নন্দবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করিয়া, মগধের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি সুধন্বানন্দের জারজপুত্র বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। নন্দবংশের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংস্রব না থাকিলে, মগধে তাঁহার আধিপত্য এত সহজে ও অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না।

চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রে আপনার রাজধানী সংস্থাপন করেন। রাজধানী দৈর্ঘে ৪ ক্রোশ এবং প্রশস্ততায় প্রায় ১ক্রোশ পরিমিত ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠময় উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, প্রাচীরের বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ জলপূর্ণ পরিখা খনিত হইয়াছিল। নগর প্রবেশের জন্য ৬৪টী দ্বার বিদ্যমান ছিল। পরিখা ৪০০হাত প্রশস্ত ও ৩০ হাত গভীর ছিল। প্রাচীর গাত্রে ৫৭০টী অস্ত্রাগার ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীকদূত মেগা-

স্থিনিস দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে চন্দ্রগুপ্তের অসীম ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সহিত হিন্দুদিগের সভ্যতার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে ১১৮টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই সকল রাজ্যের অধিকাংশে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। মগধে ইতিপূর্ব্বে যে সকল রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন না। শ্রীত্রৈলোকানাথ ভট্টাচার্য্য।

"রূপসনাতন" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

বর্ত্তমান ১৩০১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের "নব্যভারত" পত্রে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়, বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী এবং আনুষঙ্গিক ভগবান চৈতন্যদেবের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া "রূপ ও সনাতন গোস্বামী" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পাঠে কতিপয় কৃতবিদ্য বৈষ্ণব বন্ধু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিবাদ নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। যদিও স্বেচ্ছাচার-প্রসূত উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা বিড়ম্বনা মাত্র, তথাপি বৈষ্ণব বন্ধুগণের অনুমতি পালন অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে প্রতিবাদ করিতে হইল।

বটব্যাল মহাশয় প্রথমতঃই ইতিহাস-নিরপেক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন, "এই দুই ভ্রাতার (রূপ সনাতনের) প্রকৃত অর্থাৎ পিতা মাতার রক্ষিত নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় নাই," ইত্যাদি। বাস্তবিক একথা প্রামাণিক নহে; রূপ ও সনাতনই যে আদি নাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা রূপ সনাতনের প্রথিত নামা ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামীর লিখিত নিজ বংশাবলী এস্থলে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছি (১)। বিষয়ে লিপ্ত থাকা কালে ইহাঁদিগের প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে "সাকর মল্লিক" ও দবির খাস" নাম সাধারণ্যে প্রচলিত হয়। চৈতন্য দেব, পরিশেষে সেই পূর্ব্ব নামেরই প্রচার করিয়াছেন। পরন্তু মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপ সনাতনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় নাই; পূর্ব্ব বঙ্গের বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ও ফতোয়াবাদ গ্রামে পিতৃভবনে ইহারা লালিত পালিত হইয়াছেন। রূপ সনাতনের পিতা কুমার দেব নৈহাটির পূর্ব্ব বাস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, জীব গোস্বামীর লিখিত বংশাবলী ও "ভক্তিরত্নাকর" প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশদ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (২)। পরন্তু রূপ গোস্বামী যে "সাকরমা" গ্রামে বাস করিয়াছেন, ইতিহাসে ইহার কোন প্রমাণ নাই। উভয় ভ্রাতাই যে রামকেলী গ্রামে বাস করিয়াছেন, ইহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (৩) তবে

(১) আদিঃ শ্রীল সনাতন স্তদনুজ শ্রীরূপ নামাততঃ। ইত্যাদি।

(২) জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হইল মনে।
ছাড়িলেন নরহট্ট গ্রাম সেইক্ষণে॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্র দ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥
যশোরে ফতোয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিলা আলয়॥
(ভক্তিরত্নাকর ১ তরঙ্গ)
উক্ত প্রমাণানুসারে জানা যাইতেছে, রূপ সনাতনের পিতা কুমার দেবের দুই স্থানে দুইটি বাটী ছিল।

(৩) গৌড়ে রামকেলী গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥ ইত্যাদি
(ভক্তিরত্নাকর)

'সাকর মল্লিক' হইতে "সাকরমা" গ্রামের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। কেননা আজিও প্রধান ব্যক্তিদিগের নামে গ্রাম নগরের নামকরণ হইতে দেখা যায়।

রূপ-সনাতন, এই পিতৃ ভবনেই লালিত পালিত ও সংস্কৃত পারস্যাদি ভাষাতে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ইঁহাদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রসংশাবাদ নানা দেশে ঘোষিত হওয়াতে গৌড়াধিপতি হোসেন সাহ ইঁহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান, এবং রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করেন। ভক্তি রত্নাকরানুসারে জানা যায়, গৌড়াধিপতি ইঁহাদিগকে একটি রাজ্য ও প্রদান করিয়াছিলেন। (৪)

কতকগুলি অনভিজ্ঞ লোকের ন্যায় বটব্যাল মহাশয় রূপ সনাতনকে যে ম্লেচ্ছ কুলোৎপন্ন বলিয়া স্থির করেন নাই, ইহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তবে তিনি যে কারণে রূপ সনাতনের হিন্দুত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন, তদপেক্ষা সুস্পষ্ট আরও কারণ আছে, তাহা রূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বৈষ্ণব দর্শন প্রণেতা জীব গোস্বামীর লিখিত বংশাবলী ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ও বংশাবলী অনুসারে রূপ সনাতনকে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বলিয়া জানা যায়। আরও জানা যায় যে, ইঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা ছিলেন। (৫)

বটব্যাল মহাশয় "বোধহয়" শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা ইতিহাসের আশ্রয়ে তদ্বিপরীতে বলিতে সাহসী হইতেছি যে, রূপসনাতন নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন নাই, এবং পাঠদ্দশাতে চৈতন্য দেবের সহিত তাঁহাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুই ভ্রাতার মধ্যে কে বড় কে ছোট, এ বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাসে কিছুমাত্র মত ভেদ নাই। কোন সন্দেহেরও কারণ নাই। সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থেই সনাতনের জ্যেষ্ঠত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপের নাম পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কেহ কেহ রূপের জ্যেষ্ঠত্ব অনুমান করেন; কিন্তু বৈষ্ণব সমাজে এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। রূপ গোস্বামী অগ্রে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন বলিয়া সনাতনের অভিমতানুসারেই তাঁহার নাম অগ্রে কীর্ত্তিত হয়। হোসেন সাহ সনাতনকে তিরস্কারের সময় "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার" ইত্যাদি যাহা বলেন, তাহাতে "বড় ভাই" শব্দ রূপ গোস্বামী সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই,

(৪) সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে॥
গৌড়ে রাজা যবন অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্য ভার॥
ম্লেচ্ছ ভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হইল তার॥
রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া।
রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া॥ ইত্যাদি।
(ভক্তিরত্নাকর)

(৫) রেজে রাজসভা সভাজিত পদঃ কর্ণাট ভূমী পতিঃ।
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর্ভু বি ভরদ্বাজান্বয় গ্রামণী॥
(বংশাবলী)

শ্রীজীব গোস্বামীর সপ্ত পুরুষ প্রচার।
প্রথম হইতে নাম করি তা সবার॥
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ॥
সর্ব্ববেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম।
কর্ণাট দেশের রাজা নাহি যার সম॥ ইত্যাদি
(ভক্তিরত্নাকর)

সনাতনের অগ্রজ সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। সনাতনের যে আরও জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, জীবকৃত বংশাবলীই তাহার প্রমাণ। কুমার দেবের কেবল ৩ টি মাত্র পুত্র নহে; অনেক গুলি পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কুমার দেবের পুত্রগণের মধ্যে রূপসনাতন সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। (৬)

কনিষ্ঠ অনুপমও চৈতন্য দেবের কৃপা পাত্র বলিয়া ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এই রূপ রূপসনাতনের অনেক গুলি ভ্রাতুষ্পুত্র সত্ত্বে ও এক মাত্র জীবই ভগবৎ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। অতএব হোসেন-সাহ সনাতনের তিরস্কার উপলক্ষে যে"বড় ভাই" শব্দের উল্লেখ করেন, তাহা রূপগোস্বামীর পরিচায়ক নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। পরন্তু সনাতন গোস্বামী যে রূপগোস্বামীর জ্যেষ্ঠ, অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই ইহার বিশদ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,সন্দেহ করিবার কিছু-মাত্র কারণ নাই। অতএব বটব্যাল মহাশয়ের রূপ গোস্বামীকে দুরাচার দস্যুরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এস্থলে নিতান্তই ব্যর্থ হইতেছে।

রূপ সনাতন যে ম্লেচ্ছ সংসর্গে কথঞ্চিত দূষিত হইয়াছিলেন, একথা অস্বীকার্য্য নহে, দূষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই চৈতন্য দেবের কাছে "ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম" ইত্যাদি দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং এই কারণ বশতঃই ইহারা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। পরন্তু "দরবেশ হইয়া আমি মক্কাতে যাইব" ইত্যাদি কথা যবনকারাধ্যক্ষের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন। আর, পথে পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে তিনি দরবেশের বেশে কাশী যাত্রা করিলেও, তাহা যবনত্বের প্রমাণ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছ রাজগণের অধিকৃত হওয়ার পর অদ্যাপি যখন ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতি অর্থলোভে ম্লেচ্ছ রাজপুরুষ গণের পদসেবন করিতেছেন,তখন রূপসনাতনের গৌড় রাজের মন্ত্রীত্ব স্বীকার করা শোচনীয় ঘটনা মধ্যে পরিগণিত হইবে কেন? প্রথম জীবনে ইহারা যদি প্রলোভনে ভুলিয়াও থাকেন, তাহাতেই বা অসাধারণ কি দোষ হইয়াছে? সেকালে রূপসনাতন যেরূপ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, আজকাল ইংরাজ রাজ্যে অধিকাংশ উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী কি ততোধিক নহেন, আজ কাল আর অনুতাপ নাই, প্রায়শ্চিত্ত ও নাই, কিন্তু সেকালে, রূপসনাতনের বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হইলে, তাঁহারা অনুতাপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, রূপ সনাতনের বিবেক বৈরাগ্যও বটব্যাল মহাশয় ছিদ্রানুসন্ধান করিতে বিস্মৃত হন নাই। বিবেক বৈরাগ্যের তাড়নায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রূপ গোস্বামী গৌড় রাজের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন, সমগ্র বৈষ্ণব ইতিহাসের ইহাই অবিসম্বাদিত মত; কিন্তু বটব্যাল মহাশয়ের মতে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি দুষ্কার্য্যই রাজার কোপের কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার" সনাতন গোস্বামীর প্রতি গৌড়

(৬) তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ পৃষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে। ইত্যাদি। (বংশাবলী)

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল প্রদীপ পরম শুদ্ধাচার॥
কুমার দেবের হইল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥
সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।

(ভক্তিরত্নাকর, ১ম, তরঙ্গ)

রাজের এই ভর্ৎসনা বাক্যই রূপ গোস্বামীর দুষ্কার্য্যপরায়ণতা সম্বন্ধে বটব্যাল মহাশয়ের অকাট্য প্রমাণ ; কিন্তু রূপ গোস্বামী যে সনাতন গোস্বামীর বড় ভাই নহেন, বৈষ্ণব গ্রন্থ সকলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। (৭)

প্রকৃত অর্থ বোধ না হইলেও নিজের অনুকূল মনে করিয়া, বটব্যাল মহাশয় "তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার" ইত্যাদি চৈতন্য চরিতামৃতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু উক্ত গ্রন্থে রূপ সনাতনের বৈরাগ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই। লিখিয়াছেন "চৈতন্য চরিতামৃতে তাহাদের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহা অসংলগ্ন বোধ হয়, প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইলে একখানা কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া গেলেই হয়। শাস্ত্র বিধানানুসারে কর্ত্তব্য পালন না করিয়া কেবল কৌপীন পরিধান করিয়া বাহির হইয়া গেলেই যে হয় না, লেখক মহাশয় বোধ হয় এবিষয় অবগত নহেন।"

অতঃপর তিনি রূপ সনাতনের পুরশ্চরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কিন্তু পুরশ্চরণের কথা সত্য হইলেও তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভিন্নরূপ ছিল, গ্রহ দুর্ব্বিপাকের কোন শান্তি কার্য্য করাইয়াছিলেন, হইতে পারে, ইত্যাদি। ইতিহাসের বিরুদ্ধে এরূপ অন্তর্য্যামিত্ব প্রকাশ করা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভিন্ন রূপ ছিল, ইহা তিনি জানিলেন কিরূপে? "নিশ্চয়" শব্দের পরিবর্ত্তে "বোধহয়" শব্দ ব্যবহার করিলে কতকটা ভাল হইত নাকি? পরন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে ;—

শ্রীরূপ গোসাই তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা॥

এস্থলে বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন—"এত "পাগল বুচকী আগলের কথা" চৈতন্য চরণ পাইবার জন্য এক নৌকা ভরা ধনের আবশ্যক কি?" এ প্রশ্নের উত্তর চৈতন্যচরিতামৃত হইতে তিনি নিজেই ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা ;—"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধধনে" ইত্যাদি। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সঞ্চিত অর্থ রাশির সদ্ব্যয় না করিয়া "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" করিলেই কি চৈতন্য প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হইত? সদ্ব্যয় করিয়াও রূপগোস্বামী লেখকের কাছে অপরাধী !!! গুণে দোষারোপের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

"আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ" এই নীতি অনুসারে সনাতন গোস্বামী গৌড়ে যে দশহাজার টাকা গোপনে রাখেন, ইহাকে প্রভূত অর্থ বোধ করিয়া লেখক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন, এ টাকা তাঁহার সম্বন্ধে প্রভূত বটে, কিন্তু গৌড় রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা সনাতনের সম্বন্ধে অতি সামান্য। বিষয় ত্যাগ নিমিত্ত গৌড় রাজের বিরাগভাজন হওয়াতে অগত্যা উক্ত অর্থ সংগোপনে রক্ষিত হইয়াছিল। বিপদ উদ্ধারই ইহার উদ্দেশ্য। এই অর্থদ্বারাই সনাতন কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারামুক্তির পর তিনি যখন কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি কপর্দ্দকও রাখেন নাই। রাজমহলে দস্যু হস্তে পতিত হইলে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহার সহচরের কাছে

---

(৭) আদিঃ শ্রীল সনাতন স্তদনুচঃ শ্রীরূপ নামা ততঃ। ইত্যাদি।

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ ভক্তভূপ।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ॥
সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়।
শ্রীজীব গোস্বামী হন তাঁহার তনয়॥

(ভক্তিরত্নাকর)

এস্থলে "আদি" ও" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শব্দ রূপ ও বল্লভ এই দুই ভ্রাতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা আছে; তৎক্ষণাৎ সেই মুদ্রা দস্যুকে প্রদান ও ভর্ৎসনা পূর্ব্বক সেই সহচরকে পরিত্যাগ করেন।

বটব্যাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "রূপ যে বহুতর অর্থ লইয়া গৌড় হইতে সাকরমায় পলাইয়া আসিলেন, তাহার সিকি বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের নিকটে পুতিয়া গচ্ছিত রাখিলেন কেন ?" ইত্যাদি বহু প্রশ্ন। আবার নিজেই মনের অনুকূল উত্তর করিয়াছেন। উত্তরে পূর্ণমাত্রায় অনবস্থা দোষ ঘটিয়াছে। আমরা এই অনবস্থা দোষ পরিহারার্থ বলিতেছি যে, গৃহস্থ আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতির ভরণ পোষণার্থই রূপ সিকি অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, রাজ দণ্ড ভয়ে নহে। মাটিতে টাকা পুতিয়া রাখিবার রীতি তখন সাধারণেরই প্রচলিত ছিল, কেবল রূপ গোস্বামীই রাখেন নাই। পরন্তু রূপ গোস্বামী বহুতর অর্থ লইয়া সাকরমায় যান নাই, পৈত্রিক ভদ্রাসন চন্দ্রদ্বীপ ফতোয়াবাদে গিয়াছিলেন। (৮)

বটব্যাল মহাশয় "বোধহয়" শব্দের সাহায্যেই অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। রূপের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সেই রাজদণ্ডের ভয়েই তিনি গৌড় হইতে পলায়ন করিলেন, বৈরাগ্যের খাতিরে বোধ হয় না" ইত্যাদি। অতঃপর রূপসনাতনের স্বচ্ছ চরিত্রে যত দোষারোপ করিয়াছেন, একমাত্র "বোধ হয়" শব্দই তাহার প্রমাণ। শেষে সনাতন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "লোভেই তিনি জাতি দিয়া ছিলেন এবং ঐ লোভ-প্রসূত দুষ্ক্রিয়াতেই বোধহয় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। রূপ বোধ হয়, কোন নিয়মিত বেতন পাইতেন না, সনাতনেরও বেতন একজন বড় মহুরির বেতন মাত্র ছিল" ইত্যাদি। কেবল "বোধহয়" শব্দ সাহায্যে যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল তত্ত্বই জানেন, তাঁহার কথার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শন করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ইতিহাসে ঘোষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবৈতনিক ও সামান্য বেতনভোগী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশাবস্থাতে প্রভূত ধন সঞ্চয় করা, চুরি ডাকাতি ব্যতীত অসম্ভব, অতএব রূপসনাতন অতিশয় বদমায়েস ছিলেন। "বোধহয়" শব্দ ব্যতীত কোন ইতিহাসের সাহায্যে বটব্যাল মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভাবিত নহে জানিয়াই, এস্থলে তিনি ইতিহাসের ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করেন নাই। আরবী ভাষাতে "দবিরখাস" শব্দের অর্থ খাস উজির অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ। বটব্যাল মহাশয় দবির খাসের কখনও প্রাইভেট সেক্রেটারি, কখন বড় মুহুরি অর্থ করিয়াছেন। পুনরায় "বোধহয়" শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন "রূপসনাতন বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে (চৈতন্য দেবকে) চিনিতেন।" নবদ্বীপে পঠদ্দশাতে চৈতন্য দেবের সহিত রূপসনাতনের সাক্ষাৎ আলাপ থাকার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বোধহয় শব্দ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াও আবার এস্থলে "বোধহয়" শব্দের আশ্রয় গ্রহণ পুনরুক্তি মাত্র।

লেখক মহাশয় কেবল রূপসনাতনকে আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কলিযুগ পাবনাবতার ভগবান চৈতন্য দেবের প্রতিও

(৮) পূর্ব্বে পরিজনে পাঠাইয়া সাবহিতে।
কতো চন্দ্র দ্বীপে কতো ফতোয়াবাদেতে॥
শ্রীরূপ বসন্ত সহ নৌকাতে চড়িয়া।
বহুধন লৈয়া গৃহে গেলা হৃষ্ট হৈয়া॥
বিপ্র বৈষ্ণবাদি সবে ধন বাঁটি দিল।
প্রভু ব্রজে গেলেন শুনিয়া যাত্রা কৈল॥
(ভক্তিরত্নাকর)

তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। রূপ সনাতন বিষয় ত্যাগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বার বার পত্র লিখিলে, তাঁহাদিগের তখনও গৃহ ত্যাগের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হয় নাই জানিয়া, পত্রোত্তরে চৈতন্য দেব, গৃহে থাকিয়াও যে ভাবে ভগবানে মনঃসংযোগ করা যায়, তদর্থক একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠান, যথা ;—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গ রসায়ন ॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, পরপুরুষে রতা নারী, গৃহ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও যেরূপ প্রেমাস্পদ নায়ককে নিরন্তর চিন্তা করে, গৃহে থাকিয়াও ভগবৎপরায়ণ সাধুগণ সেইরূপ ভগবানকে চিন্তা করিবে।

বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন "উপমাটি বড় নোংরা সন্দেহ নাই" ইত্যাদি। ইনি উক্ত উপদেশ বাক্যের যে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় বাস্তবিক তাহাই নোংরা। ইনি বুঝিয়াছেন যে, চৈতন্য দেব রূপ সনাতনকে কুলটা স্ত্রীলোকের ন্যায় কপটাচরণ শিক্ষা দিয়াছেন। ইঁহার প্রবন্ধের অধিকাংশই মনঃকল্পিত কথায় পূর্ণ; সুতরাং কোন কোন বিষয় অসম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এক স্থানে লিখিয়াছেন যে "এমন সময়ে হঠাৎ এক দিন চৈতন্য রামকেলীতে উপস্থিত। বৃন্দাবন যাইবার ছলে বহির্গত হইয়া তিনি বাকিয়া গৌড়ে আসিলেন" ইত্যাদি। অতঃপর লিখিয়াছেন "চৈতন্য নিশ্চয়ই সরল হৃদয় লোক ছিলেন, মনে যাহা হইত তাহাই করিয়া ফেলিতেন, বড় ভাল মন্দ ভাবিতেন না।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, যিনি ছলকরিয়া অর্থাৎ মনে একরূপ বাহিরে অন্যরূপ কার্য্য করেন, তাঁহাকে কি সরল বলা যায়?

চৈতন্য দেব বৃন্দাবন যাইবার ছলে রামকলীতে গিয়াছিলেন, ইতিহাস গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ নাই। তিনি হৃদয়ের আবেগ বশতঃই বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে বহুলোক তাঁহার অনুগমন করাতে নানা বিঘ্নাশঙ্কা বশতঃ প্রবীণ ভক্তগণ প্রভুকে এ যাত্রা বৃন্দাবন গমনে নিষেধ করেন; সুতরাং অগত্যা তিনি সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পথে রামকেলী গ্রাম নিকটবর্ত্তী জানিয়া পরম প্রেমাস্পদ রূপসনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎকরিতে গিয়াছিলেন। এখানে রূপসনাতন ও বহুজন সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনযাইতে নিষেধ করেন। প্রভুর চরণানুচর বৈষ্ণবগণের তাঁহাকে তিরস্কার করা নিতান্তই অসম্ভব। বর্ত্তমান কাল হইলেও কতকটা সম্ভব হইত। প্রভুর অনুচরগণের অনেকেই তাঁহার রামকেলি গমনের কারণ জানিতেন না, তাই তিনি রূপসনাতনকে বলিয়াছেন ;—

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥
এ মোর মনের ভাব কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে॥

চৈতন্য দেব রামকেলিতে যাইবার কারণ সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই বলিয়াই যে, বৃন্দাবন যাইবার ছল করিয়া বাকিয়া রামকেলিতে গিয়াছিলেন, কোন মতেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

মুণ্ডিতমস্তক ন্যাংটা সন্ন্যাসীরা যে চৈতন্য দেবের সঙ্গে রামকেলিতে গিয়াছিল, বটব্যাল মহাশয় ইহার প্রমাণ কোথায় পাইলেন? চৈতন্য দেব যে সময়ে রামকেলি যান, সে সময়ে তাঁহার অনুচরেরা মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন না। পরন্তু চৈতন্য সম্প্রদায়ে পূর্ব্বেও ন্যাংটা সন্ন্যাসী ছিল না, এখনও নাই। ভেকধারীদিগের কৌপীন ধারণের রীতি আছে; কিন্তু

তাহাও প্রশস্ত বহির্ব্বাসে আবৃত থাকে। বটব্যাল মহাশয়ের মতে যদি ইহাই ন্যাংটার লক্ষণ হয়, তথাপি বলা যাইতে পারে, রামকেলিতে এরূপ ন্যাংটা সন্ন্যাসীও প্রভুরসঙ্গে ছিল কিনা সন্দেহ। কেননা, তৎকালে ভেকগ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

চৈতন্য দেবের গৌড়ে গমন ও তাঁহার সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক সমাগমের কথা শুনিয়া, হোসেনসাহ, কেশবছত্রিকে তৎবিবরণ জিজ্ঞাসা করেন সত্য; কিন্তু তিনি তজ্জন্য ক্রোধ করেন নাই, মারিয়া ফেলিতেও চাহেন নাই; বরং শ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বটব্যাল মহাশয়ের উদ্ধৃত সনাতনোক্তিতেই ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

"ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কায।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।" ইত্যাদি।

সনাতন গোস্বামী অতিমাত্র বিনয়ের সহিত প্রভুকে যাহা বলিলেন, বটব্যাল মহাশয়ের মতে তাহাই ভর্ৎসনা। পদাবনত দাসাভিমানী ব্যক্তি প্রভুকে ভর্ৎসনা করিতে পারে, এ কথা অনেকেরই অশ্রুতপূর্ব্ব।

অতঃপর বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, "চৈতন্য দেব এত বলিলেন, তোমাদের দুই জনার জন্যই আমি বাঘেরমুখে মাথা দিয়াছি, তত্রাচ (তথায়?) রূপ সনাতন বৈষ্ণব হইলেন না" ইত্যাদি। চৈতন্য দেবের রামকেলি পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই রূপ গোস্বামী ও তদনুজ অনুপম বিষয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ ফতোয়াবাদের বাটীতে প্রস্থান এবং সঞ্চিত অর্থ গুলির সদ্ব্যয় পূর্ব্বক অবিলম্বে প্রয়াগে যাইয়া মহাপ্রভুকে আত্মসমর্পণ করেন, এদিকে সনাতন ও রাজ কার্য্য পরিত্যাগ করাতে বাঙ্গালাদেশে কারাবদ্ধ হন। চৈতন্য চরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। এমতাবস্থাতে ও বটব্যাল মহাশয় যে, আত্মশ্রুবি মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে হয় বৈষ্ণব ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, না হয়, প্রজ্ঞাপরাধী ব্যতীত আর কি বলিব?

ইনি আরও লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণদাস কবিরাজ, হোসেন সাহার মুখে চৈতন্য দেবের যে গুণানুবাদ করিয়াছেন, তাহা খাপ ছাড়া" গুণানুবাদ বলিয়াই খাপছাড়া বোধ করিয়াছেন, নিন্দাবাদ হইলে আর সেরূপ বোধ করিতেন না। ইনি কেশব ছত্রির মুখে চৈতন্য দেব সম্বন্ধে হোসেন সাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার পোনের আনাই কল্পনা প্রসূত জল্পনা; এই জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কেশব ছত্রির উক্তি উদ্ধৃত করেন নাই।

চৈতন্যানুচর বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ রীতি অনুসারে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন নাই, তাঁহারা বেদমার্গানুসারেই ভিক্ষা করিতেন। বেদেও আশ্রম বিশেষে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের বিধান আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বহু পূর্ব্বে সংসারবিরক্ত মহারাজ ভরত প্রভৃতি এইরূপ ভিক্ষা করিয়াছেন।

ভারতে রূপসনাতনের অতুলনীয় ভাস্বতী কীর্ত্তিও যাঁহারা দেখিতে পান না, তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। ইঁহাদিগের মহার্হ গ্রন্থ সকলের বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে প্রতিপত্তি থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বেদের ও হিন্দু সমাজের বাহিরে প্রতিপত্তি নাই, তজ্জন্য বেদের গৌরবের বিন্দুমাত্রও কি ক্ষতি হয়?

বৈষ্ণবদিগের বৃন্দাবনের বৈচিত্র্য অবৈষ্ণবের বুঝিবার অধিকার নাই। বৃন্দাবন পৃথিবীর দেশ বিশেষ নহে, মহাপ্রভুর যদি

ইহাই মত হয়, তবে তিনি পৃথিবীর দেশ বিশেষ বৃন্দাবনে যাইলেন কেন? যাইয়া লুপ্ততীর্থ রাধাকুণ্ডের আবিষ্কারই বা করিলেন কেন? ব্যক্তেই অব্যক্ত অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন, জ্ঞানিগণ ব্যক্তেই অব্যক্তের অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। অতএব পুরাণাদি শাস্ত্রে পৃথিবীর দেশ বিশেষ এই ব্যক্ত বৃন্দাবনেরই মহানহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এস্থলে বলা উচিত যে, বৈষ্ণবদিগের বৃন্দাবন এক বিচিত্র জিনিস নহে; কিন্তু বর্ত্তমান আধ্যাত্মিকবাদই এক বিচিত্র জিনিস। পরন্তু ইহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে, নিখিল বৈষ্ণবাচার্য্য চৈতন্যচরণানুচর রূপসনাতন, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু বটব্যাল মহাশয় বুঝিয়াছেন?

প্রবন্ধের উপসংহারে বটব্যাল মহাশয় পরম ভাগবত রূপসনাতনের বিমল চরিত্রে যে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন, তাহাতে নব্যভারতের বৈষ্ণব পাঠকগণ তাঁহাকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারিয়াছেন; অতএব এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ হইলেও মলিন বস্তুর সান্নিধ্য বশতঃ মলিনরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীগোবিন্দ মোহন রায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পুরাতন প্রেম।

পুরাতন প্রেম, পুরাতন ঘৃত,
দুর্গন্ধ বিস্বাদময়,
বেদনার স্থানে, হৃদয়ে মাখিলে,
অথচ অমৃত হয়!
ফুলের সুরভি পরিমল সুধা,
গেলে বসন্তের স্নেহ,
পুরাতন কাঠ— শুকনা চন্দন,
নিদাঘে জুড়ায় দেহ!
বড় আদরের বাক্সের আঙ্গুর,
দু'দিনে পচিয়া তল,
চিরকাল সম পবিত্র অমৃত,
শুষ্ক হরিতকী ফল!
দু'দিনে শুকায়, সবুজ ঘাসের
সুকোমল আস্তরণ,
রহে চিরশুষ্ক, ঋষির আরাম
শুষ্ক তৃণকুশাসন!
শাওণের ধারা, বরষে সতত,
বিরামের নাহি লেশ,
অযাচিত জলে, অবনী ভাসায়,
জলময় করে দেশ!
শীতের বিশুষ্ক, বিদারিত ধরা,
মরে যবে পিপাসায়,
মৃত জলদের এক ফোটা জল
বিনা কে বাঁচায় তায়?
অতি আনন্দের—অতি আহ্লাদের
অতি পুলকের পরে,
বিষাদের ছায়া, যেথানে আছে, সে,
সেথানে অপেক্ষা করে!
চন্দ্র অস্ত গেলে, ঘোর অন্ধকারে,
নক্ষত্র নয়নে চায়,
বাদলের দিনে, ঝটিকা তুফানে,
চপলা চমকি যায়!
দু'পরের রোদে, তরুতলে এসে,
ছায়া হ'য়ে থাকে খাড়া,

শীতল বাতাস, বহে কি কখন,
তাহার অঞ্চল ছাড়া ?
দ্বিধা বা সন্দেহে, ভরিলে হৃদয়,
বিবেচনা হ'য়ে নাশে,
পাপের কলঙ্ক ধুইতে যেন সে,
অশ্রুরূপে চখে আসে !
যৌবনের জ্বালা, জুড়াবার তরে,
সেই যে আসিছে জরা,
দূর হ'তে হাত বাড়াইছে যেন,
শান্তির শিশির ভরা !
সংসার মরুতে, ঘুরিয়া মরিয়া,
অবসাদে হ'বে যেতে,
তারি লাগি আছে, দাঁড়াইয়া পথে,
পরকাল-কোল পেতে !
এক বিন্দু অশ্রু, একটী নিশ্বাস,
একবার হাহাকার,
অকৃতজ্ঞ আমি, এখন তাহারে,
নাহি দেই পুরস্কার !
অযতনে আছে, কোথা সে পড়িয়া,
বিশুষ্ক বীজের মূল,
এক ফোটা জল, যদি পায় সেই,
কে তাহার সমতুল ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

লক্ষ্মীপূজা।

শারদ পূর্ণিমা নিশি,—ত্রিদিব হইতে,
শশিপদ্মসিংহাসনে স্থাপিয়ে চরণ,
আসিছে ইন্দিরারাণী আজি পৃথিবীতে,
বহিছে অমৃত-বার্ত্তা কৌমুদী কিরণ !
দগ্ধ ও ফরিদপুর দুর্ভিক্ষ-অনলে,
অনাহারে মৃতদেহ-করোটি-কলস
স্থাপিয়া, পল্লব দিয়া শব-করতলে,
হাহাকারে পূরে শঙ্খ পুরি দিক্ দশ !
শ্মশানে আসন পাতি—পাদ্য অশ্রুজল,
চন্দন গুগ্‌গুল গন্ধ পূতিগন্ধ তার,
মেদ মজ্জা মাংসে রচি নৈবেদ্য সকল,
ক্ষুৎ-রক্তপদ্মে পূজে কমলার পায় !
নয়নে নাহিক নিদ্রা—জাগে নারী নর,
শূন্যময় বঙ্গে আজি পুণ্য কোজাগর !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বাসনা।

ঘুচেছে সকল সাধ, সেজেছি যোগিনী,
বিভূতি ভূষিত অঙ্গে গৈরিক ধারিণী।
রুদ্রাক্ষের মালা আহা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
সাদরে ধরিব এবে অঙ্গে তা' আমার।
দূর কর হীরা মুক্তা, দাও বিলাইয়া
দীন দরিদ্রেরে, আর কি কাজ রাখিয়া ?
লালসা বিলাস মাখা ঐশ্বর্য্যে কি হবে,
অনন্তের পথে যদি কাজ নাহি দিবে ?
কর্ম্মপথ সম্মুখেতে রয়েছে বিস্তৃত,
সাধিতে পারি গো যেন জগতের হিত।
কর্ম্ম কর্ম্ম এই বাক্য রবে সদা মুখে,
প্রাণ মন ঢেলে দিব জগতের সুখে।
নাহি পাই কর্ম্মফল, নাহি চাই কিছু,
অগ্রসর হ'ব শুধু, নাহি চা'ব পিছু।
জগৎ-সংসার মোর আপনার ঘর,
সকলেই ভাই বোন, কেহ নয় পর।
ভাই ভগিনীর কাজে জীবন আমার
যাপিব, কামনা মোর নাহি কিছু আর।
প্রভাত হইবে যবে এ ঘোর রজনী,
চলে যাব মহালোকে হইতে ধরণী।
হে পিতা, হে পরমেশ, এই শুধু দিও—
তখন আমারে তুমি কোলে তু'লে নিও।

শ্রীমৃণালিনী।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ।(১০)

পাঠকগণ! যদি কেহ মনে সন্দেহ করেন যে, সকলই ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের রূপ, তবে অন্যান্য কোন পদার্থকে ধারণ করিতে না বলিয়া কেবল মাত্র সূর্য্য নারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃ স্বরূপকে ধারণ করিতে বলিবার অর্থ কি? আমি তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য কয়েকটী স্থূল দৃষ্টান্ত দিতেছি, তাঁহারা যেন সূক্ষ্ম ভাবে গ্রহণ করেন। এস্থলে ইহা সকলেরই জানা উচিত যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে তাহা যেমন সহজে সিদ্ধ হয়, এবং মনে শান্তি আইসে, তদ্রূপ মানব-কল্পিত কার্য্য করিতে গেলে নানা প্রকার কষ্ট হয়, কার্য্যও সিদ্ধ হয় না এবং মনে শান্তিও আইসে না।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ভগবানের স্বরূপ তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন তোমাদের পিপাসা হইবে, তখন তোমরা জল পান করিবে, ক্ষুধা হইলে অন্ন আহার করিবে এবং অন্ধকার দূর করিতে হইলে অগ্নি আলো জ্বালিবে, ইহাই প্রাকৃতিক (ঈশ্বরের) নিয়ম, যদি ইহার বিপরীত কিছু করিতে যাও, অর্থাৎ অগ্নি দ্বারা আলো না করিয়া যদি জল কিম্বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার সে কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইবে না এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাও পালন করা হইবে না।

যখন তোমাদিগকে ব্যবহার কার্য্য সাংসারিক কার্য্য করিতে হইবে, তখন স্থূল পদার্থের অংশ লইয়া ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবে; যখন জ্ঞান ও মুক্তির প্রয়োজন হইবে, তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ভগবান তেজোময় সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপকে ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে মনে তেজ, বল, শক্তি, বুদ্ধি, ও জ্ঞান হইবে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ দেখিয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবে। তোমরা প্রত্যক্ষ দেখ যে স্থূল পদার্থ অন্ন যদি তোমরা একদিন আহার না কর, তাহা হইলে তোমাদের স্থূল শরীর দুর্ব্বল হয়, উঠিবার ক্ষমতা থাকে না, এক বেলা জল পান না করিলে মৃত প্রায় হইতে হয়; এবং যখন তুমি অন্ন আহার ও জল পান কর, তখন তোমার স্থূল শরীরে উঠিবার শক্তি হয়, মনে তেজ ও স্ফূর্ত্তি হয়। স্থূল পদার্থের অংশ বিনা তোমার স্থূল শরীর রক্ষা হয় না। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সূক্ষ্ম শরীরে তুমি তেজহীন বলহীন হইয়া আছ, যখন তুমি সূক্ষ্ম পদার্থ তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ বিরাট ভগবান সূর্য্য নারায়ণকে ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করিবে, তখন তোমার আধ্যাত্মিক বিষয়ে সূক্ষ্ম শরীরের উন্নতি হইবে। তখন তোমার মনে তেজ বল বুদ্ধি জ্ঞান হইবে, এবং জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ দেখিয়া নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ রূপে অখণ্ডাকার বিরাজমান থাকিবে। মনে কোন প্রকার ভ্রমের উদয় হইবে না, এবং ইহলোকে পরলোকে সুখী হইবে।

তোমরা জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিয়ম ও আজ্ঞানুসারে চলিও, তাহা হইলে তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। যেমন চলিবার জন্য তিনি পা দিয়াছেন, সেই পদ দ্বারাই চলিলে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু তুমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মাথা দ্বারা চলিতে যাইও না, তাহা হইলে কখন সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। অধিকন্তু কষ্টের একশেষ হইবে।

সেইরূপ হস্তের কার্য্য হস্ত দ্বারাই করিবে, নেত্রের কার্য্য নেত্রের দ্বারাই, কর্ণের কার্য্য কর্ণ দ্বারা করিও; যে যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সেই সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই করিও, তাহা হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হইবে; ইহার অন্যথাচরণ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাও হইবে না, কার্য্যও সিদ্ধ হইবে না— যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইবে। নিরাকার ও সাকার পরব্রহ্মে ও সকল বিষয়ে এইরূপ ভাব বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। কোন কার্য্যেতে আলস্য করিতে নাই। যে কার্য্যে আলস্য করা যায়, তাহা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না।

বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এক-মাত্র তেজোময় জ্যোতিঃ স্বরূপ সূর্য্য নারা-য়ণেতে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতার, সাবিত্রী গায়ত্রী সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর ধ্যান অর্থাৎ যত দেব দেবী আছে,সকলেরই ধারণা করিবার বিধি ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ এ জ্যোতির নামই সকল দেব দেবীর নাম, একাল পর্য্যন্ত সকলেই সেই রূপ করিয়া আসিতেছেন,কিন্তু অনেকেই অন্য অর্থ ধরিয়া করিতেছেন, প্রকৃত অর্থ জানিয়া অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার দোষ সন্দেহ নাই। গৃহস্থগণের নানা প্রকার মন্ত্র জপ করিতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাহাতে সাংসারিক কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয়; যাহাতে সহজে তাহাদের ঈশ্বরোপাসনা হয়, তাহার সহজ উপায় বলি তেছি। তাহারা সেই প্রণালীতে কার্য্য করিলে ঈশ্বর উপাসনা করাও হইবে, অথচ সংসার ধর্ম্মের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।

যিনি নিরাকার ও সাকার পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান আছেন, সেই একমাত্র পূর্ণ পর ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিবে। শাস্ত্রে ও বেদে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম একাক্ষর মন্ত্র ওঁকার; সেই একাক্ষর ওঁকার প্রণব মন্ত্র জপ করিলে নিরাকার সাকার দেব দেবী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবানের উপাসনা করা হয়। গৃহস্থ মাত্রেই, বাল বৃদ্ধ যুবা স্ত্রী পুরুষ সক-লেই প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে একশত আটবার প্রণব মন্ত্র জপ করিবেন; যদি সময় না থাকে,তবে দশবার জপ করিবেন। যাঁহার ভগবানে ভক্তি প্রীতি আছে,তিনি যখন ইচ্ছা তখনই জপ করিতে পারেন; তাঁহার সময় অসময় নাই; শুচি অশুচি নাই; সুখ অসুখ নাই। রাত্রি দিন যখনই মনে হইবে, তখনই জপ করিবেন। সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক নাই। সংখ্যা রাখিলে ফল কামনা করা হয় ও আত্মাভিমান জন্মে, নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া করা উচিত। প্রাতঃ ও সায়ং কালে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিরাট ভগবান জগৎ পিতা জগন্মাতা জগদ্গুরু জগদাত্মা জ্যোতিঃ রূপ সূর্য্য নারায়ণ ও চন্দ্রমার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিবে ও আপনাপন ইষ্ট দেবতারূপ চিন্তা করিবে; অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর রূপ চিন্তা করিবে। আপনার রূপ, মন্ত্রের রূপ ও ইষ্টদেবতার রূপ চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণের জ্যোতিঃ স্বরূপের রূপ একই রূপ চিন্তা করিবে। তাহা হইলে, সকল দেব দেবীর রূপ ধারণ করা ও পূর্ণ রূপ উপাসনা করা হইবে। মনের সকল অজ্ঞানতা দূর হইয়া পরমানন্দে আনন্দ রূপ থাকিবে। মন শান্তির আধার হইবে। যদি সময় ও ক্ষমতা হয়, তবে প্রত্যহ প্রাতঃ ও সায়ংকালে অগ্নিতে যথা শক্তি আহুতি দিবে।

যদি প্রত্যহ না হয়, তবে প্রতি অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে দিবে। প্রত্যেক বাটীর মধ্যে অন্ততঃ একজনও দিলে বাটীর সকল লোকেরই কল্যাণ সাধিত হইবে। ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে। যদি সম্পূর্ণ মন্ত্র না বলিতে পারেন, তবে একমাত্র ওঁকার প্রণব উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ ওম্ স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে। তাহা হইলে নিরাকার-সাকার সমস্ত দেব দেবীর নামে আহুতি দেওয়া হইবে। একাক্ষর ওঁকার মন্ত্র নিরাকার সাকার সকল দেব দেবীরই নাম। এই কারণে সকল মন্ত্রের প্রথমেই ওঁকার আছে। ইহাও তোমাদের জানা উচিত যে, সকলেরই ইষ্ট একই পুরুষ। যে কোন উপাসকই হউন না কেন, আহুতি দিবার সময় সকল দেবতার নামে সকলেই সেই একমাত্র অগ্নিতেই আহুতি দিয়া থাকেন। আহুতি না দিলে সকল পূজা ও যজ্ঞ নিষ্ফল হয়। এই কারণে সকল পূজা ও যজ্ঞাদির শেষে আহুতি দেওয়া হয়। আর ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তুঃ বলিয়া কার্য্য শেষ করা হয়। গৃহস্থগণ, তোমরা কোন বিষয়ে ভীত ও চিন্তিত হইও না। তোমাদের কিসের অভাব আছে? তোমাদের গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবান নিরাকার সাকার রূপে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকলরূপে তোমাদের লইয়া বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তোমরা ভুলিয়া আছ বলিয়া সকল বিষয়ে বলহীন, তেজহীন, ভীত ও অপদার্থ হইয়া আছ। তাঁহাকে জানিয়া ভক্তি প্রীতি কর, দেখিবে যে, তোমরা কেহই সেই পরমাত্মা হইতে অভেদ নহ। তোমরা সকলেই সেই পরম পদার্থ, তোমরা অজ্ঞান, মোহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হও, জগতের মঙ্গল হউক।

আহুতি দিবার দ্রব্য। বিশুদ্ধ গব্য-ঘৃত অভাবে মহিষের ঘৃত, মিষ্ট দ্রব্য—চিনি কিম্বা ইক্ষুগুড়। সুগন্ধাদি—শ্বেত ও অগুরু চন্দন, দেবদারু, কর্পূর, গুগ্‌গুল, কেশর, ও কস্তুরি। ইহার সহিত কৃষ্ণ, তিল, যব, আতপ চাউল, ফল ইত্যাদি; কিসমিস, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আহুতি দিবে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অবস্থানুসারে যিনি যেরূপ অর্থাৎ যে যে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহাই শ্রদ্ধার সহিত আহুতি দিবেন। অভাবে কেবল মাত্র ঘৃত ও চিনি আহুতি দিলে ফল সম্পূর্ণ হইবে, আম্রকাষ্ঠ পাওয়া যায় ভালই, অন্যথা যে কোন কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহাতেই অগ্নি জ্বালিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত আহুতি দিবে। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক কার্য্য করিলে ভগবান প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রদ্ধা-হীন হইয়া ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত উত্তম উত্তম দ্রব্য ভগবানে উৎসর্গ করিলে তিনি তাহা কখনই গ্রহণ করেন না। ইহা জ্ঞানী মাত্রেই জানেন। ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের ক্ষুদ খাইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের রাজভোগ গ্রহণ করেন নাই। অধিক কি, আপনাদিগকে দিয়াই দেখ না কেন, যদি কেহ কোন দ্রব্য অশ্রদ্ধা করিয়া তোমাকে দেয়, তুমি তাহা কি গ্রহণ কর? কখনই না। সেইরূপ পরমাত্মাকে—যিনি বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা, তাঁহাকে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দিলে, তিনি কখনই তাহা গ্রহণ করেন না।

পাঠকগণ! এখানে গম্ভীর ও শান্তিরূপে ভাব গ্রহণ করিবেন। জ্ঞানী মাত্রেই জানেন যে, জগৎময়ই আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। এইজন্য তাঁহারা সকলকেই উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করাইয়া সৎপথে লইয়া যান এবং

যাহাতে সকলে পরমানন্দে কাল যাপন করিতে পারে, সতত তাহার চেষ্টা করেন। যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়, নিজে তাহার চেষ্টা ত করেনই, এবং অপরের দ্বারা করাইয়া থাকেন। স্বার্থপর অজ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনিও উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেনা এবং অপরকেও করিতে দেয় না। সদা পশুর ন্যায় ব্যবহার করে। যদি কেহ উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করে, তাহা হইলে ইহাদের আর পরিতাপের সীমা থাকে না এবং তাহাকে বিদ্রূপ করে ও বাধা বিঘ্ন জন্মায়। উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে মানব মাত্রেরই অধিকার আছে; কেননা মনুষ্য মাত্রেই জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী। এক জন উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিয়া সদা পরমানন্দে কালযাপন করিবে, আর একজন চিরকাল নীচকার্য্য করিয়া পশুবন্যায় কালযাপন করিবে, ইহা জ্ঞানবান ঋষি মুনি প্রভৃতি শাস্ত্রকর্ত্তাগণের ও ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। শ্রেষ্ঠকার্য্যের শ্রেষ্ঠফল ও নিকৃষ্ট কার্য্যের নিকৃষ্টফল আছেই আছে। প্রত্যক্ষ দেখ, চাষ করিয়া ধান বুনিলে ধানই জন্মিয়া থাকে, আর কাঁটার বীজ বুনিলে কাঁটাগাছ ব্যতীত অন্য কিছুই হয় না। মনুষ্য মাত্রেরই উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য করা অর্থাৎ বেদ পাঠ করা, ব্রহ্ম গায়ত্রী ও ওঁকার জপ করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য; আর সকলেরই এই সকল কার্য্য করিবার অধিকার আছে। ইহাতে জাতি বা বর্ণ ভেদ নাই। অন্ধকার দূর করিতে গেলে মনুষ্য মাত্রকেই অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর করিতে হয়। এইরূপ, অজ্ঞান রূপী অন্ধকার দূর করিতে গেলে, মনুষ্য মাত্রকেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুকে ধারণ করিতে ও ওঁকার মন্ত্র রূপ জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে অজ্ঞানরূপী অন্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (২)

বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেনেজ বিল বিষয়ক আমাদের প্রথম প্রবন্ধে আমরা এই বিলের ইতিবৃত্ত এবং মূল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। উহার আনুষঙ্গিক ও আভ্যন্তরিক আরও অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি।

ড্রেণেজ বিলের মূল তত্ত্বের আলোচনায় আমরা অনেকানেক উচ্চপদস্থ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী বৈষয়িক ব্যক্তি এবং বিজ্ঞানবিদ্ স্বাস্থ্য তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উক্তি এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং যাহার উপর নিরতিশয় নির্ভর করিয়া স্যর চার্লস এলিয়ট বাহাদুর এই বিল প্রস্তুত করিয়াছেন ও আইনে পরিণত করিতে চাহেন, তাহা অর্থাৎ সেই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, তাহার এই বিলের আদৌ অনুকূল নহে।

আমরা দেখাইয়াছি, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান তাহার তথা কথিত উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও, আপাদমস্তক মতভেদে পূর্ণ, এবং তাহার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় অভিমত অধিকতর অনির্দ্দিষ্ট, অব্যাখ্যাত এবং সংশয়-অন্ধকারে আবৃত; ম্যালেরিয়া-তত্ত্ব, তৎকর্ত্তৃক আদৌ অনাবিষ্কৃত। ম্যালেরিয়া মূলতঃ কিসে জন্মে, এবং ম্যালেরিয়ায় আদৌ কোনও রোগ জন্মে কি না,

সে বিষয়েই ঘোর সন্দেহ ;—অন্ততঃ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিজে তাহাতে মহাসন্দিহান। প্রথম প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা স্যর জোসেফ্ ফেরারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ সন্দেহের সবিশেষ সারবত্তা সূচিত করিয়াছি। স্যর জোসেফ্ সরল এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন ;—

"যে প্রকৃতির ম্যাসমাটা—বা ম্যালেরিয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বা তদনুরূপ কোনও ম্যাসমাটা বা ম্যালেরিয়ায় রোগোৎপত্তি হওয়ার সমগ্র তত্ত্বটী সন্দেহের ও অজ্ঞেয়তার অন্ধকারে এতাধিক আচ্ছন্ন যে, ম্যালেরিয়ায় আদৌ রোগোৎপত্তি হয়, ইহা কোনক্রমে ঐকান্তিক নিশ্চয়তা ও উগ্রতা সহকারে বলা যাইতে পারে না।"

কিন্তু, স্যর চার্লস এলিয়ট অত্যুগ্র!! বিজ্ঞান যাহাতে সন্দিহান, বঙ্গেশ্বর তাহাতে কৃতনিশ্চয়! তা, যাউক সে কথা।

ম্যালেরিয়া কিসে জন্মে, কেমনে জন্মে, মূলতঃ তাহার উৎপত্তিস্থান কোথায়? স্যর চার্লস বলেন"ম্যালেরিয়ার বীজাণু বা বেসিলী নিম্নভূমিস্থ পলিত বা গলিতোন্মুখ উদ্ভিদপদার্থ হইতে জন্মে। কিন্তু, বিজ্ঞান তাহা বলে না। এ বিষয়েও বিজ্ঞানবিদের সহিত এক্ষনকার বঙ্গাধীপের মত-বিরোধ।

পচনশীল উদ্ভিদ বা অন্য কোনও পলিত নির্জীব জৈব পদার্থ হইতে ম্যালেরিয়া-বীজ উৎপন্ন হইয়া সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার করে ;—এই ভ্রান্ত মত বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বটে ; কিন্তু এখন আর নাই। এখন এ মত, অতীব পুরাতন,—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাদ-পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন ; ইয়ুরোপে এ মত অপদস্থ ও উচ্ছিন্ন হইয়াছে। অথচ স্যর চার্লস দেখিতেছি, এই পলিত মতেরই পক্ষপাতী। পলিত পদার্থ হইতে মূলতঃ ম্যালেরিয়া বীজ জন্মে না ; সে বীজ নিজেই সজীব পদার্থ (Germ)এবং তাহা বায়ু প্রবাহে এবং জলোপরি ভাসমান ; ইহাই আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের অভিমত*বলিয়াই লোকে অবগত আছে। তবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিজ্ঞান যদি বিবর্ত্তিত হইয়া,আইনের উদ্দেশে অন্য রকমের রূপ ধারণ করিয়া থাকে ; সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু, ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য অধ্যাপক মণ্ডলী, হক্সলে, টিণ্ডল,প্যাষ্টর প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক, ম্যালেরিয়া বীজাণু বিষয়ক শেষোক্ত মতেরই প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক বলিয়াই ত আমাদের শুনা আছে।

কিন্তু, আমরা নিজে অজ্ঞ, অবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে একান্ত অন্ধ; তাহার কোনও তত্ত্বই স্বয়ং পরীক্ষা করি নাই ; পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত হইতেও প্রত্যক্ষ দেখি নাই। এক কথায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের অপ্রত্যক্ষ ; কিন্তু, বঙ্গেশ্বরের ইচ্ছা এবং আদেশ অতি প্রত্যক্ষ। অতএব প্রথমোক্তকে উপেক্ষা করিয়া শেষোক্তকেই শিরোধার্য্য করিলাম। পরন্তু, ম্যালেরিয়ার বিষে যখন আমরা জর জর, জীবন্মৃত, তখন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অনিশ্চয়তা ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের একান্ত অভাব সত্ত্বেও, না হয় আমরা স্বীকার করিলাম ;—এই ম্যালেরিয়া-জ্বর-বিকম্পিত কলেবরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া, বিশ্বাসই করিলাম যে বঙ্গেশ্বরের কথাই সত্য,—ম্যালেরিয়া পলিত গলিত দ্রব্যের অভ্যন্তর হইতে উদয় হইয়া বা সিক্ত মৃত্তিকা পঙ্ক উদ্ভেদ করিয়া,পয়োপ্রণালীর অভাবেই আমাদিগগের অস্থি মজ্জা পীড়ন এবং আমাদের প্রাণ-বায়ু শোষণ করিতেছে। পরন্তু, ইহাও সকলকে বিশ্বাস করিতে বলিলাম যে, এই ড্রেণেজ বিল পাস হইয়া পল্লীতে পল্লীতে ড্রেণ নর্দ্দমা

* Late professor Tyndall on Dust.

হইলে বা পয়োনালীর পথ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হইলে আমরা ম্যালেরিয়ার প্রাণান্তকারী প্রেমালিঙ্গন হইতে পরিত্রাণ পাইব। অতএব ড্রেণেজ বিল আইনে পরিণত হউক; পল্লী গ্রামে ড্রেণ হউক বা ড্রেণের পথ পরিষ্কার হউক। তোমরা পথ-কর দিতেছ, পূর্ত্তকর দিতেছ; পুনঃ ড্রেন-কর দেও। অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া বা অন্য যে উপায়েই পার, অন্যান্য করের ন্যায় এ করও যোগাও। বেশ, ড্রেণই হউক।

কিন্তু, সে কেমন ড্রেণ? তাহার আকার অবয়ব, কলেবর ও কান্তি কীদৃশ? তাহা কলিকাতা সহরের ড্রেণের মত পাকা ও ঢাকা নর্দ্দামা অথবা সহরতলীর উলঙ্গ অনাবৃত এবং অতীব সুবাসিত পগাররূপী পয়োপ্রণালী বা পঙ্ক-নালী? গ্রাম্য ড্রেণ পদার্থ টা কি? গ্রাম্য ড্রেণ বলিতে এই বড় বড় বিলময় বঙ্গদেশে, চরে চত্তরে, ধান্যের ক্ষেত্রে, বাঁশবাগানে, গ্রাম্য লোকের আনাচে কানাচেই ড্রেণ বুঝায়; কিন্তু সে ড্রেণের মূর্ত্তি কেমন, আকার প্রকার ও প্রকৃতি কিরূপ? এক কথায় এই ড্রেণেজ বিলের গঠনে তাহার উদ্দিষ্ট ড্রেণের কিদৃশ গঠন পিঠন বর্ণিত হইয়াছে?

বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন কি?—সে বর্ণনা, সে ব্যাখ্যা এই বিলে এক বর্ণও নাই! অথচ এখানি ড্রেণেজ বিল! ড্রেণ করার জন্য এই বিল প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু ড্রেণ কি প্রকারের হইবে, সে কথা ইহাতে একটীও নাই, তাহা আদৌ অনির্দ্দিষ্ট; একান্ত অপরিজ্ঞাত আকাশ কুসুম!

ড্রেণেজ বিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬২টী ধারা; তাহা ব্যতীত আরও বিস্তর উপধারা আছে; ধারা নিচয়ের শাখাপ্রশাখা এবং তস্য শাখা আছে; এবং এই ধারা-প্রবাহে ড্রেণের আনুষঙ্গিক এবং অবান্তরিক অসংখ্য কথা আছে। ড্রেণের করের কথা আছে, করের কিস্তির কথা আছে, ড্রেণ-কমিসনরের কথা আছে, এঞ্জিনিয়ারের কথা আছে, করদাতার কথা আছে, কম্পেনসেসনাদির কথাও আছে;—কোন্ কথা নাই? নাই কেবল একটী কথা; সেটী ড্রেণটী কেমনতর হইবে সেই কথাটী!

ইহা আশ্চর্য্য বটে। ড্রেণেজ বিল প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, ড্রেণ কেমন হইবে, এই কথা লইয়া সাধারণ্যে সবিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়? অবস্থাজ্ঞ লোক মাত্রেই একবাক্যে প্রশ্ন করেন,—"গ্রাম্য ড্রেণের গঠন কেমন হইবে, এবং সে গঠনের কথা বিলে না থাকার কারণ কি?" পরন্তু, এ প্রসঙ্গে আরও প্রদর্শন করা হয়, পদে পদে প্রতিপন্ন করা হয় যে, নিম্ন বাঙ্গালার ভৌগলিক সংস্থান গ্রাম্য ড্রেণের অনুকূল নহে; প্রত্যুত সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুপযোগী। অর্থাৎ চৌড়া চেপ্টা চরভূমি সমাকীর্ণ, ধান্য ক্ষেত্র পূর্ণ, বিল বাঁওড় খাল জোল জলা পূর্ণ, বঙ্গদেশে, তাহার অর্থ বঙ্গীয় কৃষকপল্লী নিচয়ে, মিউনিসিপাল সহর বাজারের পথ পার্শ্বস্থ পয়োনালীর অনুরূপ ইংরেজী ধরণের ড্রেণ আদৌ হইতে পারে না; হওয়ার কিছু মাত্র প্রয়োজনও নাই; হইলে ইষ্টের পরিবর্ত্তে মহা অনিষ্ট সাধিত হইবে; কেন না তদ্দ্বারা কৃষকপল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী এবং মধ্যবর্ত্তী ধান্য-ক্ষেত্র সমূহে জল চলাচলেরপথ রোধ হইয়া দেশের সর্ব্ব প্রধান খাদ্যশস্য, বাঙ্গালী জাতির দেহ-প্রাণ একত্রিত রাখিবার একমাত্র উপায় ধান্য ফসলের ধ্বংস হইবে; কারণ ধান্য-ক্ষেত্র শুষ্ক হওয়া এবং ধান্যের ধ্বংস হওয়া একই কথা। গ্রামে গ্রামে সহর বা সহরতলীর মত ড্রেণ হইলে, (হওয়া যদি আদৌ সম্ভব হয়) ধান্য-

ক্ষেত্র শুষ্ক হওয়া একরূপ অবশ্যম্ভাবী। অতএব গ্রাম্য ড্রেণে লোকের জ্বর জ্বালা কমুক আর না কমুক; তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হউক বা বৃদ্ধিই হউক,—কি হইবে ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারেন না,—ইহা নিশ্চয়,যে ধান্য হানিতে,লোকের জীবন ধারণের উপায় থাকিবে না। ড্রেনেজ বিল জারি হওয়ার অব্যবহিত পরে, উক্ত বিল সম্বন্ধে অন্যান্য আপত্তিব আন্দোলনের সহিত, উপরোক্ত কথা দুইটা বর্ত্তমান বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের গলাধঃকরণ করিয়া দিবার সবিশেষ চেষ্টা চরিত্র করা হয়। বুঝান হয় যে, নিম্ন-বঙ্গের ভৌগলিক সংস্থান গ্রাম্য ড্রেণের অত্যন্ত অনুপযোগী। তথা গ্রাম্য ড্রেণ, বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য শস্য ধান্য উৎপাদনের অন্তরায়। কারণ,কৃষক পল্লীতে মিউনিসিপাল ড্রেণ করা, ধান্য ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ড্রেণ কাটিয়া তাহার জল বাহির করিয়া দেওয়ারই অনুরূপ।

উপরোক্ত কথা দুইটী প্রথমতঃ কাউন্সিল গৃহে এবং তাহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত দেশীয় সংবাদ পত্রে উত্থাপিত ও আন্দোলিত হয়। কাউন্সিলগৃহে (Bengal Legislative Council Chambers) মাননীয় মিঃ এলেন, মিঃ লালমোহন ঘোষ, মিঃ লায়েল,বাবু গণেশ চন্দ্র চন্দ প্রভৃতি সদস্য বর্গ,অল্পাধিক পরিমাণে, উপরোক্ত কথা দুইটীর আলোচনা করেন। মিঃ এলেনের বক্তৃতার কিয়দংশ কিছু বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করা আবশ্যক।

মিঃ এলেন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের এক জন বহু পুরাতন, বিশ্বস্ত, বহুদর্শী এবং অত্যুচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একরূপ অতুলনীয়। বিগত ৩২ বৎসর হইতে ইনি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বহু বিভাগে, সরকারী সিবিলসার্ব্বিশের কর্ম্ম, মহকুমার মাজিষ্টরী হইতে বিভাগীয় কমিসনরী পর্য্যন্ত করিয়াছেন; এবং প্রথম এপিডেমিক কমিসন গঠনের সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বর অবলোকন ও ম্যালেরিয়া তথ্য অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। প্রথম এপিডেমিক কমিসন নিযুক্ত হইয়াই যখন, ম্যালেরিয়ার কারণ অনুসন্ধানকল্পে বারাসতে গমন করেন, মিঃ এলেন তখন বারাসতের মাজিষ্টর। তৎকাল হইতেই ইনি ম্যালেরিয়াতত্ত্ব অধ্যয়নে নিযুক্ত, এবং বরাবরেই ম্যালেরিয়ার মধ্য-কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া এ তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতএব ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা, আলোচনা, সাক্ষাৎ সংগৃহীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বহুকাল-ব্যাপী পরীক্ষা, কাহারও অপেক্ষা কম নহে; অনেকেরই অপেক্ষা অধিক,এ কথা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি। মিঃ এলেন নিজেও ইঙ্গিতে এ কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন;—

'There is no member in this Council and there is probably no member in the Service in Bengal, who has a larger acquaintance with the Malarial fever, commonly called the Burdwan fever, than I possess."

অর্থাৎ বর্ত্তমান বেঙ্গল কাউন্সিলে,সম্ভবতঃ সমগ্র বঙ্গীয় সার্বিসে এখন এমন একজনও সদস্য নাই,ম্যালেরিয়া জ্বরসম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অধিক।

মিঃ এলেনের এই উক্তি অহঙ্কারের উক্তি নহে; ইহা প্রকৃত ঘটনামূলক। অতএব ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে, এই মিঃ এলেন কি বলিয়াছেন, তাহা শুনা, এ সময়ে সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মিঃ এলেন সেই কথাগুলি কহিয়াছিলেন,তাঁহার কর্ত্তব্য তাহাতে সবিশেষ কর্ণপাত করিয়া কার্য্য করা। বেঙ্গলকাউন্সিলের বাঙ্গালী সদস্য এবং বাঙ্গালীর দেশের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের কথা,

উপেক্ষনীয় হইলেও, মিঃ এলেনের মত বহুদর্শী ও বিশ্বস্ত রাজপুরুষের কথাও কি উপেক্ষিত হইবে?

কিন্তু, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রশমন-পরিকল্পিত এই ড্রেণেজ সম্বন্ধে মিঃ এলেনের অভিমত কি?

এককথায়, উত্তর,— আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি,—তাহাই। তাহা অপেক্ষাও অধিক দূর মিঃ এলেন গিয়াছেন। মিঃ এলেনের দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বহুকালব্যাপী গবেষণার ফল—(১) তথা-কথিত ম্যালেরিয়া জ্বর ম্যালেরিয়া জনিত নহে; অবরুদ্ধ পয়োনালী জনিতও নহে; (২) গ্রামে গ্রামে পয়োনালীর সৃষ্টি ও সংস্কারে এবং তথা কথিত উন্নতিতে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের আদৌ সম্ভাবনা নাই; সে বিষয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের মত ঘোর সন্দেহান্ধকারাবৃত; (৩) তথা কথিত উন্নত পয়োনালীতে বঙ্গদেশব্যাপী-জ্বর প্রশমিত হওয়ার পরিবর্ত্তে সম্ভবতঃ প্রবলীকৃত হইবে; (৪) বেঙ্গল ড্রেনেজ বিলের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ তাহার পরিকল্পিত বিষয় ভ্রমসঙ্কুল এবং(৫) বঙ্গদেশে গ্রাম্য ড্রেণ আদৌ অসম্ভব; তদ্দ্বারা দেশের জীবন ধারণোপযোগী শস্য ধান্য ফসল মারা পড়িবে।

পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য মিঃ এলেনের নিজের উক্তির কতক কতক এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

মিঃ এলেন বলেন,—ব্যবস্থাপক বৈঠকেই বলিয়াছেন;—

"For these reasons after having had my constant attention directed to the subject and being naturally anxious to ascertain some cause, I have been utterly unable to satisfy myself that this fever is in any way connected with drainage or malaria. My conclusion was that it is mainly due to constitutional conditions, but I will not now detain the council on this theory. It is sufficient for me to simply to draw attention to the uncertainty which hangs over the main assumption of this Bill, namely that by improving the drainage of a tract of country we necessarily improve the health of the people. It may be so but my own experience in Calcutta does not lead me to think so. After having run the gauntlet of the most malarial districts of Bengal, I gained experience in my own person of fever for the first time in the town of Calcutta, and this I will say that the fever of Calcutta is much more vicious and persistent type than any fever in the Mafassal. Infact improved drainage appears to give a typhoid * character to the most trifling fever."

ইংরেজী অভিজ্ঞ উপরোক্ত উক্তির অন্তর্নিহিত গুরুত্ব অনুভব করিবেন। ইংরেজী অনভিজ্ঞের অনুধাবনার্থে উহার বাঙ্গালা অনুবাদ ফুটনোটে দিলাম। মিঃ এলেনের বিবে-

* এই সকল কারণে এবং স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ নির্ণয় কল্পে সতত উহার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, আমি উহার কারণ আবিষ্কারের জন্য বহুকালাবধি সবিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু, কখনও আমি এ কথায় সন্তুষ্ট ও বিশ্বাসবান হইতে পারি নাই যে, এই জ্বর আদৌ ড্রেণেজ বা ম্যালেরিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই জ্বর প্রাকৃতিক অবস্থা সম্ভূত ইহাই আমার সিদ্ধান্ত; কিন্তু সে কথা সবিস্তারে বলিবার জন্য আমি কাউন্সিলের সময় গ্রহণ করিতে চাহি না। এস্থলে কেবল ইহাই বলিলে প্রচুর হইবে যে, এই বিলের মূল বিষয় অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কোন স্থানের ড্রেণের উন্নতি করিলে তথাকার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে ইহা সমূহ সংশয়ের বিষয়। কলিকাতার সহর সম্বন্ধে আমার নিজের যাহা অভিজ্ঞতা, তাহাতে উন্নত ড্রেণেজে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। বরং তাহার বিপরীতই আমার বিশ্বাস। ম্যালেরিয়া পূর্ণ বঙ্গের বহু জিলা ঘুরিয়া আসিয়া আমি সর্ব্বপ্রথম জ্বরে পড়ি, কলিকাতা সহরে। সহরের জ্বর মফঃস্বলের জ্বর অপেক্ষা অধিকতর উগ্র, ইহাই আমার ধারণা। ফলতঃ সমুন্নত ড্রেণেজে অত্যল্প জ্বরও টায়ফয়েড প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

চনায় মফঃস্বলের জ্বর অপেক্ষা কলিকাতা সহরের জ্বর ভয়ঙ্কর;—অধিকতর সাংঘাতিক; সহরে অত্যল্প জ্বরও অচিরাৎ টায়ফয়েড্ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়; তাহার কারণ,মিঃ এলেনের বিবেচনায়, কলিকাতা সহরের সমুন্নত ও সংস্কৃত পয়োনালী বা ড্রেণেজ!! মিঃ এলেন নিজে ইহার ভুক্তভোগী; নিজের শরীরে এবং স্বাস্থ্যে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি ম্যালেরিয়া পূর্ণ বঙ্গের বহু জিলা নিরাপদে পার হওয়ার পর, প্রকৃষ্ট পাকা পয়োপ্রণালী সুশোভিত রাজধানী কলিকাতা সহরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম জ্বরের হাতে পড়েন এবং সে জ্বর, তাঁহাকে বড় সহজে ছাড়ে নাই। তা,সহরের জ্বরাসুর সম্বন্ধে, স্ব স্ব শরীরে যাঁহাদের সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা মিঃ এলেনের এই উক্তি এককথায় উড়াইয়া দিতে পারেন না। পরন্তু,মিঃ এলেন স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছেন যে, বঙ্গীয় জ্বর বা বর্দ্ধমান ফিবারের সহিত ম্যালেরিয়া ও ড্রেণেজের সবিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই।

কিন্তু, আমরা উপস্থিতে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহারই পুনঃ অবতারণা করি। নিম্নবঙ্গের গ্রামে, মফঃস্বলে কৃষকপল্লীতে সহরানুরূপ ড্রেণ হওয়া অসম্ভব; অস্বাভাবিক উপায়ে তাহা করাতে শস্য ক্ষেত্র শাফ্ উজাড় হইবে; ধান্য সটান মারা পড়িবে। এ সম্বন্ধে, মিঃ এলেনের উক্তি এই;—এ উক্তিও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়,বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস এলিয়টের সম্মুখে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত;—

"But admitting that malaria is the cause of all this deadly fever, what is the remedy? Is it possible to improve the drainage of Bengal? I observe that there is no section in the Bill prohibiting the cultivation of rice in any area, subjected to drainage and being improved. It rice cultivaiion is still to go on, in a drained area it is perfectly certain that the drainage must be perfectly inoperative. Is it contemplated that rice cultivation should cease? If so, the last stage of the people may be worse than the first, and it may prove a measure for starving men in order to save them from fever. The actual condition of things in Bengal renders any thing like effective drainage absolutely impossible."

পাঠক, এইখানে ক্ষণেকের জন্য একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া মাননীয় মিঃ এলেনের উপরোক্ত আধ বিদ্রূপাত্মক, মর্ম্মভেদী উক্তির লাবণ্য, তাহার সম্যক সাহিত্য-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন। আর মনে রাখিবেন মিঃ এলেন বঙ্গীয় সদস্য নহেন; বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকও নহেন; স্বয়ং সাহেব লোক। বে-সরকারী যে সে সাহেবও নহেন। সিবিল সার্ব্বিসের একটী সিংহ। তিনি সরকারের বৃদ্ধ, বহুদর্শী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। মিঃ এলেন, এই বিল ব্যপদেশে, ব্যবস্থাপক বৈঠকে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন;—"তা,স্বীকারও যদি করা যায়, স্বীকারই না হয় করা গেল যে, ম্যালেরিয়াই এই মৃত্যুকর মর্ম্মভেদী জ্বরের কারণ; কিন্তু, ইহার প্রতিকার কি? বঙ্গদেশের ড্রেণেজের উন্নতি সম্পাদন করা কি অদৌ সম্ভব? আমি এই বিলে এমন একটীও ধারা দেখিতে পাইতেছি না, যে ধারায় ধান্যের চাষ করা নিষেধ কর বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে। যে সকল স্থলে ড্রেনেজ দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি করা হইবে, সে সকল স্থলে যদি ধান্যের চাষ অবিচলিত ভাবেই চলিতে থাকে তবে ইহা সম্যক নিশ্চয় যে, ড্রেনেজ স্বকার্য্যোপযোগী হইবে না। ধান্যের চাষ বন্ধ হউক, ধান্য রোপণ নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত, ইহাই কি তবে,সুচিন্তা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে? তাহাই যদি হয়, তবে রোগ অপেক্ষা ঔষধেতেই লোকের প্রাণ

যাইবে; প্রথমের অপেক্ষা শেষের এই বিপদ বহু গুণে বেশী ও বিষম হইবে। গবর্ণমেণ্টের এ ব্যবস্থা, রায়ত লোককে জ্বর হইতে পরিত্রাণ করিতে যাইয়া, তাহাদিগকে অনাহারে মারিবে। ফলতঃ বঙ্গদেশের প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অবস্থা যেরূপ,তাহাতে করিয়া, ইহার ড্রেণেজের কোনও কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা একান্ত অসম্ভব।"

"পশ্চিম বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভূমি পশ্চাতে রাখিয়া,মুর্সিদাবাদের ভাগিরথী হইতে ত্রিপুরার পাহাড় পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশ বৎসরের চারি মাস কাল, প্রায় "একশা" জল-মগ্ন থাকে। জল ৫ ফুট হইতে কোথাও কোথাও ১৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। এরূপ স্থলে, এবম্বিধ অবস্থায়,কোনও স্থায়ী কার্য্যোপযোগী ড্রেণেজ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?" মিঃ এলেন বলেন এবং এ কথা প্রকৃতও বটে যে, যে কয় মাস দেশ জলে ভাসিতে থাকে, জল নিঃসরণ না হইয়া জল-প্রণালী নিচয় অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেই কয় মাসই জ্বর জ্বালা কম;—সেই কয় মাসই বরং বঙ্গদেশ স্বাস্থ্যকর; পরন্তু যখন হইতে জল সরিতে ও শুষ্ক হইতে থাকে, তখন হইতেই জ্বর জ্বালার প্রাদুর্ভাব হয়।

আমরা ইত্যগ্রে উল্লেখ করিয়াছি যে, ড্রেণেজ বিল প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, কি প্রকারের ড্রেণ হইবে বলিয়া সাধারণ্যে প্রশ্ন হয় এবং গ্রামে গ্রামে সহরানুরূপ ড্রেণ অসম্ভব ও অনিষ্টকর হইবে, ইহা প্রদর্শিত করা হয়। ড্রেণেজ বিলের উদ্দিষ্ট ড্রেণের প্ল্যান বা কল্পনা লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের মনে, প্রথম সূত্রে যাহাই থাকুক বা একেবারেই কিছু না থাকুক, উপরোক্ত প্রশ্ন ও প্রমাণ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে; এবং প্রবেশ করিয়া, বোধ হয়, কিছু ক্লেশকর হয়। লোকের পীড়াপিড়ী, অথচ ড্রেণেজ বিলের ড্রেণ একান্ত অনির্দ্দিষ্ট; স্যর চার্লস এলিয়ট অগত্যা একটী উপায় চিন্তা করিতে বাধ্য হন; —অতঃপর একটী উপায় উদ্ভাবনও করিয়াছেন। এ ড্রেণেজ গঠন সম্বন্ধে এ উদ্ভাবন, ড্রেণেজ বিলের অঙ্কুরে,অথবা তাহা জন্মিবার অগ্রে তিনি, আপনার মনে, আপনি করিয়া রাখিয়াছিলেন; অথবা লোকের পীড়াপিড়িতে পরে উদ্ভাবন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে তাহা যে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার নিজেরই স্বকপোল কল্পিত,এবং তদীয় ঢাকাই বক্তৃতার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, অন্য লোকের, এমন কি তাঁহার চিফ সেক্রেটারী কটন সাহেবেরও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্রও কারণ আমরা সম্মুখে দেখিতেছি না। ফলতঃ ড্রেণেজ বিলে বর্ণিত ড্রেণের গঠন কেমন হইবে,তাহা এক ছোটলাট সাহেব ব্যতীত রাজপুরুষদিগের অপর কেহই বোধ হয় জানিতেন না; ড্রেণেজ বিল যিনি ড্রাফ্‌ট করিয়াছিলেন তাঁহারও বোধ করি, উহা অজ্ঞাত ছিল; বিল দেখিয়া, তাহার অনুমানও কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে পারেন নাই,লাটসাহেবের ব্যাখ্যা পার্শ্বে রাখা ব্যতীত,পরেও তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না; ইহা নিশ্চয়। ড্রেণেজ বিলের গঠনটী এমনি "ধরি মাছ না ছুঁই পানি প্রকৃতির করা হইয়াছে যে,যখন যাঁহার যেমন ইচ্ছা,তেমনি ড্রেণের ব্যবস্থা দিতে পারিবেন। বিনা ড্রেণেও ড্রেণেজ কর আদায় করিতে পারিবেন। ড্রেণেজের প্রথম সূত্রপাতেই ত সেইরূপ হইতে চলিয়াছে, দেখিতেছি, বিনা ড্রেণে অর্থাৎ কোন রকমের ড্রেণ তৈয়ার না করিয়াও ড্রেণেজ করা যাউক। সরকারী

সাহেবরাও সম্ভবতঃ জানিতেন না,ড্রেণ কেমন হইবে; কেন না,তাহা জানা থাকিলে,ব্যবস্থাপক সভার সরকারী সদস্যেরা সে বিষয়ের প্রথম উত্থাপন কখনই করিতেন না। প্রমাণ এলেন সাহেবের উপরি আলোচিত বক্তৃতা। সুতরাং কেবল এক স্যর চার্লসই এই ড্রেণেজ বিলের ড্রেণের মূর্ত্তি পূর্ব্বে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাহাকেই বলেন নাই; অথবা পাকে বা বিপাকে পড়িয়া,পরে উদ্ভাবন করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় বলিয়াই বোধ হয়!

ঢাকা নগরীতে প্রদত্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ "স্পিচে"স্যরচার্লস বিল ব্যপদেশে বঙ্গীয় ড্রেণের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহাতে এই বক্ষ্যমান বিল সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন এবং অভিনব স্তরে উত্থিত বা পতিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হয়। সে স্তর কিদৃশ, পরে বিবৃত করিব। তাহার পূর্ব্বে একটী কথা এই স্থলে।

জল প্লাবন-প্রবণ এবং জলে প্লাবিত, পরন্তু,ধান্যক্ষেত্রের চর-সমাকীর্ণ নিম্ন বাঙ্গালায় ইংরেজী গঠনের ড্রেণ হওয়া অসম্ভব এবং হইলে অনিষ্টকর, এ বিষয়, বর্ত্তমান বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, উপস্থিত আন্দোলন হইতেই যদি অবধান করিয়া, ড্রেণেজ ব্যপদেশে আত্মকল্পিত অনুষ্ঠান অধুনা অন্য দিকে চালিত করিয়া থাকেন, তবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণাদিতে উদাসীন বা অনভিজ্ঞ,ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। কেন না,উপরোক্ত কথা নূতন নহে; এবং কেবল অদ্যকার এই আন্দোলন হইতেও উদ্ভূত নহে।

১৮৭০সালে,—সে আজ ২৪বৎসরের কথা, যখন বেঙ্গল কাউন্সিলে মাননীয় অ্যাস্লে ইডেন কর্ত্তৃক "ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিল" পেস হয়, তখনও অবস্থা এই; অতএব তখনও এই অবস্থানুসারে উপরোক্ত কথা উত্থাপিত হইয়াছিল এবং মিঃ এলেন এখন এ সম্বন্ধে, যেরূপ বলিয়াছেন, তখনও কাউন্সিলের সদস্য গতাসু রাজা দিগম্বর মিত্র ঠিক সেইরূপ কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ধান্য ক্ষেত্রে ড্রেণ করিলে,ধান্য ধ্বংস হইয়া লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। এ সম্বন্ধে মিত্র মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বক্তৃতার অনেক উক্তির মধ্যে একটী উক্তি এই;—

"But unfortunately for Mr. Adley's Scheme of drainage,and removal thereby of the cause of the epidemic, the adjoining lands happened to be paddy lands over which water lodged to the depth of two or three feet and which continued in that state for at least four months in the year and these lands according to him were equally productive of miasm. In this list of causes were found "moist lands and meadows" or 'water lodged sub-soil when dried up under the sun" again rice grounds especially in Jallahs, where the ears of the crops only are cut off and the stalks left to rot,—thus adding fuel to the fire." Now,was Mr. Adley prepared to drain these rice lands which constituted nine-tenths of the culturable lands of lower Bengal and deprive the people, if possible, of the only food crop, the lands were capable of bearing? But what made Mr. Adley so sure that these *bheels* and "rice grounds" were the causes of the epidemic fever?"*

* মিঃ অ্যাডলের ড্রেণেজ প্রস্তাবানুসারে ধান্য ক্ষেত্রও সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ। কেননা ধান্য ক্ষেত্রে বৎসরের অন্যূন চারিমাস পর্য্যন্ত দুই তিন ফিট করিয়া জল আটকাইয়া থাকে,সুতরাং তাঁহার মতে তাহার অভ্যন্তর হইতে ম্যালেরিয়া উৎসারিত হয়। বিশেষতঃ ধান্য কাটার পর ধান্য ক্ষেত্রে যখন ধান্যবৃক্ষের নিম্নভাগ বা "নাড়া" পলিত হইয়া তথাকার জল শুষ্ক হইতে থাকে, তখন ত আর কথাই নাই; তখন এই সাহেবের বিবেচনায় হুতাশনে ঘৃতাহুতি, ম্যালেরিয়া মর্ম্মান্তিকভাবে মুখব্যাদান করিয়া মৃত্যু বিস্তার করে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা এই যে, সাহেব বাহাদুর কি ড্রেণ করিয়া ধান্য ক্ষেত্রের জল বাহির করিয়া দিয়া তাহা শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করতঃ দেশ শুদ্ধ লোককে অনাহারে মারিতে চাহেন। কেননা ভূমির $\frac{9}{10}$ ভাগ ধান্য ক্ষেত্র!! কিন্তু ধান্য ক্ষেত্র হইতেই যে ম্যালেরিয়া উদ্গারিত হয়, কি প্রমাণে এই সাহেব সে বিষয়ে এতাধিক কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পরন্তু, এতাদৃশ ড্রেণেজে কেবল স্বাস্থ্যের নহে, ভূ সম্পত্তিরও উন্নতি হইবে, বলিয়া, তখন কল্পনা করা হইয়াছিল; এখনও সে কল্পনা, এই বক্ষমান বিলের অন্তর্নিহিত বটে;—নহিলে কেবল ভূমি সংশ্লিষ্ট লোক মাত্রেই ড্রেণেজ করের কবলীভূত হইত না, ড্রেণেজ জনিত স্বাস্থ্যের অংশী সকল শ্রেণীর লোককেই সে কর দিতে বাধ্য করা হইত। কিন্তু, স্বাস্থ্যের ন্যায়, এ প্রকারের ড্রেণেজে প্রধানতঃ ধান্য মাত্র প্রসূ, বঙ্গীয় ভূমির কিছুমাত্র উন্নতির সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত, অনিষ্টই অতি নিশ্চয়। এ কথাও দিগম্বর মিত্র তখন বুঝাইয়াছিলেন;

"As for land improvement, he hoped, it was not pretended that drainage, *perse*, was beneficial to agriculture in a country when-tenths of the culturable lands were only fit for the cultivation of paddy which required for its growth and maturity a continuous supply of water for four months."*

রাজা দিগম্বর মিত্রের কথা গ্রাহ্য হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট "ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিল" দেশব্যাপী ব্যবস্থায় পরিণত করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এখন দেখিতেছি, পুনঃ সেই প্রশ্নের উদয়! বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিলের বক্ষে পূর্ব্বের সেই প্রমাদ প্রতিভাত! অতএব, অগত্যাই বুঝিতে হইতেছে যে স্যর চার্লস এলিয়াটের গবর্ণমেণ্টের, এ সমস্যা-সংলগ্ন পূর্ব্ব সূত্রে সবিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। করিলে, ২৪ বৎসর পূর্ব্বে, যে প্রমাদ প্রতীত হইয়া, পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট, পুনঃ সেই প্রমাদে পতিত হইলেন কেন? ড্রেণেজ বিলের ঢাকাই ব্যাখায় গবর্ণমেণ্ট, কিঞ্চিৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বটে; কিন্তু, তাহাতেও এ প্রমাদ সংশোধন হয় নাই; কারণ বিল পূর্ব্ববৎই বিদ্যমান। তা, সে বিষয়ের আলোচনা আমরা একটু পরে করিতেছি। অগ্রে দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট, কি প্রকৃতির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন;

ড্রেণেজ বিল সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়, বিগত শীত ঋতুতে, ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে; শ্রদ্ধাস্পদ স্যর চার্লস এলিয়ট, গবর্ণমেণ্টের বর্ষা শফর ব্যবদেশে ঢাকা নগরে গমন করেন বিগত জুলাই মাসের শেষ ভাগে। সেটী বিল প্রস্তুত হওয়ার পর ষষ্ঠ মাস। ষষ্ঠ মাস, হিন্দু মতে, অন্নপ্রাশনের অতি প্রশস্ত সময় বটে। সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই বিলের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা হয়। ঢাকা মিউনিসিপালটীর অভিনন্দনের উত্তর উপলক্ষে স্যর চার্লস এই বিল সম্বন্ধে সাধারণ সমালোচনার একটী সমালোচনা করিয়া সপক্ষ সমর্থনের অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্যই বলিতে হইবে, ইহা তাঁহার সহৃদয়তা, সুশাসন-বাসনা এবং সাধারণ অভিমতের প্রতি অনুপেক্ষার অতি উদার পরিচয়। পরন্তু, তিনি সম্পূর্ণরূপে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া প্রজা সাধারণের প্রভূত মঙ্গল কামনায় যে এই বিল ব্যবস্থায় পরিণত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহাও ইহা অপর একটী নিদর্শন। ফলতঃ তাঁহার সদুদ্দেশ্য এবং সাধারণ মতামতের প্রতি এই সাহানুভূতির জন্য তিনি অবশ্যই এ দেশীয়-দিগের কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা আবর্ষণ করিয়াছেন। এই বিল ব্যপদেশে তাঁহার সদভিপ্রায়ের জন্য, তাঁহাকে যাহারা মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান না করে, তাহারা প্রত্যবায়ভাগী আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি। ড্রেণেজ বিল সর্ব্বাংশে সদভিপ্রায় প্রণোদিত; তবে সুমন্ত্রণা সঞ্জাত নহে; কারণ অভিপ্রেত ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনভিপ্রেত অনিষ্টই ইহাতে ঘটিবে।

আমরা পূর্ব্বেও এই কথা বলিতেছি। বিল সুমন্ত্রণা-সঞ্জাত এবং সুযুক্তি সিদ্ধ নহে; পরন্তু, ঢাকা নগরের বক্তৃতায় তাহার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাও সন্তোষ-জনক নহে। তাহাতে সাধারণের আপত্তি নিচয়ের একটীও খণ্ডিত হয় নাই; প্রকৃত তত্ত্ব পরিস্ফুত হয় নাই; গবর্ণমেণ্ট সমগ্রবিষয়টীর গুরুত্ব এখনও সম্যক রূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, ইহাও অনুভূত হইতেছে না। প্রত্যুত সে ব্যাখ্যার অন্ধকার আরও অধিক পরিমাণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ সমালো-

* যে দেশের কৃষিযোগ্য ভূমির ৯/১০ ভাগ ধান্য ক্ষেত্র, যাহাতে বৎসরের চারিমাস কাল ক্রমাগত জলের প্রয়োজন, সে দেশে ভূমি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে, ড্রেণেজ প্রকৃত প্রস্তাবে আদৌ ইষ্টকর হইতে পারে, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না।

চনায় স্যর চার্লস যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার স্বাস্থ্য ঘটিত কথার আলোচনা আমরা ইত্যগ্রেই সমাপ্ত করিয়াছি, পাঠক স্মরণ রাখিবেন; পরন্তু, রায়ত লোকের দারিদ্র্য দুঃখ, অন্নকষ্ট, অনাহার এবং করভারের উপর পুনঃকর অসহিষ্ণুতার বিষয়ও অল্পাধিক উল্লেখ করিয়াছি। স্যর চার্লসের সমালোচনার আরও কোন কোনও প্রধান কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইবে। তবে তাঁহার সকল কথার সম্যক বিচার করিতে হইলে বৃহৎ একখানি বই লিখিতে হয়; অতএব তাহা হইয়া উঠিবে না। ক্রমশঃ

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুপত্রিকা।

(সমালোচনা।)

হিন্দুপত্রিকা—যশোহর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম-সমাজ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য বার্ষিক মূল্য ১৲। ইহার ৬ষ্ঠ সংখ্যাপর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। এই পত্রিকার তিনটি বিশেষ আকর্ষণ আছে,—

(১) রমেশবাবুর বেদানুবাদের নিন্দা।

(২) "পদপাঠ" বা সন্ধি বিশ্লেষণ।

(৩) যে সমাজ হইতে ইহা প্রকাশিত, সেই সমাজে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা।

যাহারা স্বতঃ পরতঃ ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের জন্য যত্নবান, তাঁহারা রমেশ বাবুর নিন্দায় আহ্লাদিত। কেন না রমেশবাবু কায়স্থ হইয়া বেদানুবাদ করিয়াছেন, ইহা অনেকের গাত্রজ্বালাকর হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্রীতদাস, যথা বসু দাস মহাশয়, ঘোষদাস মহাশয় ইত্যাদি, তাঁহারাও রমেশ বাবুর নিন্দায় অসন্তুষ্ট নহেন। রমেশ বাবুর অনুবাদ ভ্রমাত্মক হইয়াছে, ইহা শুনিলেই এই সকল ব্যক্তি এই পত্রিকাস্থ অনুবাদ অতি শুদ্ধ হইয়াছে, ধরিয়া লইবেন, সন্দেহ নাই। ঘটনাও তাহাই হইয়াছে, অনেক "স্মৃতিরত্ন" "ন্যায়ভূষণ" সম্পাদকের অনুবাদকে "হিতকর" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। যে কারণে রমেশ বাবুর অনুবাদ অহিতকর বিবেচিত হইয়াছে, সে কারণ যে এই অনুবাদে কম আছে, তাহা নহে! তবে এ অনুবাদে বর্ণভেদ প্রথা সমর্থন করিতে পারে। 'অগ্নি' শব্দের অর্থে 'পরমাত্মা' করিয়া রমেশ বাবুর ভ্রম প্রমাদ দেখাইতে উদ্যত সুতরাং ইহা যে হস্ত হইতে বাহির হউক না কেন, ইহা ভট্টাচার্য্য মহলে উৎসাহযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আকর্ষণ, একটী প্রবল আকর্ষণ। যাহারা অল্প সংস্কৃত জানে, যাহাদের অধ্যবসায় কম, তাহারা আর সন্ধিবিশ্লেষের কষ্ট ভোগ না করিয়া এই পত্রিকাস্থ উদ্ধৃত সংস্কৃতাংশ সুখে পাঠ করিতে পারিবে। এজন্য অনেক পাঠক আহ্লাদিত, সন্দেহ নাই। এই আকর্ষণ টুকু মৌলিক হইলেও, ইহার শক্তি দীর্ঘকাল কাজ করিবে, এরূপ বিবেচনা করা যায় না, কেননা, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন শিক্ষণীয় বিষয় নহে।

তৃতীয় আকর্ষণ বা নবীনত্ব একটী বিশেষ শক্তি হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ছয় খণ্ড পত্রিকা পাঠ করিয়াও, আমরা বুঝিতে পারি নাই, এই পত্রিকা হিন্দু সমাজে কি পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। "পরিবর্ত্তন" "পরিবর্ত্তন" "পরিবর্ত্তন" ইহার ধ্বনি। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন, তাহা ইহার মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। আমরা এজন্য সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনাদের কার্য্য-প্রণালী বা প্রোগ্রাম কি, তাহাতে উত্তর পাইয়াছি, "কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী নাই।" সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজ "আবাদ" করিবেন, বীজ বপন নাকি অন্যের হাতে। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মসমাজ ধ্বংসের জন্য অবতীর্ণ, নির্ম্মাণ কার্য্য অন্য পুরুষের হাতে। বঙ্গবাসীর

মত গোঁড়া সমাজরক্ষকও বাল্যাপণ প্রভৃতি প্রথা উঠাইতে চাহে। সমাজে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, শুদ্ধ একথা বলিবার জন্য কি একখান বাগাড়ম্বর পূর্ণ পত্রিকার প্রয়োজন? সমাজ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার জন্য যুক্তি উপস্থিত করার সময় বোধ হয় অতীত হইয়াছে। যে প্রণালীতে এই পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই এক্ষণ প্রদর্শন করার, পত্রের দরকার, এবং তাহাই করা সমাজের প্রয়োজনীয়।

এতগুলি কথা বলিলেও আমরা হিন্দু পত্রিকার হিতৈষী। কেননা, সম্পাদকের হৃদয় আমাদের অপরিজ্ঞাত নহে। বিশেষতঃ, তাঁহার অন্তঃকরণের মর্ম্মনিহিত ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূল নহে। যাঁহারা নব্য ভারতে সময় সময় বর্ণনির্ব্বিশেষে সজল ব্যবহারের প্রস্তাব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, এবং "জাতীয় একতা" সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যাঁহাদের নেত্রতলস্থ হইয়াছে, তাঁহারা দেখিবেন, এই পত্রিকার উদ্দেশ্যে এই উভয় কথাই আছে। তবে বড় অস্পষ্ট ভাবে।

"যাহাতে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজ তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন"—সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে এ কথাটী আছে। এস্থলে "জাতীয় একতা" শব্দদ্বয় কোটেশনের মধ্যে লিখিলেই ভদোচিত হইত কেননা জাতীয় একতা সম্বন্ধে নব্যভারতে ৮টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

(১ম সংখ্যার টাইটেল পেজের অপর পৃষ্ঠা দেখ) ৫ম সংখ্যায় ৪৩ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে লিখিত হইয়াছে,—

হিন্দু সমাজে যাহারা নীচ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া গণ্য, তাহারা যত দিন হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে কার্য্য করে, তত দিন তাহাদের অনেক সমাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, কিন্তু যাই তাহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিল, অমনি হিন্দুরা তাহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে বিরত হইলেন, কিম্বা পবিত্রই জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যদি একজন হিন্দু বিনামা নির্ম্মাণের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে অস্পৃশ্য জঘন্য চামার বলিয়া পরিগণিত হইবে, কিন্তু একজন ইংরেজ যদি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে তিনি মেং অমুক সাহেব, সেলাম কুরনিসের যোগ্য এবং তাহার পদাঘাত বেত্রাঘাতও সহ্য হয়।

আরও দেখুন এই চামার আর্য্য যদি হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন আর আমাদের সাধ্য কি যে কর্ত্তৃত্ব খাটাই। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল আর হিন্দুচক্ষেও তাহাদের অপবিত্রতা দূর হইল। তবে কি হিন্দুধর্ম্মই তাহাদের অপবিত্রতার কারণ ছিল? কেবল কি ব্যবসার দ্বারাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কি নীচত্ব নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত? যে ব্যক্তি সমাজে নীচ বলিয়া পরিগণিত, ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে অনেক সদভ্যাসসম্পন্ন ব্যবসায়োপজীবী অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হইতে পারে। তাহার পরোপকার বৃত্তি, ঈশ্বর নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা জিতেন্দ্রিয়ত্ব অধিক হইলেও কি হিন্দু সমাজে সে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে? এইরূপ হওয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম ও যুক্তির বিপরীত।

অনাচরণীয় হিন্দুকে আচরণীয় করিবার প্রস্তাবে আমরা যে জলচল পত্রিকা লিখিয়াছিলাম, এই কথাগুলি সেই উদ্দেশ্যের কত অনুকূল। সম্পাদকের সহৃদয়তার নিকট আমরা কত কৃতজ্ঞ। তথাচ আমরা না বলিয়া থাকিতেছি না যে, যে প্রণালী অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মনস্তুষ্টি করিতে চাহেন, তাহা তাঁহার এ হৃদয়ের বিরুদ্ধ। রমেশ বাবুর নিন্দাবাদে কোন ফল নাই। প্রভূত পরিশ্রম, গভীর চিন্তা, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক যত্ন এবং উচ্চনিম্ন সর্ব্ব প্রকার হিন্দুর হিতচিন্তায় রমেশ বাবু সমাজ সংস্কারকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি বঙ্কিম বাবুর মত হৃদয় প্রচ্ছন্ন করিয়া কোন কথা বলিতে যান নাই, কোন বিশেষ মত সমর্থন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যাহাই সত্য ও ঐতিহাসিক, তাহাই সবল বিশ্বাসে হিন্দু সাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছেন। ঋক্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে আমরা অগ্নি শব্দে অগ্নিই বুঝি, ১০ম মণ্ডলের ১২১ সূক্তেও রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। যাহারা এই পত্রিকার অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় আমাদের মতে মত দিবেন। বৃথা অর্থবিভ্রাট ঘটান, প্রকৃত সংস্কারের বিরোধী। দুঃখের বিষয়, হিন্দুপত্রিকার চেষ্টা যেন সেই দিকে!

শ্রীমধুসূদন সরকার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। হোম-রুল।—শ্রীশ্রীপতিচরণ রায় প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এই পুস্তিকাখানি হোমরুলের সমালোচনা নহে। কোন্ কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া আইরিশ জাতি হোম-রুল-বিল-আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, অতি সংক্ষেপে,হৃদয়গ্রাহী মধুর ভাষায় শ্রীপতি বাবু এই পুস্তকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন জাতির প্রত্যেকের গৃহে, পঞ্জিকার ন্যায়, এক একখানি এইপুস্তক রাখা উচিত; কেননা, ইহাতে শিখিবার, বুঝিবার, ভাবিবার,মনুষ্যত্বলাভের অনেকউপদেশ আছে, পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা খুব সুখী হইলাম।

২। দারোগার দপ্তর—বাঃ গ্রন্থকার।—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০। প্রিয় বাবুর যেমন ভাষা, তেমনই ভাবযোজনা। অল্প কথায় সরল করিয়া এদেশের অল্প লেখক এরূপ গল্প লিখিতে পারেন। পড়িলে শিক্ষা পাওয়া যায়,জ্ঞান জন্মে, কৌতুহল পরিতৃপ্ত হয়, বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যায়, এবং আমাদের মনে হয়, কোন কোন ব্যক্তি জাল জুয়াচুরি কিরূপ করিয়া করিতে হয়, তাহাও শিখিতে পারে। "বাঙ্গলা-গ্রন্থকার" পড়িয়া আমাদের মনে এ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে যে, ইহাতে অপরিপক্ক-চরিত্র লোকের অনিষ্ট হয় কি না? গ্রন্থকার একজন সৎ লোক, এই সন্দেহের মীমাংসা করিবেন, আশা করি।

৩। Treatment by Electricity or Electro-Therapeutics. By Nandalal ghosh, L. M. S. এই পুস্তকের প্রারম্ভে, সুযোগ্য, সুচিকিৎসক বিখ্যাত ডাক্তার হরনাথ রায় মহাশয়ের বিস্তৃত একটী উপক্রমণিকা আছে। তাহা অতি উদার, উপাদেয়, সুচিন্তাপূর্ণ। বৈদ্যুতিক চিকিৎসা-প্রণালীতে কোন্ কোন্ রোগের উপকার হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা এই পুস্তকে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলে বহু লোকের উপকার হইত। পুস্তকখানিতে শিক্ষা করিবার অনেক জিনিষ আছে। পড়িয়া যারপর নাই সুখী হইলাম।

৪। রাবণ-বধ কাব্য—প্রথম খণ্ড, মূল্য ১৲। শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর বিরচিত ও প্রকাশিত। মেঘনাদবধ কাব্যের পরবর্ত্তী ঘটনাবলম্বনে লিখিত। সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে এই গ্রন্থখানি লিখিত,এজন্য গ্রন্থকারের আশঙ্কা যে,সাধারণ পাঠকগণের নিকট পুস্তকখানি নীরস বোধ হইবে। কিন্তু এরূপ চেষ্টা না করিলেও বাঙ্গালা ভাষার তাদৃশ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। এজন্য,আমরা গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার এই অভিনব ভাষাচাতুর্য্য বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিবে কিনা,বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যদি নাও চলে, এ কথা সকলেই বলিবে যে, হরগোবিন্দ বাবুর চেষ্টা ও উদ্যোগ বড়ই প্রশংসনীয়। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন,অর্থ ব্যয়করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া পারিবে?

পুস্তক খানি এখনও অসম্পূর্ণ,সুতরাং বিস্তৃত সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। সমাপ্ত হইলে এই পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করার ইচ্ছা আছে।

৫। চরিত-রত্নাবলী শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক লিখিত ও ২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস-ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।০ চারি আনা। এই পুস্তক খানিতে কয়েকটী ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা ও কয়েকজন সাধক ভক্তের জীবনী সংগ্রথিত হইয়াছে। ধার্ম্মিক কিরূপে পাপাত্মাদিগের শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও আপনাকে পবিত্র রাখে, নিমজ্জমান পাপী কিরূপে পুনরুত্থান করে, এই সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে তাহা শিক্ষা করা যায়। পুস্তকখানির ভাষা বেশ সরল ও তৃপ্তিকর, পাঠে আনুরক্তি জন্মে। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ইহা পাঠযোগ্য।

দ্বাদশ খণ্ড—অষ্টম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে, শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত,
২১০/৪নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ডাকমা... ৩]

সম্পাদকের নিবেদন।

আমার শরীর বড়ই অপটু হইয়াছে; একটু জ্বর অবিচ্ছিন্নভাবে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আবার জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। এ কারণ বায়ু পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পরের সংখ্যা নব্যভারত প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব হইলে গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন।

বহু গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী, এদিকে টাকার অভাবে আমাদিগের যারপর নাই কষ্ট হইতেছে। এই সময়ে গ্রাহকগণ দয়া করিয়া কিছু কিছু দিলে যারপর নাই উপকৃত হইব।

নব্যভারতের এজেণ্ট বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার, বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক এবং বাবু রজনীকান্ত মিত্র মূল্য আদায় করিতে কোথাও উপস্থিত হইলে, গ্রাহকগণ আমার স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া ও টাকার পরিমাণ চেকের মুড়িতে লিখিয়া দিয়া মূল্য প্রদান করিবেন।

বহু সমালোচনার পুস্তক জমিয়াছে, শরীরের অসুস্থতার দরুণ সমালোচনা হইতেছে না, গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? (৩)

একবার কোন ব্যক্তি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোনকে বলিলেন, হার্বার্ট স্পেন্‌সর এক খানি গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মানুষ পরমেশ্বরের বিষয় কিছু বুঝে না। গ্লাড্‌ষ্টোন উত্তর করিলেন, মানুষ পরমেশ্বরের বিষয় কি বুঝিবে? লোকে যখন আমার বিষয়ই বুঝিতে পারে না, তখন ঈশ্বরের বিষয় কি বুঝিবে? আমি কি অভিপ্রায়ে, কি কার্য্য করি, ইংলণ্ডবাসীগণ কি তাহা বুঝিতে পারে? আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নানা কথা বলে। যখন মানুষ মানুষকেই বুঝিতে পারে না, তখন ঈশ্বরকে কেমন করিয়া বুঝিবে? কেমন করিয়া তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করিবে?

বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, জগৎ আগ্নেয় বাষ্পাকারে শূন্যমার্গে ঘুরিতেছিল। ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়া জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। এই উপযোগিতা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। একদিকে প্রাকৃতিক উৎপাত ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিতেছে, অপরদিকে মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্ষমতার ক্রমোন্নতি হওয়াতে প্রাকৃতিক উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় সকল আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতেছে। যে শক্তি ও নিয়ম, সকল জগৎকে বাষ্পাকার হইতে বর্ত্তমান আকারে আনিয়াছে, সেই শক্তি ও নিয়ম সকলের ক্রিয়া এখনও চলিতেছে। এখনও পরিবর্ত্তন ও উন্নতির স্রোত বহিতেছে। সৃষ্টি ক্রিয়া ক্রমাগত চলিতেছে। জগৎ পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় নাই। জগতের পরিণাম সম্বন্ধে পরমেশ্বরের পূর্ণ অভিপ্রায় এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান্ সময়ে জগৎ কার্য্যের সমালোচনা, উহার দোষ গুণ বিচার, নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু জগতের কার্য্য আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র জগৎ ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতেছে।

যে সকল বিষয়কে আমরা আপাততঃ কষ্টকর বলিয়া মনে করি, গভীর ভাবে চিন্তা করিলে তাহার মধ্যেও পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ভয় এই সকলকে মানুষ সচরাচর কষ্টের কারণ মনে করে। কিন্তু ঐ সকল কি আমাদের উপকার করিতেছে না? যদি বুদ্ধি চালনা করিয়া, বিচার করিয়া আহার পান করিতে হইত, তাহা হইলে কয় জন লোকের শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিত? যখন শরীরের পক্ষে আহার প্রয়োজন, তখন ক্ষুধা আমাদিগকে উহাতে বল পূর্ব্বক প্রবৃত্ত করে। যখন জল পান প্রয়োজন, তখন তৃষ্ণা আমাদিগকে জলপান করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলে। আমরা এতদূর নির্ব্বোধ যে, ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনা সত্বেও অনেক সময় উপযুক্ত সময়ে আহার না করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করি। এরূপ স্থলে যদি আহার পান করিবার ভার সম্পূর্ণ রূপে আমাদের বিচারশক্তির উপরে নির্ভর করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের শরীর রুগ্ন হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইত। জ্ঞানময় পরমেশ্বর তাহা জানেন। সেই জন্যই তিনি আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপরে আমাদের আহার পানের ভার দিয়া রাখেন নাই। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রূপ এমন দুই প্রবল শক্তিকে আমাদের দেহে রক্ষা করিয়াছেন যে, উহারা আমা-

দিগকে উপযুক্ত সময়ে আহার পান করিতে বাধা করে। ক্ষুধা না থাকিলে শিশুগণ কি সময় বিবেচনা করিয়া আহার করিতে পারিত? অথবা তাহাদের পিতা মাতাগণ কি সকল সময়েই তাহাদের শরীরের উপযুক্ত অবস্থায় তাহাদিগকে আহার দিতে পারিতেন? কেবল শিশু বলিয়া কেন? প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণই যখন ক্ষুধা তৃষ্ণার স্বাভাবিক উত্তেজনা সত্ত্বেও অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী হইয়া শারীরিক নিয়মলঙ্ঘন করেন, তখন শিশুদিগের বিষয় ত দূরের কথা।

ভগবান্ মানবাত্মার মধ্যে তাঁহার আদেশ প্রকাশ করেন, ইহা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আমি করি। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে যেমন তিনি আমাদিগকে আদেশ করেন, তেমনি শারীরিক বিষয়েও তিনি এক প্রকার আদেশ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত সময়ে আহার পান করিবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা তাঁহার এক প্রকার আদেশ। আমাদের কল্যাণের জন্য, প্রতিদিন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আহার পানের উপযুক্ত সময় হইয়াছে।

দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়, কিন্তু উহাতেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। দুর্গন্ধ আমাদিগকে সাবধান করে। শটিত বা অন্যরূপ দুর্গন্ধময় পদার্থ হইতে এমন এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়, যাহা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইলে শরীর অসুস্থ হইতে পারে। সুতরাং মঙ্গলময় বিধাতা এমনই বিধান করিয়াছেন যে, যখনই উহার সহিত আমাদের নাসারন্ধ্রের যোগ হয়, তখনই ক্লেশানুভব হইয়া থাকে। ক্লেশানুভব হইলেই আমরা সাবধান হই, দুর্গন্ধময় পদার্থকে পরিহার করি। তাহাতে আমাদের শরীর রক্ষা পায়। পরমেশ্বর কেমন সুকৌশলে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছেন। পশুরা যখন কোন দ্রব্য আহার করে, তখন প্রথমে তাহার ঘ্রাণ লয়। ঘ্রাণদ্বারা তাহারা বুঝিতে পারে, উহা তাহাদের আহার্য্য কি না। বোধ হয় ঘ্রাণ মনোরম হইলেই তাহারা আহার করে, এবং ক্লেশকর হইলেই তাহারা উহা পরিত্যাগ করে।

পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে অল্প ক্লেশ, অধিকতর ক্লেশ নিবারণ করে। অল্প ক্লেশ পাইলেই আমরা সাবধান হই। তাহাতে অধিকতর ক্লেশ, অনেক সময় গুরুতর বিপদ্ নিবারিত হয়। সুতরাং ক্লেশ আমাদের বন্ধু। পরমেশ্বর অনেক সময়ে কিছু কষ্ট পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে মহা দুঃখ ও বিপদ হইতে রক্ষা করেন। আমরা বুঝি না বলিয়া তাঁহাকে দোষ দিই। সকল দিক্ দেখিনা বলিয়া তাঁহাকে দোষ দিয়া থাকি।

এক ব্যক্তি কোন স্থানে দেখিলেন যে, দুই জন লোক একটী শিশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে এবং অন্য এক ব্যক্তি শিশুর উরুদেশে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে। শিশুর শরীর হইতে রক্তস্রোত বহিতেছে। সে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। যিনি ইহা দেখিলেন, তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এই ভয়ঙ্কর নৃশংস ব্যাপার দেখিয়া তিনি বিরক্তি ও ক্রোধে অস্থির হইলেন। উক্ত তিন জন লোকের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন শুনিলেন যে, যে দুই ব্যক্তি শিশুকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আছে, উহার মধ্যে একজন শিশুর পিতা; আর একজন তাহার পিতৃব্য; আর যিনি উহার উরুদেশে অস্ত্র চালনা করিতেছেন, তিনি একজন চিকিৎ-

সক। গভীর স্ফোটক হওয়াতে তিনি অস্ত্র চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সকল কথা শুনিয়া দর্শক ভদ্রলোকটীর বিরক্তি ও ক্রোধ চলিয়া গেল, তিনি লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একদেশদর্শিতার জন্য আমরা অনেক বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না। অনেক বিষয়ের অর্থ না বুঝিয়া আমরা ভ্রান্তি-সঙ্কুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই! শিশুর প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা হইতেছে মনে করিয়া যিনি ক্রোধে অস্থির হইলেন, তিনিই আবার উক্ত ঘটনার সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া, উহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া, লজ্জিত হইলেন। যাঁহাদিগকে তিনি নিষ্ঠুর অত্যাচারী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই শিশুর পক্ষে পরম হিতকারী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। জগৎ কার্য্য সম্বন্ধেও মনুষ্যের এই প্রকার হইয়া থাকে। আমরা অনেক ঘটনার অর্থ না বুঝিয়া পরমহিতকারী বন্ধুকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলিয়া মনে করি। পরমেশ্বর অনেক সময় আমাদিগের সম্বন্ধে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকেন, আমরা না বুঝিয়া মনে করি তিনি কষ্ট দিতেছেন।

মনুষ্যের অভাব আছে বলিয়াই তাহার কার্য্যশীলতা আছে। কার্য্যশীলতা আছে বলিয়াই ক্রমবিকাশ সম্ভব হইতেছে। সেই জন্যই সহানুভূতি, সহযোগিতা, ও প্রতিযোগিতা সম্ভব হইতেছে। এই স্বাভাবিক অভাবজনিত কার্য্যশীলতার জন্যই মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের যোগ হইতেছে। মনুষ্যের পরস্পরের মধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ, তাহার মূলে এই স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও অভাব। সেই স্বাভাবিক অভাব দূর করিবার জন্যই মনুষ্য কার্য্যশীল হয়। কার্য্যশীলতাতেই তাহার গৌরব, মহত্ব ও উন্নতি। নতুবা মানুষ জড়ের মত হইয়া থাকিত। সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে, স্নেহ দয়া প্রেম না থাকিলে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায় থাকিত? অভাব হইতেই কার্য্যশীলতা। কার্য্যশীলতা না থাকিলে মানুষ ও জড়ে কি প্রভেদ থাকিত? নিজের ও অপরের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্যই মানুষ ব্যস্ত। ইহাতেই তাহার গৌরব ও মহত্ব। ইহাতেই মানব প্রকৃতির ক্রমোন্নতি।

জীবের অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী (necessary)। সুতরাং অপূর্ণতা জনিত দুঃখও অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভাবী হইলেও উহা অস্থায়ী। অনেক স্থলে উহা উচ্চতর সুখের হেতু। আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ইহা সকল স্থলে দেখিতে পায় না। সুতরাং না বুঝিয়া আমরা পরমেশ্বরকে দোষ দিই। বিশ্বরূপ যন্ত্রের সকল অংশ দেখি-না, বুঝিনা—প্রায় কিছুই বুঝিয়া—না বুঝিয়া কত কথা বলি, না বুঝিয়া দোষ দি।

একজন আদপাগলা রকমের লোক গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতাপে বহুদূর পর্য্যটন করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী এক বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে আসিয়া উপবিষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর হইলে সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, পরমেশ্বরের এ কেমন বিবেচনা? কুমড়া লাউ প্রভৃতি সামান্য লতা মাত্র; অথচ উহাদের কত বড় ফল; আর বটবৃক্ষ এমন প্রকাণ্ড, অথচ ইহার ফল কত ক্ষুদ্র। ভগবানের সামঞ্জস্য বোধ নাই। এই রূপে সেই লোকটী পরমেশ্বরের কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার মস্তকে একটী বটের ফল পতিত হইল। তখন সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বুঝিয়াছি, বাবা, তোমার ভুল নয়, আমারই ভুল। কুমড়া লাউ প্রভৃতি ফল যেমন বড়, যদি

সেই হিসাবে বটবৃক্ষের ফল বড় হইত, তাহা হইলে আজ আমার মস্তকটী ত গিয়াছিল। আমরা অনেক সময় না বুঝিয়া অনন্ত পুরুষের সৃষ্টি-লীলার সমালোচনা করি,না বুঝিয়া তাঁহার কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করি। "খোদার উপর খোদকারী" করিতে গিয়া আমরা মহা ভ্রমে পতিত হই।

মৃত্যু চরাচর শাসন করিতেছে। অবোধ মনুষ্য মৃত্যুকে মহা অমঙ্গল বলিয়া মনে করে। কিন্তু মৃত্যুতে জগতের মঙ্গল না অমঙ্গল? যাঁহারা পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করেন, তাঁহারা বলেন যে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে কেমন করিয়া মহা অমঙ্গলকর মৃত্যুর বিধান সম্ভব হইল? যাঁহারা মৃত্যুকে মহা অমঙ্গল বলিয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে দোষারোপ করেন, তাঁহারা কি জীবনকে সুখময় বলেন? তাঁহাদের মতে জীবের জীবন দুঃখময়; জীবনে সুখ যদি থাকে,অতি সামান্য। এ সংসারে জীবকে অধিকাংশ স্থলে দুঃখই ভোগ করিতে হয়। জীবন যদি দুঃখময় হইল, তবে জীবনে মঙ্গল কোথায়? জীবের জীবন ও মৃত্যু এই উভয়ই দুঃখ ও যন্ত্রণাময়। সংশয়বাদী বলেন যে,জীবন ও মৃত্যু এ উভয়ই যন্ত্রণাময়। তবে মঙ্গল কোথায়? মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের জগতে এত দুঃখ যন্ত্রণা কেন?

যদি বল মৃত্যু অমঙ্গল; তাহা হইলে জীবন কি মঙ্গলময় হয় না? জীবনের অবসান হওয়ার নামই মৃত্যু। জীবনের অবসান হইল, তাহাতে দুঃখ কি? দুঃখময় জীবন চলিয়া গেল, ইহা ত সুখেরই বিষয়। জীবন যদি দুঃখময় হয়—অমঙ্গলময় হয়, তবে কোন্ যুক্তিতে মৃত্যুকে অমঙ্গল বল? জীবন ও মৃত্যু পরস্পর বিপরীত। জীবন যদি মন্দ হয়, তবে তাহার বিনাশ অবশ্য ভাল। যাহা মন্দ, তাহা নষ্ট হওয়াই ভাল। যদি বল, জীবন দুঃখময় —অমঙ্গলময়, তবে কোন্ যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলিতে পার যে, মৃত্যু অমঙ্গল? যদি বাস্তবিকই মৃত্যু একটী অমঙ্গল হয়, যদি বাস্তবিকই জীবন শেষ হওয়া দুঃখের বিষয় হয়, তবে বলিতেই হইবে যে, জীবন দুঃখময় বা অমঙ্গলময় নহে—এ জীবনে অনেক সুখ আছে। জীবন যদি মন্দ হয়,মৃত্যু ভাল। আর মৃত্যু যদি মন্দ হয়, জীবন ভাল। অন্ধকার যদি মন্দ হয়, আলোক ভাল; আলোক যদি মন্দ হয়, অন্ধকার ভাল। পরস্পর দুই বিপরীত পদার্থ, উভয়ই ভাল বা উভয়ই মন্দ, ইহা সহজযুক্তিবিরুদ্ধ। যাঁহারা জীবন এবং মৃত্যু এই উভয়কেই অমঙ্গল মনে করিয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথার অসঙ্গতি দোষ তাঁহারা দেখিতে পান না। ক্ষুধায় আহার ভাল,অনাহার মন্দ। সমান অবস্থায় অনাহার ও আহার উভয়ই ভাল, বা উভয়ই মন্দ,ইহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি বিরুদ্ধ।

জীবনে সুখ অধিক কি দুঃখ অধিক? সুখ কিসে হয়? জীবন রক্ষার পক্ষে যাহা অনুকূল, তাহাতেই সুখ। জীবন রক্ষার পক্ষে যাহা প্রতিকূল, সাধারণতঃ তাহাতে জীবের কষ্ট। জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল অবস্থাতে সুখোৎপত্তি হয়; এবং জীবন রক্ষার প্রতিকূল অবস্থাতে দুঃখোৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ প্রকৃতির এই নিয়ম। জীবন রক্ষার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা অধিকতর হইলে জীবন থাকে না। জীবন রক্ষার পক্ষে অনুকূল অবস্থা অধিকতর থাকিলই জীবন রক্ষা সম্ভব হয়। সুতরাং জীবের জীবনে প্রতিকূল অবস্থা অপেক্ষা অনুকূল অবস্থারই আধিক্য রহিয়াছে। নতুবা জীবন সম্ভব

হইত না। প্রতিকূল অবস্থা অপেক্ষা অনুকূল অবস্থার আধিক্য থাকাতে ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবনে দুঃখের অপেক্ষা সুখ অধিক।

মানুষ যত দুঃখ পায়, অনেক নিজের দোষে। পরমেশ্বরকে দোষ দেওয়া অন্যায়। এ কথায় কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পরমেশ্বর মানুষকে দোষ করিবার ক্ষমতা কেন দিলেন? জড় প্রকৃতির ন্যায় মানুষ যদি অনতিক্রমনীয় নিয়মে বদ্ধ হইত, যদি মানুষের স্বাধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে ত মানুষ দোষ করিতে পারিত না? পরমেশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিলেন কেন? স্বাধীনতা না দিলে মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম অসম্ভব হইত। ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, ইহাই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ গৌরব। স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইত। স্বাধীনতাই ধর্ম্মের জীবন। যে নারী চিরকাল লৌহময় গৃহে কঠিন নিগড়ে বদ্ধ, তাহাকে সতী বলিয়া কি কেহ প্রশংসা করে? যেখানে পাপ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে ধর্ম্মোপার্জ্জনও অসম্ভব। পক্ষাঘাত রোগে যাহার হস্ত পদ অবশ, তাহাকে কি কেহ নিরুপদ্রব বলিয়া, কাহাকেও আঘাত করেনা বলিয়া, প্রশংসা করিতে পারে? স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মনুষ্য নীতি ও ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছে। স্বাধীনতাতেই মানুষের গৌরব। যদি স্বাধীনতা না থাকিত, তবে মনুষ্য কোন সৎকার্য্য করিলেও মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া তাহার কোন মূল্য থাকিত না। বিপরীত পথে চলিবার শক্তি আছে বলিয়াই, মনুষ্য সৎপথে চলিলে তাহার প্রশংসা ও গৌরব। গ্রহের কক্ষের ন্যায় যদি মানবজীবনের একই নির্দ্দিষ্ট পথ থাকিত, উহা হইতে বিচ্যুত হওয়া ঐশিক নিয়মানুসারে অসম্ভব হইত, তাহা হইলে মানবের কার্য্যে নিন্দা বা প্রশংসা, দোষ বা গুণ, গৌরব বা হীনতা, ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের স্থান থাকিত না। যেমন ঐ কাষ্ঠ খণ্ড জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, যেমন ঐ তৃণ খণ্ড বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যও অখণ্ডনীয় প্রাকৃতিক শক্তি-দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহার নিজের স্বতন্ত্রতা কিছুই থাকিত না।

ব্রহ্মাণ্ডে দুই শক্তি, ঐশী শক্তি ও জীবশক্তি। পরমেশ্বর স্বয়ং কার্য্য করিতেছেন এবং জীব তাঁহা হইতে প্রাপ্ত শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছে। জগতের যাবতীয় ঘটনা ও কার্য্য, দুই প্রকার হইতে পারে। হয়, ঈশ্বরের কার্য্য-নতুবা জীবের কার্য্য। যদি বল, মানবের স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে সকলই ঈশ্বরের কার্য্য হইয়া যায়, সকলই তিনি করিতেছেন। স্বাধীনতা অস্বীকার করিলে, যাহাকে সচরাচর লোক জীবের কার্য্য বলে, তাহা বাস্তবিক জীবের কার্য্য থাকে না। পরমেশ্বরেরই কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জীবের স্বতন্ত্র শক্তি যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাহার স্বতন্ত্র কার্য্যও কিছু থাকে না, সকলই ঈশ্বরের কার্য্য হইয়া যায়। যাহা আমি করিতেছি বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক আমি করিতেছি না। আমার কার্য্য কিছুই থাকিল না। আমার কার্য্যকে ভাল বল, আর মন্দই বল, ধর্ম্ম বল, অধর্ম্মই বল, কিছুই আমার কার্য্য নহে।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। যদি কেহ সম্পূর্ণ বলদ্বারা আমাকে কোন কাজ করায়, যদি উক্ত কার্য্য সম্বন্ধে আমার কর্ত্তৃত্ব কিছু মাত্র না থাকে, তবে উক্ত কার্য্যের জন্য আমি ধর্ম্মতঃ দায়ী নহি। যদি সম্পূর্ণ বলের সহিত

তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে কিছু লিখাইয়া লই, যদি আমার বলকে অতিক্রম করিবার শক্তি তোমার লেশ মাত্র না থাকে, তাহা হইলে ঐ লেখার জন্য তুমি দায়ী নহ। কেন না উহা তোমার লেখা নহে—আমার লেখা।

জীবের স্বতন্ত্র শক্তি না থাকিলে, ইহা বলিতেই হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘটনা ও কার্য্য ব্রহ্মশক্তি হইতে নিঃসৃত হইতেছে। সুতরাং কার্য্যের মধ্যে পাপ ও পুণ্য, গর্হিত বা প্রশংসনীয়, এই রূপ বিভাগ কেমন করিয়া থাকিবে? জড়জগতে বা জীবজগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, যে কোন কার্য্য হইতেছে, সকলই পরমেশ্বরের কার্য্য। সুতরাং কার্য্যের মধ্যে পাপ পুণ্যের প্রভেদ কেমন করিয়া থাকিবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকে না। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই অধর্ম্ম সম্ভব, অধর্ম্ম আছে বলিয়াই ধর্ম্ম সম্ভব।

স্বাধীনতা না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু কেবল স্বাধীনতা থাকিলেই যে ধর্ম্ম হয়, এমন নহে। ধর্ম্মবুদ্ধি (moral sense), স্বাভাবিক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ব্যতীত পাপ পুণ্য সম্ভব হয় না। মানবহৃদয় নিহিত স্বভাবজাত ধর্ম্মজ্ঞান, ন্যায় অন্যায় বোধের সত্তা প্রতিপন্ন করিতেছে যে, মানুষ স্বতন্ত্রশক্তিসম্পন্ন জীব। যে ব্যক্তি অন্যের হস্তের যন্ত্র, বায়ুপরিচালিত তৃণ খণ্ডের ন্যায় অন্য শক্তি দ্বারা যে নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে, তাহার পক্ষে উচিত, অনুচিত; ন্যায় অন্যায়; ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সকল বাক্য অর্থশূন্য শব্দমাত্র। ধর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছে যে, জড়জগতের ন্যায় মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে চিরবদ্ধ নহে।

তুমি জগতের হিত চাও, তোমার যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতের কর্ত্তা, তিনি জগতের হিত চান না? তুমি কি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছ? হাউয়ার্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা কি হাউয়ার্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট? স্রষ্টা অপেক্ষা সৃষ্ট বড়, কারণ অপেক্ষা কার্য্য বড়, ইহার অপেক্ষা অসার অযুক্ত কথা কি আছে?

এস্থলে কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন যে, সাধু মহাত্মাদের দেখিয়া যদি তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের পবিত্রতা ও মঙ্গলভাব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলে জগতে যে সকল নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, পিশাচ তুল্য লোক ছিল এবং এখনও আছে, তাহাদিগকে দেখিয়া ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বল না কেন? অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে এই আপত্তির অসারতা সহজেই প্রতীত হয়।

চিত্ত যখন প্রশান্ত থাকে, অর্থাৎ যে সময়ে পাপের প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বিবেক চক্ষু মলিন হয় না, সেই সময়ে যদি অতি নৃশংসস্বভাব অত্যাচারীকে, অতি হীন স্বভাব পাপাত্মাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, বল দেখি, প্রেম ভাল, কি, অপ্রেম ভাল? বল দেখি, পুণ্য শ্রেষ্ঠ কি পাপ শ্রেষ্ঠ? বলদেখি, তুমি যে সমস্ত বস্তুর জন্য অত্যাচার কর, পাপ কর, অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, সুখ, যশঃ, মান, প্রভুত্ব, এই সমস্ত যদি অত্যাচার না করিয়া, পাপ না করিয়া পাও, তবে অত্যাচার কর কি না? তাহা হইলে সে ব্যক্তি অসংকোচে বলিবে, প্রেমই শ্রেষ্ঠ, পুণ্যই শ্রেষ্ঠ, বিনা অত্যাচারে অভিলষিত সমস্ত বস্তু পাইলে অত্যাচার করি না, পাপ করি না। এই যে প্রেম পুণ্যের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, স্বাভাবিক আকর্ষণ, ইহা মানব মাত্রেরই অন্তরে বর্ত্তমান। সকলের মধ্যে ইহা সমান উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত নহে। শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনের তারতম্যানুসারে ইহার উজ্জ্বলতারও তারতম্য হয়। কিন্তু সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরি-

মাণে পূর্ণমঙ্গল ও পূর্ণ পবিত্রতার সাধারণ আদর্শ বর্ত্তমান। যাহার মধ্যে যে পরিমাণে ইহা প্রকাশিত, তাহার নৈতিক দায়িত্ব তত। তাহার মধ্যে পাপ পুণ্যের সংগ্রাম তত অধিক। ইহাই পরমেশ্বরের পূর্ণ মঙ্গলভাব ও পূর্ণ পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি আত্মার অভ্যন্তরে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন "আমি পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ, আমি পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ।"

ঘোর অত্যাচারী, নৃশংস, দুর্বৃত্ত লোকের হৃদয়ের গভীর স্থানে যে স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি ঘোর অত্যাচারী, আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য লোককে সর্ব্বদাই কষ্ট দিয়া থাকে, পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন যাহার জীবনের প্রধান কার্য্য, যদি এমন কোন ব্যক্তির প্রতি অপর কেহ আসিয়া অত্যাচার করে, তাহা হইলে, সে কি আপনার উৎপীড়ককে অত্যাচারী বলিয়া মনে করে না ? সে কি মনে করে না যে, তাহার প্রতি উৎপীড়ন করাতে যার পর নাই অন্যায় করা হইতেছে ? অত্যাচারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলে সে কি উহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করে না ? যে চুরি করিয়া থাকে, তাহার দ্রব্য চুরি করিলে সে কি উক্ত কার্য্য নিতান্ত অন্যায় বলিয়া মনে করে না ? চোরকে চোর বলিয়া ঘৃণা করে না ? ব্যভিচারীর গৃহ মধ্যে দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া অপর পুরুষ প্রবেশ করিলে সে কি তাহাকে দুষ্কার্য্যকারী বলিয়া ঘৃণা করে না ? এবং অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রাণগত বিরক্তি ও আগ্রহের সহিত যত্ন করে না ? এই সকল দৃষ্টান্তে প্রমাণ হইতেছে যে, যে ব্যক্তি নিজে অত্যাচারী, তাহার প্রতি অত্যাচার হইলে, যে নিজে চোর তাহার সামগ্রী চুরি করিলে, যে নিজে পরদারগামী, তাহার পরিবারের মধ্যে অন্য পুরুষ মন্দ অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিলে, তাহাদের হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া ঐ সকল কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া ব্যক্ত করে, এবং তখন তাহারা ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠাতাগণকে দোষী, অপরাধী বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে। অন্যের প্রতি অত্যাচার করিবার সময় স্বার্থান্ধ হইয়া যাহারা আপনার কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, তাহাদের নিজের প্রতি অপরে অত্যাচার করিলে তখন তাহারা উহা একান্ত অন্যায় বলিয়া পরিষ্কার রূপে বুঝে এবং অত্যাচারকারীকে ঘৃণা করে। ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা জনসমাজে আপনাদের দুষ্ক্রিয়ার জন্য নরাধম দুরাত্মা বলিয়া গণ্য হয়, তাহাদেরও হৃদয়ে স্বাভাবিক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বুদ্ধি বিনষ্ট হয় না।

পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান, — নৈতিক বুদ্ধি, নীতির একটা আদর্শ চির স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি মনুষ্যকে নৈতিক জীব করিয়া, ধর্ম্মের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, ইহা কি কখন সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে যে, পরমেশ্বর তাঁহার জীবকে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপে দোষ দিতে পারে ? পুত্রকে পিতা এমন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন যে, যাহাতে পুত্র পিতার কার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাহার নিন্দা করিতে পারে ? ইহা কি সম্ভব ? নিঃস্বার্থ হিতৈষণা মানবহৃদয়ের একটা মূল-ভাব। ইহা স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন, কোন বাহ্য কারণে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। নির্দ্দোষ ব্যক্তি

মার্গের অনুসরণ করিলে এই নিশ্চয়, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে "নোপকারাৎ পরোধর্ম্মঃ" ইহা মানবহৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাবাক্য।

কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্য যাহা কিছু করে, সকলই স্বার্থসিদ্ধির জন্য। নিঃস্বার্থ হিতৈষণা মানবপ্রকৃতিতে সম্ভব নহে। মানব প্রকৃতিতে স্বার্থানুসন্ধান ভিন্ন উচ্চতর কিছু নাই,—নিঃস্বার্থ পরোপকার অমূলক বাক্য মাত্র। এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা মানব প্রকৃতির বিষয় কিছু বুঝেন না। মানবপ্রকৃতির প্রকৃত মহত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। নিঃস্বার্থভাব না থাকিলে মনুষ্যের কোন কার্য্যেরই মহত্ত্ব থাকে না। অন্যের হিতের জন্য যাহা করিতেছি, তাহাই যদি স্বার্থমূলক হয়, তাহা হইলে পরহিতব্রতের মহত্ত্ব কোথায় থাকে? আপনার জন্য যাহা করিতেছি, এবং পরের জন্য যাহা করিতেছি, উভয়েরই উদ্দেশ্য যদি আত্মসুখ, স্বার্থসিদ্ধি, তাহা হইলে এই উভয় প্রকার কার্য্যই এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল। পরহিতব্রতের বিশেষ মহত্ত্ব কিছুই থাকিল না। কেননা, অভিসন্ধির মহত্ত্ব অনুসারে কার্য্যের মহত্ত্ব হয়। যখন উভয় প্রকার কার্য্যের একই অভিসন্ধি, তখন নিজের জন্য যাহা করি, এবং পরের জন্য যাহা করি, উভয়েরই মূল্য সমান। একই অভিসন্ধি হইতে উভয় প্রকার কার্য্য নিঃসৃত হইতেছে। পোলাও খাওয়া, দাবা খেলা, থিয়েটরে যাওয়া ইত্যাদি কার্য্যের সহিত, পরহিতব্রতে জীবন বিসর্জ্জনের প্রভেদ কোথায়? যদি এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বার্থবুদ্ধি হইতেই সকল কার্য্যের উৎপত্তি,—নিঃস্বার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি যদি একটা কথার কথা মাত্র হয়, তাহা হইলে কোন কার্য্যের নৈতিকত্ব থাকেনা। কোন কার্য্যকে বিশেষভাবে নৈতিক কার্য্য বলা যায় না। কার্য্যের মধ্যে উচ্চ নীচ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম এরূপ পার্থক্য বিনাশ হইয়া যায়। কেননা, সকল কার্য্যেরই অভিসন্ধি এক স্বার্থসিদ্ধি।

স্বার্থমূলক নীতি-তত্ত্ব যে একান্তই ভ্রান্তিমূলক, তাহা মানবপ্রকৃতির সূক্ষ্মরূপ আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। মনুষ্য যতই উন্নতিপথে অগ্রসর হয়, ততই সে স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে, আত্মসুখ ভুলিয়া অন্যের সুখ সাধনে জীবন সমর্পণ করিতে থাকে। আমি সুখী হইব, এই ভাব, এই বাসনা, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। অন্যকে সুখী করিব, এইভাব, এই বাসনা, ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। মনুষ্যের মধ্যে কে প্রকৃত মহৎ? কাহাকে মহাত্মা বলিব? আত্মসুখচিন্তা যাঁহার হৃদয়কে পরিহার করিয়াছে, জগতের লোক কিসে সুখী হইবে, এই চিন্তাই যাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে। *

আর এক শ্রেণীর দার্শনিক, স্বার্থমূলক নীতিতত্ত্ব অস্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও অনেকে মানবহৃদয়নিহিত স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন নৈতিক বোধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতকে হিতবাদ বলে। তাঁহারা বলেন, যে কার্য্যে জগতের অধিকাংশ লোকের হিত হইয়া থাকে, অথবা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নৈতিক কার্য্য, তাহাই ধর্ম্ম এবং যে কার্য্য তাঁহার বিপরীত হয়, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য,—তাহাই অধর্ম্ম। হিতবাদীদিগের মত স্বীকার করিলেও নীতির মৌলিক

* বিস্তৃতরূপে এবিষয়ের আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে। যতটুকু সম্ভব, সংক্ষেপে বলা হইল। যাঁহারা এবিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, নীতি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সকল তাঁহাদের পাঠ করা আবশ্যক।

ভাবের অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। হিতবাদী বলেন,যে কার্য্যে জগতের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল হয়, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহাই করা উচিত। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই,যাহাতে অধিকাংশের উপকার, তাহা করা উচিত কেন? তাহা করিতে আমরা বাধ্য কেন? নীতি সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক বিশ্বজনীন, স্বতঃসিদ্ধ, মৌলিক ভাব স্বীকার করা ভিন্ন,এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নাই, কোন মীমাংসা নাই। বিশেষতঃ যখন মনুষ্যকে আত্মস্বার্থ-বিসর্জ্জন দিয়া জগতের হিতসাধন করিতে হইবে,তখন সে আত্মসুখ পরিহার করিতে বাধ্য কেন? ইহার উত্তরে হিতবাদী বলিতে পারেন যে, জনসমাজের সাধারণ মঙ্গলে তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল; সুতরাং আত্মমঙ্গলের জন্য জগতের অধিকাংশ লোক হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। এরূপ বলিলে হিতবাদ আর কোথায় থাকিল? সেই স্বার্থমূলক নীতিতত্ত্বই আসিয়া পড়িল। হিতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া স্বার্থমূলক নীতিতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বাস্তবিক হিতবাদকে বিনাশ করা হয়। হিতোপদেশের গল্পের বিড়ালরূপী মুষিকের পুনর্ব্বার মুষিকত্ব প্রাপ্তির ন্যায় হিতবাদ স্বার্থবাদে পরিণত হয়। জগতের অধিকাংশের মঙ্গলে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল, এই কথা বলিয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন উপদেশ দিলে, সকল সময়ে,সকল অবস্থায়, সকল ব্যক্তি কি সন্তুষ্ট হইতে পারে? যদি কেহ দেখে যে, যাহাতে অধিকাংশের মঙ্গল তাহাতে তাহার নিজের সর্ব্বনাশ; হয় ত তাহার ও তাহার প্রিয় পরিজনের চির দরিদ্রতা। হয় ত তাহাকে সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। বিশেষ বিশেষ জাতীয় সংকট কালে কি এরূপ ঘটে না? যাহাতে অধিকাংশের মঙ্গল, তাহাতে আপনার সর্ব্বনাশ, এরূপ হইলে সে ব্যক্তি তাহা করিতে বাধ্য কেন? স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ, ধর্ম্মবুদ্ধি, নৈতিক বাধ্যতাবোধ স্বীকার না করিলে, এই সমস্যার মীমাংসা হয় না। নৈতিক বাধ্যতাবোধ স্বীকার না করিলে, কোন কার্য্যকেই নৈতিক কার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য বলা সঙ্গত হয় না।*

বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি যখন মৌলিকভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে,তখন সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে,ইহা কোথা হইতে আসিল? পরমেশ্বর স্বয়ং ইহাকে মানব হৃদয়ে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,ইহা ভিন্ন আর অন্য উত্তর নাই।

এখন দেখ, যে ঈশ্বর তোমাকে নিঃস্বার্থ হিতৈষণা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাকেই দয়া শূন্য বলিতেছ! তাঁহার নিকট হইতে দয়া পাইয়া তাঁহাকেই নির্দ্দয় বলিতেছ! তিনি দয়া না দিলে জগতের দুঃখ দেখিয়া কি তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করিতে পারিতে? যাঁহার নিকট জ্ঞান পাইলে তাঁহাকেই মূর্খ বল? যে তুলাদণ্ডদ্বারা পরিমাণ করিতেছ, কে উহা তোমার হস্তে তুলিয়া দিল? যে নীতির আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জগৎ কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়াছ,উহা তোমার হৃদয়ে কে অঙ্কিত করিয়া দিল?

পরমেশ্বরের দয়ার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, আমাদের জীবন রক্ষার জন্য যাহা কিছু একান্ত প্রয়োজনীয়, তিনি তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দ জীবকে দান

* হিতবাদ দর্শনের বিস্তৃত সমালোচনা এস্থলে অসম্ভব, যতদূর সম্ভব তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল পাঠ করিবেন। ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ পাঠক প্রথমভাগ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার ৯১—১০৭ পৃঃ দেখিবেন।

করিতেছেন। জীবন রক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাহা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শুদ্ধ জীবকে সুখী করিবার জন্য কত শত প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কে তাহার গণনা করিবে! সুমন্দ, সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল; সুন্দর কোমল কুসুম রাজি; প্রাণমনমুগ্ধকরী শারদ পৌর্ণমাসী; হৃদয়রঞ্জন মৃতসঞ্জীবনী সঙ্গীত, এই সকল স্বর্গীয় সুখের ভাণ্ডার, নিরুপম আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যে কত সুখের উৎস, কে তাহার পরিমাণ করিবে! কত সুদৃশ্য, কত সুশ্রাব্য, কত সুগন্ধ, কত সুস্বাদ সুখাদ্যে সংসার পূর্ণ! জীবের রসনার তৃপ্তির জন্য তিনি যে কত প্রকার ফল মূলে সংসার কানন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সীমা কোথায়!

জগতে কেবল দুঃখ নিবৃত্তির উপায় রহিয়াছে, এমন নহে। তিনি অগণ্য উপায়ে জীবের দেহ মনে সুখরাশি ঢালিয়া দিতেছেন। এমন কত সুখের বিধান করিয়াছেন, যাহা না থাকিলে আমাদের জীবন রক্ষার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। কেবলমাত্র জীবকে সুখী করিবার জন্য জলস্থল শূন্যে শত সহস্র প্রকার সুখভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। সুমধুর আত্মীয়তা, বন্ধুতা ও বিবিধ আকারে মাধুর্য্য রসের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি উদাসীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ করিলেন? তত্ত্বজিজ্ঞাসু আত্মার সম্মুখে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন কেন? উদাসীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ করিলেন?

সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, দুঃখ নিয়মের ব্যভিচার,—নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, কিন্তু সুখ নিয়ম। এই যে আমাদের মস্তক, উত্তমাঙ্গ, ইহার সৃষ্টি কি বেদনা ভোগ করিবার জন্য? শিরঃপীড়ার জন্যই কি শিরোদেশ সৃষ্টি হইয়াছে? চক্ষুরোগ ভোগ করিবার জন্যই কি চক্ষুর সৃষ্টি? কর্কশ শব্দ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হইবার জন্যই কি কর্ণের সৃষ্টি? বিস্বাদদ্রব্য গ্রহণ করিয়া অসুখী হইবার জন্যই কি রসনার সৃষ্টি? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতে গিয়া জীব সময়ে সময়ে নানা কারণে ক্লেশ পায় সত্য, কিন্তু ক্লেশ দিবার জন্যই কি সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে ইন্দ্রিয় নিচয়ে ভূষিত করিয়াছেন? আমাদিগের সুখের জন্যই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, উহার একটীর অভাব হইলে যে দুঃখের অবধি থাকে না, ইহা কে না জানে? শোভা, সুস্বর, সুরস, সুগন্ধ ও সুস্পর্শ্য পদার্থে জগৎ পরিপূর্ণ! তিনি আমাদের প্রতি উদাসীন বা নিষ্ঠুর বলিয়াই কি এইরূপ করিলেন্?

জগতে অনেক দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, দুঃখ চিরদিন কখন সমান থাকে না। প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। যে দরিদ্রতা অদ্য অসহ্য বোধ হইতেছে, ক্রমে তাহাই সহজ হইয়া আসে। যে পুত্রশোক এত ভয়ঙ্কর, এত তীব্র যে, মনে হয় জীবন রক্ষা পাইবে না, তাহাও সময়ে নির্ব্বাণ প্রায় বা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। কোন দুঃখ কখন সমভাবে স্থায়ী হয় না। পরমেশ্বর যদি উদাসীন বা নিষ্ঠুর হইবেন, তবে এমন ব্যবস্থা করিলেন কেন?

যদি বাস্তবিক দুঃখ অত্যন্ত অধিক হয়, যদি যথার্থই উহা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে, তখন তাহার জন্য মঙ্গলময় কি বিধান করিয়াছেন? তিনি তখন সকল দুঃখের অবসান করিয়া দেন। তাঁহার কৃপাহস্ত প্রসারণ করিয়া মৃত্যুরূপ মঙ্গলময়দ্বার দিয়া তাঁহার অদৃশ্য নিকেতনে তাঁহার সন্তানকে লইয়া যান। যে জীব অসহ্য রোগযন্ত্রণায়

অস্থির হইয়াছে, যে অগ্নিরাশির মধ্যে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতেছে, অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ; যে জলমগ্ন হইয়া শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অবর্ণনীয় যাতনা ভোগ করিতেছে, সে যদি চিরদিনই ঐরূপ যাতনা ভোগ করিত, তাহার যন্ত্রণার যদি পরিণাম না থাকিত, তাহা হইলে সে যে কি ভয়ঙ্কর হইত, তাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় !

মঙ্গলময়ের রাজ্যে এমন কেন হইবে ? জীব যখন দুঃখে অবসন্ন হয়, যখন তাহার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়,যখন তাহার বাসগৃহস্বরূপ দেহ ভগ্ন হইয়া যায়, তখন জগতের পিতামাতা বলেন ;—"এস, সন্তান ! আর তোমাকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তোমার যন্ত্রণাময় দেহ হইতে আমি তোমাকে নিষ্কাসিত করিয়া লইতেছি। আমার অনন্ত ভবনে অনেক ঘর আছে। তোমার বাসস্থান পরিবর্তিত হইল, তুমি এই পারলৌকিক গৃহে আসিয়া বাস কর।" মৃত্যু জীবের পরম বন্ধু। মৃত্যু তাহার সকল দুঃখের অবসান করিয়া দেয় ! দুঃখী রুগ্ন ও বিপন্ন জীবের পক্ষে মৃত্যুর বিধান শতকণ্ঠে পরমেশ্বরের কৃপা কীর্ত্তন করিতেছে।

জগতে দুঃখ দেখিয়া যাঁহারা পরমেশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে সংশয় প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকেএকটী কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি যে, দুঃখ দেওয়াই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত,তাহা হইলে দুঃখকে জয় করিয়া তাহার উপর উঠিবার শক্তি আমাদিগকে তিনি কেন দিলেন ? যথার্থই মনুষ্যের মধ্যে এমন এক স্বর্গীয় শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। উপযুক্ত উপায়ে তাহার বিকাশসাধন করিলে মনুষ্য পার্থিব সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া অচ্যুত পদ লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি জগতের শত শত মহাত্মা পার্থিব সুখ দুঃখকে পদাঘাত করিয়া তাহার অতীত চিরশান্তিময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উহাই আমাদের লক্ষ্য,উহাই আমাদের চরম ও পরমগতি। পার্থিব ঝঞ্ঝাঝটিকার অতীত এই শান্তি নিকেতনের কথা ভগবদ্গীতা কীর্ত্তন করিতেছেন। পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত হওয়াই সিদ্ধাবস্থা। প্রত্যেক সাধকের গতি সেই দিকে। ইহাই গীতার প্রধান শিক্ষা। সুখ বা দুঃখ কোন দিকে দৃষ্টি রাখিও না। জীবনের কর্ত্তব্য সংসাধন কর, নির্ব্বাণ পদলাভ করিবে ; ভারতের শিরোভূষণ, জগতের গৌরব বুদ্ধদেবের ইহাই উপদেশ।

এই সত্যটী আপনার শিষ্যদিগের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য তিনি কেমন গল্পচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন ;—এক ব্রাহ্মণ আপনার গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন ; তিনি দেখিলেন যে দূরে কে আসিতেছে। নিকটে আসিলে দেখিলেন, এক সালঙ্কারা পরমাসুন্দরী রমণী। ব্রাহ্মণ সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,বৎস ! তুমি কে ? রমণী বলিলেন, আমি যে হই, আমি তোমার গৃহে বাস করিব। ব্রাহ্মণ আনন্দে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সুন্দরী নারী তাঁহার পরিবারের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে তাঁহার গৃহ আনন্দময়, উৎসবভবন হইল। দুই এক দিন পরে ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন, আবার দেখেন কে আসিতেছে। ভাবিলেন, আবার কে আসে। নিকটে আসিলে দেখিলেন, রাক্ষসীর ন্যায় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, রাক্ষসীর ন্যায় বিকট সুদীর্ঘ দন্তশ্রেণী, রাক্ষসীর ন্যায় সকল শরীরে রুধিরধারা বহিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভয়বিহ্বল হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? উপস্থিতা নারী উত্তর করিল, আমি যে হই, আমি তোমার বাটীতে বাস করিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহা কখনই হইবে না; আমি তোমাকে আমার গৃহে স্থান দিতে পারিব না। নারী বলিলেন, দিতেই হইবে, তুমি যখন আমার ভগিনীকে স্থান দিয়াছ, তখন আমাকেও দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়িলেন। অন্তঃপুর হইতে সেই সুন্দরী নারীকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! একি তোমার ভগিনী? ও আমার গৃহে থাকিতে চায়। আমি উহাকে কখনই আমার গৃহে স্থান দিতে পারিব না।" সুন্দরী নারী বলিলেন, "ব্রাহ্মণ! যখন আপনি আমাকে আপনার গৃহে স্থান দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহাকেও স্থান দিতে হইবে; ও আমার ভগিনী। আমি যেখানে যাই, ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। ও ইহ সংসারে ক্রমাগত চিরদিন আমার অনুসরণ করিতেছে। যে আমাকে গৃহে স্থান দিবে, সে যেন নিশ্চয় জানে যে ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। উহাকে তাড়াইবার কোন উপায় নাই।" তখন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, বৎস! বল দেখি তুমি কে এবং ঐ বা কে। সুন্দরী নারী বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমার নাম সুখ এবং উহার নাম দুঃখ। যে সুখকে সমাদরে গৃহে স্থান দিবে, তাহার নিশ্চয় জানা উচিত যে, দুঃখ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে।"

সাধক বলেন, সুখ চাই না, দুঃখও চাই না; পার্থিব সুখ দুঃখের তরঙ্গ যাহা স্পর্শ করিতে পারে না, সেই শান্তিনিকেতন, সেই অচ্যুত পদ চাই। সুখ দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সাধক সেই দিকে দৌড়িতেছেন। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, রোগ সুস্থতা, হর্ষ বিষাদ, হাস্য ক্রন্দন, আশা নৈরাশ্য, এই সকলের অতীত স্থানে উপনীত হইবার জন্য তিনি ধাবমান্। জগতের ভক্ত সাধকগণ বৈরাগ্য ও ভক্তিপথে যিনি যে পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে সাংসারিক সুখ দুঃখকে পরাস্ত করিয়াছেন। পরমেশ্বর এমন শক্তি আমাদিগকে কেন দিলেন? যিনি নিষ্ঠুর, যিনি উদাসীন, তিনি কেন আমাদিগকে এমন ক্ষমতা দিলেন, যাহার উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা আমরা সুখ দুঃখের অতীত হইয়া চির শান্তিলাভ করিতে পারি?

বাস্তবিক তিনি আমাদের সুখও চান না, দুঃখও চান না। মনুষ্যকে বহু সুখে সুখী করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার মঙ্গল বিধানে, সুখ বা দুঃখ ইহার মধ্যে কিছুই জীবনের লক্ষ্য নহে। তিনি আমাদের জন্য সুখও চান না—দুঃখও চান না, ধর্ম্ম চান।

> "Not enjoyment and not sorrow
> Is our destined end or way
> But to act that each to-morrow
> May find us further than to-day."

এ সংসার যুদ্ধক্ষেত্র। তিনি এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া সবল হই, পরম পুরুষার্থ লাভ করি। আমরা প্রত্যেকে সংসার কুরুক্ষেত্রে পরমেশ্বরের প্রেরিত সৈনিক পুরুষ। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, ক্রমাগত যুদ্ধ কর। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, পাপ প্রলোভনকে পরাস্ত করিয়া ভগবানের জয়পতাকা হস্তে তাহার উপর দণ্ডায়মান হও। ইহাতেই মানবাত্মার চরম ও পরম গৌরব। পরমেশ্বর স্পার্টান মাতার ন্যায় দেখিতে চান্ যে, তাঁহার সন্তানগণ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া

শোণিত প্রবাহের মধ্যে শত্রু বিজয় সম্পন্ন করে। আমরা ভীরু কাপুরুষ হইয়া আত্মসুখে বিমুগ্ধ থাকি, পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আলস্যে দিনপাত করি, ইহা তিনি চান না। যুদ্ধজয়ী ক্ষত বিক্ষত সন্তানকে পুরস্কারস্বরূপ পরমার্থ ধন দিবেন বলিয়া জগন্মাতা প্রতীক্ষা করিতেছেন। বীরের ন্যায় যুদ্ধ কর, কাপুরুষ হইয়া আপনার চিরগৌরবে বঞ্চিত হইও না; এই স্বর্গীয় বাণী প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে উত্থিত হইতেছে।

In ths world's broad field of battle
In the bivouac of life ;
Be not a dumb driven cattle,
Be a hero in the strife.

সাংসারিক সুখ দুঃখের ঝঞ্ঝা ঝটিকার মধ্যে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা ও কল্যাণ। আমরা সবল হই, পবিত্র হই, প্রকৃত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করি, ইহাই জগদ্‌গুরু জগদীশ্বরের অভিপ্রায়। জীবের জন্য তিনি ধর্ম্ম চান। তাহাতেই তাহার অনন্ত শান্তি। কঠোর সাধন পরায়ণ সাধুর হৃদয়ে যখন তিনি মঙ্গলময়রূপে প্রকাশিত হন, তখন সাধক তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিরতৃপ্তিলাভ করেন। যে জন্য জন্ম, জীবন ও মৃত্যু তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

সংশয়বাদী পরমেশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন, তাহার অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্ত-সৃষ্টিলীলা সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপার আমরা বুঝিতে না পারিলেও এই পরিষ্কার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বিশ্বকারণ মঙ্গলাভিপ্রায়েই সকল কার্য্য করিতেছেন,—সুখ দুঃখ, জীবন মৃত্যু, পাপ পুণ্যের মধ্য দিয়া জগৎকে অসীম কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। বিজ্ঞান, দর্শন ও সহজ জ্ঞান আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে এই সত্য শিক্ষা দিতেছেন। কুতর্কজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সদ্বিচার, এই স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতেছে।

কিন্তু তর্কের অতীত উচ্চতর স্থান আছে, সাধন ভজনের পথ দিয়া সে স্থানে উপনীত হইলে আনন্দময়, শান্তি-নিকেতন, করুণাসাগর, প্রেমময় পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হন। তিনি ভক্ত-হৃদয়ে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' রূপে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' রূপে প্রকাশিত হন। তর্কতরঙ্গের অতীত, পার্থিব হর্ষ বিষাদ, পাপ পুণ্যের অতীত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তজন চির শান্তি সম্ভোগ করেন। সেই আমাদের গম্য স্থান। প্রত্যেক সন্তানকে সেই গম্য স্থানে, সেই শান্তি-নিকেতনে লইয়া গিয়া তিনি কৃতার্থ করিবেন। তাঁহার দয়ার, তাঁহার প্রেমের সীমা কোথায়?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পুরাণ-তত্ত্ব।

ভূমিকা।

প্রাচীন আখ্যায়িকা সকলের নাম ইতিহাস। তাহা সৃষ্টি-ক্রিয়াদি-বিবরণ-সমন্বিত হইলে পুরাণ নাম প্রাপ্ত হয়। "ইতিহাসং পুরাতনং" বলিয়া প্রাচীন রাজা ও ঋষিরা যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেন, তাহা উত্তর কালে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী লক্ষণযুক্ত হইয়া এবং লোক পরম্পরায় ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া একএকটী পুরাণ শাস্ত্র নামে পরিগণিত হইয়াছে।

পুরাণ শাস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। কারণ তাহা ভারতবাসীর ভাল লাগে। কেবল

ভারতে কেন, সকল দেশেই তদ্দেশীয় পুরাণের সমাদর হইয়া থাকে।

য়িহুদীদিগের পুরাণ-কথার পর যীশু খ্রীষ্ট কতকগুলি নীতি উপদেশ দিয়া লোককে ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাও উত্তর কালে পুরাণ বার্ত্তার মত প্রচলিত হইল, এবং তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যদিগের ক্রিয়া তদ্রূপ পুরাণ প্রসঙ্গেরই বৃদ্ধি করিয়া দিল। মুসলমানদিগের পক্ষে কোরাণ ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ এবং সর্ব্বোপরি মাননীয়। কিন্তু ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তদিগের ইতিহাস বৃত্তান্ত তাহাদের অতিশয় ভাল লাগে। বুদ্ধদেব কতকগুলি উপদেশ ভিন্ন আর কিছু দিয়া যান নাই; কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকেরা লোকাতীত বহু বুদ্ধ কল্পনা করিয়া এবং অপরাপর দেবতার সহিত মিলাইয়া বিস্তর পুরাণ-কাহিনী রচনা করিলেন।

আমাদের ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস বেদের কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত উহার চারি অবস্থা বিবেচিত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত হইতেছে।

বেদের প্রথম সময়েই পুরাণ ব্যক্ত হয়। ঋগ্বেদান্তর্গত স্ত্রীগণ প্রণীত ঋক্ মন্ত্র ও একটু একটু ইতিহাস কথা তাহার নিদর্শন। ঋক্ মন্ত্র হইতে ইন্দ্র,বরুণ,বসিষ্ঠ,বিশ্বামিত্র অদিতি ও লোপামুদ্রা প্রভৃতির প্রসঙ্গ লইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৌরাণিকী নানা কাহিনী রচিত হইয়াছে।

উত্তর কালে যখন বেদ-মন্ত্র অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, তখন এমন কতকগুলি কথা বা কাহিনী পরস্পর আলাপের মধ্যে আইসে, যাহা বেদ মন্ত্রের মধ্যে গ্রহণ করা যায় না। তাহাই পুরাণ নামে পৃথক্কৃত হয়। উহার প্রাথমিক অবস্থা জানিবার উপায় নাই। পুরাণের এই অজ্ঞাত অবস্থাকে উহার আদিম অবস্থা ধরা যায়।

যখন অথর্ব্ব বেদের প্রকাশ হইয়াছে এবং উহা "ত্রয়ী" বেদের সহিত সংযুক্ত হইয়া বেদের চারি সংখ্যা পূরণ করিয়াছে, সেই চতুর্ব্বেদের সহিত পুরাণ ও ইতিহাসের নাম অন্বিত দেখা যায়।

ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস
ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ
সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি।

শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৬।১০।৬

বেদ-ব্যাখ্যাতারা বলেন, দেবাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির নাম ইতিহাস; সৃষ্টি বিবরণের নাম পুরাণ। উপরের উদ্ধৃত বাক্যে আরো বিদ্যা, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এই কয়েকটী নাম পাওয়া যায়। সেগুলি ইতিহাস ও পুরাণের ন্যায় প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় নাই। শতপথব্রাহ্মণের স্থানান্তরে (১৪।৫।৪।১০) উক্ত শাস্ত্রগুলির নামে ব্যক্ত হইয়াছে—

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ—ইত্যাদি—অস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি। *

এই পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, সূত্র, ব্যাখ্যান—এ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহাতে উৎপত্তি বিষয়েও ইতিহাস ও পুরাণকে বেদের সমান বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং। ছান্দোগ্য, ৭প্র।

ভগবন্ আমি ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ, আথর্ব্বণ নামক চতুর্থ বেদ এবং পঞ্চম বেদ-স্বরূপ ইতিহাসপুরাণ জ্ঞাত আছি।

ইহাতে জানা যায় যে, যখন চতুর্থ বেদ

* বৃহদারণ্যকেও এই কথা—২।৪।১০

স্বীকার করা হয়, তখন ইতিহাস-পুরাণকেও পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য করা হয়। এতদ্বারা বোধ হয় যে, এই ইতিহাস-পুরাণকেও এ সময়ে বেদের ন্যায় পদ্ধতি মতে শিখিতে হইত।

শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, সাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন সূত্রে "পুরাণ বেদ" নামে পুরাণ-বিশেষের উল্লেখ আছে। তাহা যজ্ঞের দিবস পাঠ করিতে হইত। শতপথ, ১৩।৪।৩।১৩

মনুসংহিতায় ব্যবস্থা আছে—

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥
৩ অধ্যায় ২৩২ শ্লোক।

শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে পিতৃগণকে বেদ,ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল শাস্ত্র শ্রবণ করাইবে।

ইহাতে ইতিহাস ও পুরাণের তুল্য আখ্যান ও খিল নামক শাস্ত্রের নাম পাওয়া যায়। সকলই বহুবচনান্ত পদ।* তাহাতে বোধ হয়, তখন স্মৃত্যাদির † ন্যায় ইতিহাস, পুরাণ, আখ্যান ও খিল প্রত্যেকে সংখ্যায় অনেক ছিল। অতএব মনুসংহিতার সময়ে পুরাণ ও ইতিহাসের অনেক খানি বিস্তার হইয়াছিল বলিতে হইবে।

পুরাণের এই দ্বিতীয় অবস্থা।

উপরোক্ত প্রকারে পুরাণ ও ইতিহাসের সংখ্যা পৃথক্‌রূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল। মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস ও পুরাণের এইরূপ পৃথক্ ভাব থাকে। এইজন্য রামায়ণ ও মহাভারত পুরাণ নাম প্রাপ্ত না হইয়া ইতিহাস নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে পুরাণ লক্ষণ কিছু কিছু আছে। রামায়ণ কেবল ইতিহাস-লক্ষণান্বিত। অতঃপর ইতিহাস ও পুরাণ একীকৃত হইয়া যায়। বেদব্যাস এক পুরাণ সংহিতা রচনা করেন। তাহাতে তৎকাল-প্রচলিত আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি, সকলেরই একত্র সমাবেশ হয়।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।১৬

পুরাণার্থ বিষয়ে পণ্ডিত (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প শুদ্ধি * লইয়া পুরাণ সংহিতা রচনা করিলেন।

ব্যাসের শিষ্য পরম্পরায় এই সংহিতা-নুযায়ী বহু পুরাণ রচিত হইয়াছিল। ব্যাস মূল সংহিতা রচনা করিয়া, লোমহর্ষণকে এবং তিনি তাহা সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ, মিত্রায়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি, এই ছয় শিষ্যকে প্রদান করেন। তদনুসারে কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন এক এক খানি পুরাণ রচনা করেন। ইহাদিগকে "সংহিতা কর্ত্তা" বলা হইয়াছে। ব্যাসের প্রথম শিষ্য লোমহর্ষণ লোমহর্ষণিকা নামে আর একখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন। বোধ হয়, এই সকল সংহিতা অন্যান্য পুরাণের মূল। অতএব ইহাদিগকে মূল পুরাণ বা পুরাণ সংহিতা রূপে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সময়কার না মূল, না শাখা, কোন পুরাণই এক্ষণে বিদ্যমান নাই।

* তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২।৯) "ইতিহাসান পুরাণানি" এই বহু বচনান্ত পদ আছে।

† স্মৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলা হয়। শ্রৌত,গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্র হইতে স্মৃতি শাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

* দৃষ্টি পূর্ব্বক যে বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার নাম আখ্যান; পরম্পরা শ্রুত কথার নাম উপাখ্যান; পিতৃবিষয়ক ও পৃথ্বী বিষয়ক গীত এবং তাদৃশ অন্যান্য গীতের নাম গাথা; শ্রাদ্ধ কল্পাদি নির্ণয়ের নাম কল্প শুদ্ধি।

উপরোক্ত সংহিতাকারেরা সূত জাতীয়। সূতেরা প্রথমে রাজাদিগের যুদ্ধে সারথ্যাদি কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা প্রাচীন রাজ বংশের এবং মহৎ ঘটনা সকলের সুশ্রাব্য অপূর্ব্ব কাহিনী অভ্যাস করিয়া রাখিতেন। রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র পুরাণবিৎ সারথি সুমন্ত্রের নিকট ঐরূপ পুরাণ কথা শ্রবণ করিতেন, এমন নিদর্শন আছে। পরে ব্যাসের কৃপায় তাঁহার প্রিয় সূতশিষ্যেরা প্রসিদ্ধ পুরাণবক্তা হইয়া উঠেন। পুরাণ কথন সূতদিগের এক প্রকার জাতীয় ব্যবসায় হইয়াছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া এবং কোথাও বা সমাদরে আহূত হইয়া পুরাণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সূতদিগের দ্বারা অসংখ্য পুরাণ কাহিনী বহুকাল হইতে একত্রে সমাহৃত হইয়া শেষে মহাভারতরূপে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতের বক্তা উগ্রশ্রবা। তিনি ব্যাসের রচিত ভারত শ্রবণ করিয়া তাহা নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষির সমীপে ব্যক্ত করেন।

এই সময়কার প্রচলিত পুরাণের যে পঞ্চ লক্ষণ ছিল, অমরসিংহ তাঁহার প্রসিদ্ধ কোষ-গ্রন্থে পুরাণের সেই পঞ্চ লক্ষণ ধরিয়া গিয়াছেন। টীকা সম্মত সেই পঞ্চলক্ষণ এই—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥

মহাভূত সৃষ্টি, সমগ্র চরাচরের সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর বর্ণন, প্রধান প্রধান বংশ-ক্রমাগত ব্যক্তিদিগের চরিত্র কথন,— পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ।

এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সকল আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কি প্রকারে এতগুলি পরমোপাদেয় সর্ব্বজন-মান্য শাস্ত্রের বিলোপ হইল, তাহা বলা দুষ্কর। অনুমান হয়, তত্তাবৎ পুরাণের সার ভাগ সুবৃহৎ মহাভারত মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে লোকের ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের প্রতি দৃষ্টি রহিল না। সুতরাং শ্রোতৃ বিরহে সে সকল শাস্ত্র লয়প্রাপ্ত হইল।

ইহাই পুরাণের তৃতীয় অবস্থা।

চতুর্থ অবস্থায় পুরাণ সকল ঈশ্বরারাধনাত্মক অলৌকিক বিষয়ের বর্ণনায় বিভূষিত হইতে লাগিল। তখনকার প্রধান অবলম্বনীয় শাস্ত্র মহাভারত। শাস্ত্র কর্ত্তারা মহাভারতের মধ্যেই নানা অলৌকিক দেবতত্ত্ব সন্নিবেশিত করিলেন। কিছু দিন ধরিয়া এই প্রকার উপাদানে তাহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

অধুনাতন কালের পুরাণ কর্ত্তারা দেখিলেন, রাজগণের বংশানুকীর্ত্তন, ঋষিদিগের চরিত্র বর্ণন, সাধু চরিত্র, মহৎ লোকদিগের গুণ ও ক্রিয়া বিবরণ, এ সমস্তই এক মহাভারত রূপ মহাভাণ্ডারে রহিয়াছে। তদতিরিক্ত, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিবদুর্গাদি দেবতাগণেরও প্রসঙ্গ তাহাতে আছে। তাঁহারা সেই প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি কথা-প্রসঙ্গে এবং বিশেষ পক্ষে পরমার্থ সাধনের উপযোগী দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় তাঁহাদের গ্রন্থকে পরিপূরিত করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পুরাণের পঞ্চ লক্ষণকে উপপুরাণের অর্থাৎ নিকৃষ্ট পুরাণের লক্ষণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন এবং আপনাদের রচিত পুরাণকে মহাপুরাণ আখ্যা প্রদান করিলেন। মহাপুরাণের এই দশ লক্ষণ অবধারিত হইল :—

সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেষাঞ্চ পালনং।
কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণং।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ব্র বৈ-পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ১৩২ অধ্যায়।

১ মূল সৃষ্টি, ২ বিশেষ সৃষ্টি, ৩-৪ জগতের স্থিতি ও পালন, ৫ কর্ম্মের বাসনা, ৬ মনুদিগের আগমনের ক্রম, ৭ প্রলয়, ৮ মোক্ষ,

৯ হরির এবং ১০ দেবতাদের পৃথক পৃথক গুণ কীর্ত্তন, এই সকলের [illegible] থাকা মহাপুরাণের লক্ষণ।

যে সকল মহাপুরাণ এই মহাপুরাণ-শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত না হইল, তাহারা উপপুরাণ নামে খ্যাত হইল।

এইরূপে দেখা যায় যে, বেদোক্ত পুরাণ শাস্ত্র ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও বহু অংশে পরিবর্ত্তিত হ[illegible] বর্ত্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, ব্রতনিয়মাদির উপদেশ-দান ও তদ্দ্বারা মনুষ্যের পরমার্থ সাধন এক্ষণকার পুরাণের অভিলক্ষিত। এই সকল পুরাণের প্রভাবে পূর্ব্বতন পঞ্চ-লক্ষণ-যুক্ত পুরাণের সহিত তাহার সূত জাতীয় কথকেরাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেই প্রাচীন পুরাণের ন্যায় বর্ত্তমান পুরাণ সকলও সূতদিগের উক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে বটে; কিন্তু এই সকল পুরাণের মতে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হয়, এবং তাহার উপযোগী যে অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপরের কার্য্য নহে। সুতরাং সূতগণ পুরাণ-বক্তার অধিকারচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তাহাদের আর কোন সংবাদই রহিল না।

ইহাই পুরাণের চতুর্থ অবস্থা।

এই চারি অবস্থায় পুরাণ শাস্ত্র কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতে কোন্ দিকে চলিয়া আইল, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। এক প্রকার আদি কাল হইতে এই পুরাণ শাস্ত্র কত পরিবর্ত্তন সহিয়া, কত বিপ্লব অতিক্রম করিয়া, চির দিন কিরূপে মনুষ্যের হৃদগত হইয়া রহিল, তাহা অবশ্যই অতি বিচিত্র কথা, সন্দেহ কি? চিরজীবী পুরাণ শাস্ত্র আপনি সুরক্ষিত হইয়া অন্য সকল শাস্ত্রেরই রক্ষা ও পোষণ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। অতএব ইহার মহাপ্রাণ বিবেচিত হয়।

অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে যে প্রকারে এই পুরাণ প্রবাহ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আইল, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে, সুরসরিৎ গঙ্গার মর্ত্ত্যভূমিতে আগমনের পৌরাণিকী কথা মনে পড়ে।

হিমাচলবক্ষে যে জল প্রবাহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, তাহাই গোমুখী দ্বারে বিধৃত হইয়া গঙ্গারূপে প্রকাশ পাইল। ক্রমশঃ তাহা নিম্নদেশে আসিয়া অগণ্য ধারায়, অগণ্য লোকের উপকার সাধন করিতে লাগিল। সেই রূপ দেখা যায়, যে সঙ্কীর্ণ কথা প্রবাহ বেদ মধ্যে নিহিত হইয়া "পুরাণ বেদ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পুরাণ ও ইতিহাস নাম গ্রহণ পূর্ব্বক মহাভারতে পরিণত হইল। কবিত্বসমন্বিত বর্ত্তমান পুরাণ কারেরা সেই 'ইতিহাসং পুরাতনং' বা কথা প্রবাহকে দেব প্রভাব সমন্বিত করিয়া নানা প্রণালীতে নানা দেশের মধ্য দিয়া নানা লোকের হিতসাধন করিয়া অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে আনিয়া ফেলিলেন।

পুরাণকারদিগের বিচিত্র কথার অনেক মাধুরী এবং তাহা মহার্থপূর্ণ। এই কথাসরিৎ যখন অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল, তখন উহাকে হিমাচল-বক্ষস্থিতা জলধারা বা স্বর্গের মন্দাকিনী, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, বল। ইহা বেদের মধ্যে বহুকাল বিধৃত হইয়াছিল; সেই বেদ ব্রহ্মার কমণ্ডলু স্বরূপ বিবেচিত হউক। পুরাণের তৃতীয় অবস্থায় তাহা মহাভারতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সেই মহাভারতকে মহাদেবের জটা বলিয়া বিবেচনা করিতে পার। মহাভারতের মধ্য হইতে উক্ত কথাসরিৎ যখন বর্ত্তমান পুরাণের রূপ প্রাপ্ত হইল, তখন মনুষ্যের সাক্ষাৎ উপকার সাধক হইয়া চলিল। এক্ষণকার লক্ষ লক্ষ

লোকের সেবিতা কল্লোলিনী সুরসরিৎ বর্ত্তমান পুরাণ-সরিতেরই নিদর্শন বা উদাহরণ মাত্র।

শেষে কাপিল সমাগম। ভাগীরথীর সাগর সঙ্গম ঘটিত কাহিনীর মধ্যে পুরাণকারদিগের যে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকৃতিজনক।

গঙ্গা-প্রবাহের শেষে সাগরসঙ্গম। এই স্থানে কপিল ঋষি বসিয়া আছেন। চিরজীবী কপিলের হস্তে চিরজীবী সাংখ্যশাস্ত্র বিরাজ করিতেছে। সংসারাসক্ত ঐশ্বর্য্যমদমত্ত লোকেরা সাংখ্যহস্ত কপিলের অমর্য্যাদা করিয়া নিপাত যায়। আত্মত্যাগী তপোনিষ্ঠ সাধু পুরুষ আপনার সদ্গতি লাভ করেন এবং স্বীয় বংশের উদ্ধার করেন। গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থের এই মাহাত্ম্য। গঙ্গা স্রোত যেমন কপিলাশ্রমকে বিধৌত করিয়া ভারত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে, সেই রূপ পুরাণপ্রবাহ সাংখ্য শাস্ত্রকে বিধৌত ও উজ্জ্বল করিয়া অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছে।

"প্রকৃতি পুরুষের বিচার কর, বন্ধন ও মুক্তির জ্ঞান লাভ কর; তাপত্রয় নিবারণের চেষ্টা কর; তত্ত্ব জ্ঞান হইলেই পরমপুরুষার্থ লাভ হইবে।" এই উপদেশ দিয়া, জনগণের ভব যন্ত্রণা অতিক্রম করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া কপিল ঋষি জ্ঞানপয়োনিধির অনন্ততা নিরীক্ষণ করিতেছেন। পুরাণকারেরাও তাঁহাদের অনুযাত্রীদিগকে সেই জ্ঞান-সাগরাভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। পুরাণগত উপাখ্যান ভাগ ভুলিয়া লোক জ্ঞানতত্ত্বে মনোনিবেশ করিবে, পুরাণকারদিগের এই চরম উদ্দেশ্য। এজন্য পুরাণে জ্ঞান-তত্ত্ব মধ্যে মধ্যে উদিত করা হয়। এই হেতু, সগরবংশের নিধন বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া পবিত্রাত্ম কপিল ঋষির মহোন্নত জ্ঞান প্রদর্শনার্থ শ্রীমদ্ভাগবত কার বলেন, যিনি মুক্তিপ্রার্থীদিগের ভবসমুদ্র উত্তরণ জন্য সাংখ্যনৌকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি কেন ক্রোধের বশীভূত হইবেন?

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌ
র্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ং।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্ মতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৮।১২

ফলতঃ, সত্ত্বরজস্তমোময়ী সংসার মৃত্তিকার উপর দিয়া দুই দিকে কর্ম্মের বাঁধ রাখিয়া যে পুরাণ সরিৎ চলিয়া আইল, জ্ঞানসাগরে তাহার শেষ। এই সঙ্গমস্থলে অবগাহন করিলে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হয়। যদি তোমার সংসারাসক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে, তুমি নিঃশ্রেয়স লাভার্থ পুরোভাগে জ্ঞানসাগরে ভাসমান হও। যদি তোমার ভোগাভিলাষ এখনো প্রশমিত না হইয়া থাকে, তবে কর্ম্মতটের মধ্য দিয়া সত্ত্বরজস্তম গুণাদি অবলম্বন করিয়া উচ্চাবচ গতিতে বিচরণ করিতে থাক। যখন সংসারের তাপত্রয়ে উৎপীড়িত বোধ করিবে, যখন নিত্যানিত্য বিবেক জন্মিবে, তখন এই সঙ্গম স্থলে পুনরায় আসিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত জ্ঞান মহোদধিকে আশ্রয় করিবে।

মনু অত্রি বিষ্ণু যম উশনা হারীত।
আপস্তম্ব যাজ্ঞবল্ক্য সম্বর্ত্ত লিখিত॥
পরাশর ব্যাস শংখ দক্ষ কাত্যায়ন।
আর যাঁরা করিলেন শাস্ত্র প্রণয়ন॥
অঙ্গিরা গৌতম শাতাতপ ঋষিগণে।
করি নতি বৃহস্পতি বশিষ্ঠ চরণে॥

শাস্ত্রের নাম ও পরিচয়।

কালক্রমে যে সকল শাস্ত্র সমুদিত হইয়া ভারত সমাজকে রক্ষা করিতেছে, তাহাদের পার্শ্বে দিয়া পুরাণ প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। পুরাণ প্রসঙ্গে সে সকল প্রাচীন শাস্ত্রেরও

উল্লেখ করিতে হইবে। অতএব তত্তাবৎ শাস্ত্রের নাম ও পরিচয় ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্র অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান শাস্ত্রের ও তাহার প্রধান প্রধান শাখার নাম, শ্রেণী ও মর্য্যাদার বিবরণ করা যাইতেছে।

শাস্ত্র সমুদায় পঞ্চ শ্রেণীভুক্ত। (১) বেদ, বেদাঙ্গ ও উপবেদ, (২) দর্শন, (৩) স্মৃতি, (৪) ইতিহাস ও পুরাণ, (৫) তন্ত্র।

বেদ।

বেদের সংখ্যা চারি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদের চারি অবান্তর ভাগ আছে; (১) সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ, (৩) উপনিষৎ, (৪) সূত্র। ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কয়েকটী পরিচ্ছেদকে আরণ্যক বলে। বেদের কোন কোন ভাগকে শাখা বলা হয়। সূত্রের দুই ভাগ; গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র। * যজুর্ব্বেদ প্রথমে কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক ভাগ সংহিতাদি-চারি-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছে। বেদের শিক্ষা-সহযোগী কয়েকখানি শাস্ত্র আছে। তাহাদিগকে বেদাঙ্গ বলে।

এই সকল ভাগ ও বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় তৎসমুদায় প্রদর্শন করা যাইতেছে।

ঋগ্বেদ।

১। সংহিতা।
২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় আরণ্যক।
৩। উপনিষৎ—(১)ঐতরেয়।(২)কৌষীতকী।
৪। গৃহ্যসূত্র,—(১)সাঙ্খ্যায়ন। (২)আশ্বলায়ন।
শ্রৌতসূত্র (১) সাঙ্খ্যায়ন। (২) আশ্বলায়ন।

যজুর্ব্বেদ।

কৃষ্ণ যজুঃ।

১। সংহিতা। তৈত্তিরীয়।
২। ব্রাহ্মণ—তৈত্তিরীয়।
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
শাখা—(১) মৈত্রায়ণী; (২) কঠ।
৩। গৃহ্যসূত্র—(১) বৌধায়ন (২) আপস্তম্ব।
শ্রৌতসূত্র। (১) বৌধায়ন (২) আপস্তম্ব।
৪। উপনিষৎ—(১) তৈত্তিরীয়, (২) মৈত্রী বা মৈত্রায়ণী (৩) কঠ (৪) শ্বেতাশ্বতর।

শুক্ল যজুঃ।

১। সংহিতা—বাজসনেয় সংহিতা।
২। ব্রাহ্মণ—শতপথ ব্রাহ্মণ।
শাখা—(১) মাধ্যন্দিনী। (২) কাণ্ব।
৩। উপনিষৎ—বৃহদারণ্যক।
৪। গৃহ্যসূত্র—কাত্যায়ন সূত্র। শ্রৌতসূত্র।

সাম বেদ।

১। সংহিতা—আর্চ্চিক।
২। ব্রাহ্মণ—(১) ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ। (২) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। (৩) তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
শাখা—(১) তলবকার। (২) কৌথুমী। (৩) রাণায়নী।
৩। উপনিষৎ (১)তলবকার (কেন) উপনিষৎ। (২) ছান্দোগ্য উপনিষৎ।
৪। গৃহ্যসূত্র গোভিল।
শ্রৌতসূত্র—(১) লাট্যায়ন। (২) গোভিল।

অথর্ব্ব বেদ।

১। সংহিতা।
২। ব্রাহ্মণ—গোপথ ব্রাহ্মণ।
৩। উপনিষৎ—(১)মুণ্ডক,(২)মাণ্ডুক্য,(৩)প্রশ্ন।
৪। সূত্র—কৌশিক সূত্র।

উপনিষদের সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে দশখানি প্রধান। সেই দশখানি উপনিষদের নামে একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে।

* সাময়াচারিক সূত্র নামে আর এক ভাগ আছে, তাহা স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র আকারে পরিণত হইয়াছে।

ঈশা কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ড মাণ্ডুক্য তিত্তিরিঃ।
ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যমেতরেয় স্তথা দশ ॥

বেদাঙ্গ।

বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয়। 'ষড়ঙ্গ বেদ' যথা, পাণিনি কৃত (১) শিক্ষা, (২) ব্যাকরণ. (৩) যাস্ককৃত নিরুক্ত, (৪) পিঙ্গলকৃত ছন্দঃ, (৫) গর্গাদি অষ্টাদশ মুনি কৃত জ্যোতিষ, (৬) কল্পশাস্ত্র।

সাময়াচারিক সূত্র সকলকে সাধারণতঃ কল্প শাস্ত্র বলে। সেই কল্পশাস্ত্রকে বেদাঙ্গ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। এইরূপ আর কতকগুলি শাস্ত্র আছে, তাহা বেদের তুল্য এবং উপবেদ বলিয়া গণ্য হয়।

উপবেদ।

১। ধন্বন্তরি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ।
২। বিশ্বামিত্র প্রণীত ধনুর্ব্বেদ।
৩। ভরত প্রণীত গান্ধর্ব্ববেদ।
৪। নানা মুনি প্রণীত অর্থশাস্ত্র।

দর্শন।

১। কপিল কৃত কাপিল বা সাঙ্খ্যদর্শন।
২। পতঞ্জলি কৃত পাতঞ্জল দর্শন বা যোগশাস্ত্র।
৩। গৌতম কৃত ন্যায় দর্শন।
৪। কণাদ কৃত বৈশেষিক দর্শন।
৫। জৈমিনি কৃত পূর্ব্বমীমাংসা দশন।
৬। ব্যাস কৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদশন।

এই ষড়্ দর্শন প্রাচীন। তদ্ভিন্ন রামানুজ ও পাশুপত দর্শনাদি আর কয়েকখানি দর্শন অধুনাতন কালে রচিত হইয়াছে।

স্মৃতি।

স্মৃতির বিশেষ নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। অনেক ঋষি স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই ২০ কুড়ি জন ঋষির প্রণীত স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রধান।

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥

১ মনু, ২ অত্রি, ৩ বিষ্ণু, ৪ হারীত, ৫ যাজ্ঞবল্ক্য, ৬ উশনা, ৭ অঙ্গিরা, ৮ যম, ৯ আপস্তম্ব, ১০ সম্বর্ত্ত, ১১ কাত্যায়ন, ১২ বৃহস্পতি, ১৩ পরাশর, ১৪ ব্যাস, ১৫ শঙ্খ, ১৬ লিখিত, ১৭ দক্ষ, ১৮ গৌতম, ১৯ শাতাতপ, ২০ বশিষ্ঠ।

এতদ্ভিন্ন নারদ স্মৃতি প্রভৃতি আর কয়েকখানি স্মৃতি আছে।

ইতিহাস।

রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস মধ্যে প্রধান। অন্যান্য ইতিহাস প্রচলিত পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

পুরাণ।

পুরাণ সকল দুই শ্রেণীভুক্ত; মহাপুরাণ, উপপুরাণ। প্রত্যেকের সংখ্যা অষ্টাদশ বলিয়া প্রথিত আছে।

মহাপুরাণ।

মহাপুরাণ সকলের নাম শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যক্ত আছে :—১২স্কন্ধ ৭অঃ

ব্রাহ্ম্যং পাদ্ম্যং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ং।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতং।
ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনং।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্ম্মঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্ ॥

১ ব্রহ্ম, ২ পদ্ম, ৩ বিষ্ণু, ৪ শিব, ৫ লিঙ্গ, ৬ গরুড়, ৭ নারদীয়, ৮ ভাগবত, ৯ অগ্নি, ১০ স্কন্দ, ১১ ভবিষ্য, ১২ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ১৩ মার্কণ্ডেয়, ১৪ বামন, ১৫ বরাহ, ১৬ মৎস্য, ১৭ কূর্ম্ম, ১৮ ব্রহ্মাণ্ড।

এই পুরাণগুলির নাম স্মরণে রাখিবার নিমিত্ত একটী কবিতা রচিত হইয়াছে;

তাহাতে ঐপুরাণগুলির আদ্য অক্ষর কৌশলে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শিবপুরাণের অন্য নাম বায়ু পুরাণ।

ম দ্বয়ং ভ দ্বয়ঞ্চৈব ব্র ত্রয়ং ব চতুষ্টয়ং।
অ না কূ স্ক প লিঙ্গানি পুরাণানি বিদুর্ব্বুধাঃ॥

ম দ্বয়ং—(১) মৎস্য (২) মার্কণ্ডেয়;
ভ দ্বয়ং—(৩) ভবিষ্য (৪) ভাগবত;
ব্র ত্রয়ং—(৫) ব্রহ্ম, (৬) ব্রহ্মাণ্ড,
(৭) ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত;
ব চতুষ্টয়ং—(৮) বরাহ, (৯) বামন, (১০) বায়ু,
(১১) বিষ্ণু;
অ—(১২) অগ্নি; না—(১৩) নারদ; কূ—(১৪) কূৰ্ম্ম; স্ক—(১৫) স্কন্দ; প—(১৬) পদ্ম; লিং—(১৭) লিঙ্গ; গ—(১৮) গরুড়।

উপপুরাণ।

১ আদিত্য,	১০ পারাশর,
২ ঔশনস,	১১ ভার্গব,
৩ কল্কি,	১২ মাহেশ্বর,
৪ কাপিল,	১৩ বারুণ,
৫ কালিকা,	১৪ বাশিষ্ঠ,
৬ দুর্ব্বাসস,	১৫ শাম্ব,
৭ নন্দী,	১৬ শিব,
৮ নারদীয় বা বৃহন্নারদীয়,	১৭ সনৎকুমার,
৯ নৃসিংহ	১৮ সৌর।

ইহা ভিন্ন আদি, মানব, মুদ্গল, ভবিষ্যোত্তর, ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি উপপুরাণের নাম দেখা যায়। কালিকা পুরাণে অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে মারীচ, ব্রহ্মাণ্ড, বামন ও কার্ত্তিকেয় কথিত পুরাণ ধরা হইয়াছে।

এই সকল পুরাণ ও উপপুরাণের রচনার পূর্ব্বে কতকগুলি পুরাণ সংহিতা রচিত হইয়াছিল। (১)স্বয়ং ব্যাসের কৃত পুরাণ সংহিতা (২) লোমহর্ষণিকা (৩—৫) কশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন কৃত তিনখানি পুরাণ সংহিতা। এই সংহিতা গুলির উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণ সংহিতার আদর্শে অপরাপর পুরাণ রচিত হইয়াছিল। সে পুরাণ সকলের নাম বা কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

তন্ত্র।

তন্ত্রের সংখ্যাও বিস্তর। তন্মধ্যে মহানির্ব্বাণ, কুলার্ণব, জ্ঞানসঙ্কলিনী, কুলকুণ্ডলিনী, রুদ্রযামল, বৃহন্নীল, বারাহী, গৌতমীয়, মাতৃকাভেদ, কামধেনু, বিশ্বসার, কামাখ্যা, মন্ত্রকোষ ইত্যাদি প্রধান।

প্রধান প্রধান শাস্ত্র গুলির নাম ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। আবশ্যক মতে বিশেষ পরিচয় পরিব্যক্ত হইবে।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

কাৰ্ত্তিক পূজা।

১

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
তুমি সে উমার ছেলে, ময়ূরে চড়িয়া এলে,
পার্ব্বতীন্দ্রে বেড়ায় যেই পাহাড়ে পার্ব্বতী?
তোমারি মা গিরিকন্যা, জগতে রমণী ধন্যা,
দশভুজে দশ অস্ত্র ধরে ভগবতী?
চরণে অসুর দলে, যে রমণী মহাবলে,
সে মহিষমর্দ্দিনীর তুমি কি সন্ততি?
কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?

২

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
প্রলয় বিষাণধারী, তুমি কি সংহারকারী
ত্রিপুরারি ত্রিশূলী সে শিবের সন্ততি?

যোগীন্দ্র তোমারি পিতা, যোগাসন করে চিতা,
গলে পরে হাড়মাল ভূষণ বিভূতি?
সর্পের বলয় হাতে, রুদ্রাক্ষ শোভিত সাথে,
সদ্যছিন্ন বাঘছাল পরিধান ধুতি!
ললাট নয়নানলে, কীট সম কাম জ্বলে,
একত্র শোভিছে তাহে শশী দিনপতি!
মস্তকে বিশাল জটা, গঙ্গার তরঙ্গ ঘটা,—
আতঙ্কে মাতঙ্গ ভাসে মহাবেগবতী!
অমৃত ঠেলিয়া পায়, গরল সমুদ্র খায়,
তোমারি কি মৃত্যুঞ্জয় পিতা পশুপতি?
কার্ত্তিক! তুমি কি সেই শিবের সন্ততি?

৩

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
তুমি কি সে মহাশূর, বধিয়া তারকাসুর,
উদ্ধারিলা দেবতার সে অমরাবতী?
তুমিই কি ভুজবলে, পুনরায় দেবদলে,
দানব দাসত্ব হ'তে করিলে মুকতি?
তোমারি কি সুরপুরে, জয় বৈজয়ন্তী উড়ে
সুবর্ণ সুমেরু চূড়ে ওহে সুররথি?
তুমি কি সে ষড়ানন সুরসেনাপতি?

৪

তুমি কি কুমার সেই দেবসেনাপতি?
তোমারে পূজিলে মেলে, তব সম বীর ছেলে,
সে নাশে তোমারি মত দেশের দুর্গতি?
সে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, জননীর দাসীগিরি
তাহারো কি পদভরে কাঁপে বসুমতী?
তারো কি হিমাদ্রি লঙ্কা, বাজে সে বিজয় ডঙ্কা,
তাহারো চরণে বিন্ধ্য করে কি প্রণতি?
হায় সে ছেলের লাগি, সারারাত জাগি জাগি,
করে কি তোমার পূজা যত কুলবতী?
কার্ত্তিক! তুমি কি সেই মহাসুররথী?

৫

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবসেনাপতি?
কোথা তবে বর্ম্মচর্ম্ম, এই কি বীরের কর্ম্ম?
চাদরে আদর—কৃপা কেরেপের প্রতি!
কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গয়াংগচ্ছ,
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি ত্রিকচ্ছে বসতি!
কোথা সে পিঠের তূণ, কোথা সে ধনুক গুণ,
কার্ম্মুক বহিতে হাতে নাহি কি শকতি?
বিজয় কিরীট খ'লে, এলবার্ট্ এলে তু'লে,
পায়ে মের্ণ্‌ফিল্ড যুতা ফুলবাবু অতি!
কার্ত্তিক! তুমি সেই সুরসেনাপতি?

৬

কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেবযোদ্ধাপতি?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হ'লনা লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি?
বাঙ্গালার জলবায়ু, বিনাশে আরোগ্য, আয়ু,
দেবতারো এমনি কি ঘটায় দুর্গতি?
সত্য এ মাটীর দোষে, হৃদয়ের বল শোষে?
শোণিতে থাকেনা তেজ মোটে একরতি?
এ মৃদু মলয় বায়, উদ্যম উড়িয়া যায়,
অবশ শিথিল হয় ধমনীর গতি?
সত্যই পিকের ডাকে, হাতে না ধনুক থাকে,
কুহুরবে পক্ষাঘাত করে কি বসতি?
প্রস্তর অস্থির করে মোমে পরিণতি?

৭

কার্ত্তিক! তুমিই যদি সুরসেনাপতি,
এ বেশে তোমারে পূজি, কি ফল আমি না বুঝি,
জন্মে শুধু কত গুলি জড় পাপমতি!
পরিচ্ছদ ফুলকোচা, ব্যবসা পেনের খোচা,
পদাঘাতে পীলা ফাটা, এই শেষ গতি!
যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্বভিক্ষা,
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি!
সকলি কবন্ধাকার, মুখ আর পেট সার,
বায়ুভরা বেলুনের কথারি উন্নতি!
সকলি রুচির পুচ্ছ, জ্বালাইতে করে উচ্চ,
কাব্যের কনক-লঙ্কা মহারূপবতী!
সকলি সমাজ শোধে, কুরুচির গোড়া খোদে,
নাশিতে অশোক বনে বসন্ত-ব্রততী!

এ হেন বেবুন-বংশ, এক দিনে হ'লে ধ্বংস,
জগতের লাভ বই নাহি কোন ক্ষতি!
দুর্ভিক্ষ—আকাল যায়, 'হাহাকার' 'হায় হায়',
কুটীরে কৃষক করে আনন্দে বসতি!
আলসে শূয়র পালে, কাজ নাই কোন কালে,
বৃথা আরো অপবিত্র করে বসুমতী!
একটী সিংহের ছানা, অরণ্যে বসায় থানা,
রচে শৈল-সিংহাসন সাজে পশুপতি!
বাবুভরা বাঙ্গলার কি হবে হে গতি?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য যোগ।

"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপং অর্জ্জুনে ব্রহ্মবিদ্যায়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত-প্রজ্ঞস্য লক্ষণং॥
শোকপঙ্কং নিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥"

সঞ্জয়—

এইরূপ কৃপাবিষ্ট আকুল-নয়ন
অশ্রুপূর্ণ বিষাদিত অর্জ্জুনে তখন,
কহিলেন এইকথা শ্রীমধুসূদন: —১

শ্রীভগবান—

অর্জ্জুন! কি হেতু এই বিষম সময়ে,
কীর্ত্তিলোপী স্বর্গলোপী অনার্য্য সেবিত,
হেন মলিনতা (চিত্তে) উপজিল তব? ২

হয়োনা কাতর আর; এ নীচতা কভু
সাজে কি তোমারে পার্থ? উঠ পরন্তপ,
করি' দূর এই ক্ষুদ্র হৃদি দুর্ব্বলতা। ৩

অর্জ্জুন—

কেমনে মধুসূদন, হানিব সমরে
শর আমি, পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণ প্রতি? ৪

না বধি মহাত্মা গুরুগণে
শ্রেয়ঃ হেথা ভিক্ষান্ন ভোজন;—
গুরু বধি ভুঞ্জিব হেথায়
রুধিরাক্ত অর্থ-কাম-ভোগ। ৫

টীকা।

(২) শ্রীভগবান—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"
এইরূপ 'ভগ' যাঁহার আছে তিনি ভগবান। অথবা
উৎপত্তি প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যাং অবিদ্যাঞ্চ সবাচ্য ভগবানিতি॥

বিষম সময়ে—যুদ্ধ সময়ে, সঙ্কটে (স্বামী, বলদেব)।
সভয় স্থানে (গিরি, মধু)।

মলিনতা—(মূলে আছে কশ্মল) মোহ (স্বামী),
শিষ্টগর্হিত যুদ্ধ পরাঙ্মুখতা (মধু, গিরি)।

কীর্ত্তিলোপী, স্বর্গলোপী—এই কথা এই অধ্যায়ের
৩১ হইতে ৩৭ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

অনার্য্যসেবিত—সাংখ্য ও কর্ম্মজ্ঞানীর অননুযুক্ত।
হৃদিশুদ্ধি জন্য যে স্বধর্ম্ম আচরণ করে, যে মোক্ষা-
ভিলাষী— সেই আর্য্য। (বলদেব)।

কাতরতা, নীচতা (মূলে আছে ক্লৈব্য) ক্লীবতা
বা অধৈর্য্য (গিরি, মধু) ভীরুতা (বলদেব)

(৫) ভিক্ষান্ন—এস্থলে অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম যুদ্ধ পরিত্যাগ
করিয়া ভিক্ষারূপ পরধর্ম্ম বা যতিধর্ম্ম গ্রহণের
অভিলাষ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ টীকাকার
গণ এই অর্থ করেন। কিন্তু যখন ইতিপূর্ব্বে

যদি জিনি—কিম্বা হই জিত,
কিবা শ্রেয় না বুঝি ইহার;
বধি যেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে
নাহি থাকে বাঁচিতে বাসনা,—
অই তারা রয়েছে সম্মুখে ॥৬
কৃপণতা দোষে অভিভূত
স্বভাব আমার, ধর্ম্মে আমি
মূঢ়মতি- জিজ্ঞাসি তোমায়
শ্রেয় যাহা কহ সুনিশ্চয়;
শিখাও আমায়—শিষ্য আমি
তব দেব! লইনু শরণ ॥৭

কিন্তু জে'ন ধরার ভিতর
নিষ্কণ্টক রাজ্য যদি পাই,
কিম্বা হই অমরার পতি,
তবু আমি না পারি বুঝিতে
কেমনে এ শোক হবে দূর—
যাহে করে ইন্দ্রিয় শোধন। ৮
সঞ্জয়—
হৃষীকেশে কহি ইহা, পার্থ পরন্তপ
মৌনে রহে, গোবিন্দেরে যুঝিবনা বলি। ৯
উভয় সেনার মাঝে তবে হে রাজন!
বিষাদিত অর্জ্জুনেরে মৃদু হাসি মুখে
কহিলেন এই কথা দেব হৃষীকেশ। ১০
শ্রীভগবান—
অশোচ্য যে তার তরে করিতেছ শোক;
কহিছ বিজ্ঞের কথা, কিন্তু পণ্ডিতেরা
মৃত কি জীবিত তরে নাহি করে শোক ॥১১

বনবাসী হৃতসর্ব্বস্ব পাণ্ডবদের ভিক্ষাই একরূপ উপজীবিকা ছিল—তখন এস্থলে সহজ অর্থ করিলেও চলে।

(৬) কিবা শ্রেয়—(মূলানুযায়ী অর্থ—কিবা গুরুতর) যুদ্ধ করা বা ভিক্ষা করা, ইহার মধ্যে আমার কি শ্রেয় (মধু ও গিরি), সাধারণতঃ কি কর্ত্তব্য (স্বামী)।

(৭) কৃপণতা দোষ দীনতা বা বিপন্ন ভাবাপন্ন, মহাব্যসনগ্রস্ত।। 'মহদ্ব্যসনং প্রাপ্তো দীন কৃপণ মুচ্যতে (বাচস্পত্যং), যে আপনার অল্প স্বল্প ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না সেই কৃপণ (গিরি), ইহাদের হত্যা করিয়া কিরূপে বাঁচিব, আত্মজ্ঞানাভাবে এই মমতা লক্ষণই দোষ (মধু)। কৃপণতা এবং দোষ অর্থাৎ ইহাদের হত্যা করিয়া কেমন করিয়া বাঁচিব, এই কৃপণতা এবং কুলক্ষয় জন্য দোষ দর্শন। (স্বামী), শাস্ত্রে আছে, 'যোহবা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা স্মল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

ধর্ম্ম—অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য যুদ্ধ না ভিক্ষা, ইহার কোনটা অর্জ্জুনের ধর্ম্ম সঙ্গত (স্বামী), ধর্ম্ম—যে ধারণ করে, অর্থাৎ পরমাত্মা—তৎবিষয়ে বিবেকহীন (গিরি), হিংসা প্রধান ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও অহিংসা রূপ যতিধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে কি শ্রেয়, তাহা অর্জ্জুন বুঝিতে পারেন নাই।

(৮) অমরার পতি—ইন্দ্রত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব (গিরি), হিরণ্যগর্ভত্ব পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্য। (মধু)

(১০) মৃদুহাসি মুখে—ভ্রান্ত অর্জ্জুনের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ও ব্যঙ্গ চ্ছলে হাসিয়া (মধু ও বলদেব), প্রসন্নমুখে (গিরি)। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত।

(১১) বিজ্ঞের কথা—নিজে বড় বিজ্ঞ এইরূপ অভিমান করিয়া কথা। রামানুজ অর্থ করেন, দেহাত্মস্বভাব মুগ্ধ প্রজ্ঞা বিক্ষিপ্ত বাক্য। মূলে আছে 'প্রজ্ঞা বাদা'। মধুসূদন বলেন, "প্রজ্ঞা অবাদা" বা জ্ঞানীর অযোগ্য বাক্য।

শোক—স্থূল অথবা সূক্ষ্ম দেহ বিনাশ জন্য শোক। (বলদেব)। ইহা কিছু দূরার্থ।

(১১)—গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই ১১শ্লোক হইতেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ব আরম্ভ হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই ধর্ম্মতত্ব বুঝাইতেছেন। কেন, কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, এমন সময় আত্মীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে দেখিয়া অর্জ্জুন

শোকাভিভূত হইলেন। বলিলেন যুদ্ধ করিব না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে লওয়াইতেছেন। অনেকে সেই জন্য গীতোক্ত শাস্ত্রে বিশেষ আস্থাবান্ নহেন। যাঁহারা মহাভারতের কথা জানেন, তাঁহাদের বলিতে হইবে না যে, যুদ্ধ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছু হইল না, শেষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। হয় পাণ্ডবদের যুদ্ধ করিয়া অন্যায় রূপে হৃত নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে হয়, নতুবা চিরকাল অরণ্যচারী হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আবার যুদ্ধ করিয়া কৌরবের পাপ প্রবৃত্তির দমন না করিলে তাহাদের পাপাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং যুদ্ধ করিয়া জীবহত্যা করা ক্লেশকর হইলেও পাণ্ডবদের পক্ষে এ যুদ্ধ নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছিল। এই জন্য এ যুদ্ধ যে ধর্ম্মকার্য্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাই অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। মহাভারতে যতগুলি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম বাদে অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং অর্জ্জুনকে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বুঝাইবার জন্য সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বেরই অবতারণা করিতে হইয়াছিল।

অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিব না বলিবার কারণ তিনটী। প্রথমতঃ যুদ্ধ করিলে স্বজনগণকে ও অন্য লোককে হত্যা করিতে হইবে—লোককে হত্যা করা বা কষ্ট দেওয়া অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ তাহাতে অর্জ্জুনের নিজের চিরজীবন মনের ক্লেশ থাকিবে ও কৃতপাপের জন্য পরকালে নরক ভোগ হইবে। তৃতীয়তঃ যুদ্ধে লোক হত্যা করিলে সমাজের ও কুলের ক্ষতি হইবে। এই তিনটী কথারই উত্তর দিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাহাকে হত্যা করিলে তাহার নিজের কোন ক্ষতি নাই। ইহা বুঝিতে হইলেই আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীবাত্মার অমরতা ও জন্মান্তরবাদ বুঝিতে হয় এবং শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে হয়। এই (স্থূল) শরীরটা অসৎ ও আত্মা (বা জীবাত্মা) সৎ, জরাজীর্ণ শরীরটা ধ্বংস হইলে অন্য নূতন শরীর লাভ করায়, আত্মার কোন ক্ষতি নাই। শরীর নাশ হইবার সম্ভাবনায় আপততঃ কষ্ট মনে হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, উহা আত্মাকে রঞ্জিত করিতে পারে না, ইহা বুঝিতে হয়। ইহা বুঝাইতেই এই অধ্যায়ের ১২ হইতে ৩০ শ্লোকের অবতারণা।

দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন নিজের পাপাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন, জীবহিংসাজনিত ক্লেশ বা "অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর মোহের" অভিভূত হইয়াছেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতে হইয়াছে যে ধর্ম্মযুদ্ধে পাপ নাই, অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ (৩১ হইতে ৩৭ শ্লোক) ধর্ম্মযুদ্ধে পাপ ও নরকের পরিবর্ত্তে স্বর্গ লাভই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত। এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মী বা রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত, সুখ দুঃখ লাভালাভ গণনায় ব্যস্ত অর্জ্জুন যুদ্ধ জয় করিলে রাজ্য ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া সুখী হইবেন, আজীবন দুঃখিত থাকিবেন না।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছিলেন যে, এ লাভালাভ পাপ পুণ্য গণনা করিয়া কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হয়। বুদ্ধি কর্ম্মযোগে সমাহিত করিয়া, আসক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, নির্দ্বন্দ্ব হইয়া, কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিতে হয়। (এই সব কথা ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোকে বুঝান আছে)। তাহার পর বুদ্ধি এইরূপে সমাহিত হইলে কি অবস্থা হয়, এবং তাহার কিরূপ কর্ম্ম তাহা ৫৫ হইতে ৭২ শ্লোকে বুঝাইয়া দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে।

অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিব না বলিবার যে তৃতীয় কারণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার কোন উত্তর দেওয়া নাই। সমস্ত গীতার মধ্যে তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর নাই। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার কতকটা উত্তর আছে। লোক রক্ষার ভার ভগবানের, মানুষ কেবল লোকহিতার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে, কর্ম্মের গোলযোগ দেখিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে সংশয় যুক্ত করিবে না। সে কথা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। ভীরু ও দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি যুক্ত লোক 'যুদ্ধ' নামে ভয় পায়। ধর্ম্মযুদ্ধ যে সম্ভব তাহা বুঝে না। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধ যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, অন্ততঃ আমাদের তাহা বুঝা বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। জগতের Struggle for existence এবং "Survival of the fittest" নিয়ম অপরিহার্য্য। বিবর্ত্তন নিয়মানুসারে জীবের উন্নতির জন্য fittest হইতে হইলে আমাদের ধর্ম্ম বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও অধর্ম্ম বৃত্তির দমন করিতে হয়। জ্ঞান প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বা ধর্ম্মগুলির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি করিতে হয়। যাহাতে লোকের এই ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তির পথে বাধা দেয়

আমি কিম্বা তুমি আর এ নৃপ মণ্ডলী
না ছিলাম—কভু নহে তাহা; কিম্বা সবে
অতঃপর না রহিব—তা নহে কখন। ১২

তাহার বিনাশ করিতে হয়। সেই জন্য যদ্ধও যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে নাই। সেই যুদ্ধ রূপ ঘৃণ্যকার্য্য করিতে গিয়াও কিরূপে মানুষে শ্রেষ্ঠতম ধার্ম্মিক হইতে পারে, গীতায় তাহা দেখান হইয়াছে। কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে যে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারা যায়, গীতা ব্যতীত আর কোথায়ও তাহা বুঝান নাই।

আর একটী কথার উল্লেখ এস্থলে প্রয়োজন। 'গীতা ও 'চণ্ডীর আরম্ভ একই প্রকারের। দুর্য্যোধন প্রভৃতি যাহারা পাণ্ডবদের নিতান্ত আততায়ী, তাহাদের জন্যও অর্জ্জুনের মমতা হইতেছে, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আত্মধর্ম্ম ও প্রকৃতি ধর্ম্ম বুঝাইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ দূর করিলেন। ইহাই গীতার আরম্ভ ও সমাপ্তি। সুরথ রাজার অনুচরগণ ফাঁকি দিয়া তাহার রাজ্য লইল, সুরথকে বনবাসী করিল, সমাধি নামক বৈশ্যের সংগৃহীত অর্থ তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মসাৎ করিল, সমাধিকে বনে তাড়াইয়া দিল, তবু উহাদের সেই অনুচর ও স্ত্রী পুত্র জন্য মমতা রহিয়া গেল। যে প্রকৃতির গুণ বা শক্তি বা মায়া হইতে এই মমতা প্রভৃতি আসক্তি জন্মে, তাহার তত্ত্ব বুঝাইয়াই মার্কণ্ডেয় ঋষি সুরথ ও সমাধিকে মোহ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই মমত্ব বা অহঙ্কারই ধর্ম্মের অন্তরায় এবং এই দুইখানি অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থই সেই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম গীতার ও চণ্ডীর উপক্রমণিকায় অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

এখনও একটী কথা বুঝিতে হইবে। দুর্য্যোধনাদির ন্যায় আততায়ীদের উপর ক্রোধ হওয়াই সাধারণ লোকের স্বভাব। অর্জ্জুন চিত্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তি দমন করিয়া দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মের বীজভূত সাত্ত্বিক মোহে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মন যে বশীভূত 'তিনি যে দৈবীসম্পদযুক্ত" তাহার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ধারণা করিবার অধিকারী ছিলেন। অনেক টীকাকারগণ যে তাঁহাকে নিম্নাধিকারী বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে।

(১২) আমি কিম্বা তুমি—এস্থলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত। রামানুজ দ্বৈতবাদী। তিনি অর্থ করেন, "আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা যেরূপ নিত্য, সেইরূপ তুমি প্রভৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের আত্মা নিত্য।" এস্থলে তাঁহার মতে পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় প্রভেদ করা হইয়াছে। রামানুজ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া বলেন যে, অজ্ঞানকৃত ভেদ দর্শনমূলক ব্যবহারিক ভাবে উপাধি হেতু জীবাত্মার ও পরমাত্মার প্রভেদ করা হয় নাই, স্বয়ং ভগবান যখন অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যের উপদেষ্টা, তখন তিনি এরূপ ব্যবহারিক ও মিথ্যা ভেদ করিতে পারেন না। আরও এই দ্বৈতমত শ্রুতিসঙ্গত। শঙ্কর ও গিরি ইহার উত্তরে বলেন যে, অর্জ্জুন তখন যেরূপ মোহযুক্ত হইয়াছিল তখন অদ্বৈত জ্ঞান তাহার ধারণা হইবে না বলিয়া এরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আরও এস্থলে বেদান্তমতে আত্মাকে ব্যষ্টিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরমাত্মার যেমন উৎপত্তি বিনাশ নাই, সেইরূপ সৃষ্টি অবস্থায় সেই আত্মার যে সকল অংশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ভিন্ন ভাবে জীবাত্মা রূপে বিচরণ করে, তাহারও কখন জন্মমৃত্যু নাই। এইরূপ সৃষ্টি অবস্থায় জীবাত্মার নিত্যত্ব প্রভৃতি এই শ্লোকে ও পরের কয়টী শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

আর এক কথা। এস্থলে সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ সূচিত হইয়াছে। গীতাতে পরে এই বহু পুরুষবাদের সহিত বেদান্ত ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। ইহাতে পরে দেখান হইয়াছে যে অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত (১) পরব্রহ্মের এক অংশ কলা বা পাদ চরাচর কারণ কূটস্থ অব্যক্ত অক্ষর পরম অব্যয় (২) ব্রহ্মরূপে ব্যাপ্ত হইয়া সৃষ্টিতে পুরুষোত্তম বীজপ্রদ পিতা (৩) ঈশ্বররূপে প্রকাশিত।

তাঁহার দুই রূপ প্রকৃতি এক দৈবী, পরা বা জীব প্রকৃতি, যাহা হইতে ভূত বা ভোক্তা পুরুষ, ক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ বীজরূপে উদ্ভূত। আর এক অপরা বা ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি, যাহা হইতে জগৎযোনি মহান্ বা চৈতন্য পরিণাম পর্য্যন্ত ক্ষেত্র উদ্ভূত হইয়া বিকৃত হইয়া জড় জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সনাতন জীবভূত অংশ (গীতা ১৫।৭) জগৎ ধারণ করে (৭।৫) আবার মহালয় কালে ঈশ্বরে লীন হয়। (৮। ৯) অথচ এই পুরুষ

কৌমার যৌবন জরা এ দেহে যেমন—
সেইরূপ দেহীগণ দেহান্তর পায়,
তাহে কভু ধীরগণ নহে মুগ্ধ মন। ১৩

প্রকৃতি রূপ ঈশ্বরের ভাব অনাদি (১৩।১৯) তবে ইহা কেবল সৃষ্টিকালেই নিত্য ও প্রকট অবস্থায় থাকে। (৯।৮)। এই তত্ত্ব বুঝিলে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে জীবাত্মার স্বরূপ বা সাংখ্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে গোলযোগ হইবে না। এবং গীতার দ্বৈতা দ্বৈতবাদ ও বহুপুরুষবাদ প্রভৃতির কিরূপ সামঞ্জস্য হই য়াছে বুঝা হইবে।

(১৩) দেহান্তর প্রাপ্তি—সাংখ্য মতে শরীর দুই প্রকার—সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল বা মাতা-পিতৃজ শরীর। মৃত্যুতে কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীর ধ্বংস হয়। জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর সহিত এ জীবনের ও পূর্ব্ব জীবনের সংস্কার গুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। বেদান্ত মতে কারণশরীর ও লিঙ্গশরীর আত্মাকে বদ্ধ করে। কারণশরীর দেবতার, আর লিঙ্গশরীর মনু ষ্যের। এই শরীর পাঁচটী কোষ বা আবরণময়—যথা অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ। মৃত্যুতে কেবল অন্নময় কোষ ধ্বংস হয়। মোক্ষ লাভেই সকল কোষ গুলিই ধ্বংস হয়, পুরুষ এই শরীর হইতে ভিন্ন। (সাংখ্যদর্শন ১।১২৯)

দেহী—(১৮ শ্লোকে আছে শরীরী) লিঙ্গশরীর ধারী জীবাত্মা (মধু), মধুসূদন আবার অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া ইহার অর্থ করেন, —এক ব্রহ্মেরই ভোগ জন্য অধ্যাস হেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীর ধারী পরমাত্মা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—"অন্নময়াদানন্দ-ময়ান্তং পঞ্চকোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানম্ কথিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।" ব্যষ্টি পুরুষের ন্যায় সমষ্টি আত্মার বা অব্যয় পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা, (১) পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক স্থূল সমষ্টিই অন্নময় কোষ ইহাই বিরাট মূর্ত্তি। (২) উহার কারণ স্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও তাহার কার্য্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ। (৩) তাহার নাম মাত্রাত্মক সমষ্টি জ্ঞান শক্তি মনোময় কোষ। এবং (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ। এই প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান কোষ বা সূক্ষ্ম সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভাখ্য লিঙ্গশরীর। আর (৫) উহার কারণাত্মক মায়াউপহিত চৈতন্য সর্ব্বসংস্কার শেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। (মধু)

বলদেব বলেন—দেহী অর্থাৎ দেহ স্বভাব জীব কর্ম্ম বিপাকে স্বরূপজ্ঞ জীব।

শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ দেয় ধনঞ্জয়
ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে; অনিত্য এ সব,—
জন্মে'—হয় লয়, তাহে হ'ও না অধীর। ১৪
হে পার্থ যে জন ইথে নহে বিচলিত,
সেই ধীর,—সুখ দুঃখ সম-জ্ঞান যার,
অমরতা লভিবার যোগ্য সেই জন ॥১৫
অসতের (স্থায়ী) ভাব, অথবা সতের

(১৪) ইন্দ্রিয়ে-বিষয়-বোধে—মূলে আছে মাত্রা স্পর্শ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের অনুভব। স্বামী বলেন, মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তাহার সহিত বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ বা সম্বন্ধই আমাদের সুখ দুঃখানুভূতির কারণ। শঙ্কর বলেন, যাহার দ্বারা শব্দাদি বাহ্য বিষয় সকল পরিমাণ বা মনন করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়গণই মাত্রা। এবং শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযোগই স্পর্শ, কিম্বা যে বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় তাহাই স্পর্শ। এই মাত্রা এবং স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় (অথবা সংযোগ) এই উভয় আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। ইহার মধ্যে প্রথম অর্থই অধিক সঙ্গত। রামানুজ বলেন, আশ্রয় হেতু ও কার্য্য হেতু ইন্দ্রিয় গণকে মাত্রা বলে। টীকাকার রাঘবেন্দ্র বলেন মাত্রা অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়।

অনিত্য—যাহার উৎপত্তি ধ্বংস আছে, তাহাই অনিত্য। (ভাষ্য)

(১৫) দুঃখে বিচলিত—পাতঞ্জল দর্শনে আছে "ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।" আত্মার সহিত সুখ দুঃখাদির কারণ ভূত প্রকৃতির সংযোগ উচ্ছেদ করিতে পারিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

(পাতঞ্জল দর্শন ৬৭)।

(১৬) অসতের ভাব—অসৎ, অর্থাৎ পরিণামী দেহাদি; সৎ, অর্থাৎ অপরিণামী আত্মা। (বলদেব)। অসৎ, অর্থাৎ অবিনাশ স্বভাব-আত্মা অসৎ অর্থাৎ

(অস্তিত্বে) অভাব নাহি হয় কভু; হেরে—
স্বরূপ এ উভয়ের তত্ত্বদর্শীগণ। ১৬
যাহে ব্যাপ্ত এই সব—জানিও নিশ্চয়
তাহা অবিনাশী; কেহ কভু নাহি পাবে
অব্যয় ইহার নাশ করিতে সাধন। ১৭

বিনাশ স্বভাব দেহ। (রামানুজ)। যাহার কারণ আছে ও কারণ ব্যতীত উপলব্ধি হয় না, যাহা বিকারী তাহা অসৎ, এই জন্য শীতোষ্ণাদি অসৎ। এবং যাহা নিত্য, যাহা সৎ, সেই আত্মার বিনাশ বা অভাব হয় না। (শঙ্কর)। যাহা শূন্য, যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই অসৎ (গিরি)। যাহার বিদ্যমানতা নাই, যাহা আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহাই অসৎ। এস্থলে শীতোষ্ণাদিকে সৎ বলা হইয়াছে (গিরি)। অতএব এই সকল অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, যাহা কারণ হইতে জাত ও কারণে লয় হয় (নাশ, কারণে লয়) (যেমন সুখ দুঃখাদি) কিম্বা যাহা পরিণাম ধর্ম্মী (যেমন দেহ) তাহাই অসৎ। আর আত্মা সৎ। সৎ বস্তুর ভাব বা অবস্থা নিত্য, অসৎ বস্তুর ভাব (বা অভাব) অনিত্য। সৎ আত্মার ভাবের সহিত অসদ্বস্তু (দেহ বা সুখদুঃখ ভাব) নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং রণে আত্মীয়ের মৃত্যু হইবে অর্থাৎ অসৎ দেহের বিনাশ বা অভাব সেই সকল লোকের আত্মাকে স্পর্শ করিবে অর্থাৎ তাহারাও ধ্বংস হইবে, এরূপ দুঃখের কারণ হইতে পারে না এবং সেরূপ দুঃখ অর্জ্জুনের আত্মাকে নিত্যরূপে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাই এস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে।

এস্থলে অসৎ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নাসতো সৎ জায়তে "নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ" "Ex nihilo nihil fit" প্রভৃতি স্থানে অসৎ অবস্তু বা nihil যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এস্থলে অসতের অর্থ ঠিক সেরূপ নহে। অর্থাৎ 'যৎ অসৎ শব্দেনা ভিধানং তৎ অব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং ন তু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং'। ইংরাজীতে যাহাকে Phenomena, Conditioned বা existence বলে, তাহাই অসৎ।

তত্ত্বদর্শী—(তৎ) সৃষ্ট বা ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানী (শঙ্কর), বস্তুর যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ (স্বামী)।

(১৭) এই সব—অর্থাৎ এই সব দেহ (বলদেব), এই জগৎ (শঙ্কর)।

অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য এ দেহীর
বিনশ্বর এই দেহ আছয়ে কথিত;
অতএব হে ভারত, করহ সমর। ১৮
যে ইহারে ভাবে হন্তা, কিম্বা যেই ভাবে
নিহত ইহারে, তারা উভয়ে না জানে
নাহি হয় হত ইহা, নহে হন্তারক। ১৯
ইহা কভু না লভে জনম,
মৃত্যু কভু নাহিক ইহার,
জন্মি পুনঃ অস্তিত্ব না হয়,
নিত্য ইহা জনম-বিহীন,
পুরাতন, সদা একরূপ
দেহ নাশে না হয় বিনাশ। ২০

---

(১৮) নিত্য—সর্ব্বদা একরূপে স্থিত।(স্বামী)।

অপ্রমেয়—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত। অপরিচ্ছিন্ন। সর্ব্ব প্রকার পরিচ্ছেদ শূন্য। মধুসূদন বলেন, পরিচ্ছেদ তিন প্রকার—দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদে বস্তুপরিচ্ছেদ তিন প্রকার। কেহ বলেন, বস্তু পরিচ্ছেদ পাঁচ প্রকার, যথা জীব ঈশ্বরে ভেদ, জীব জগতে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, ঈশ্বর জগতে ভেদ ও জগৎ পরমাত্মায় ভেদ।

করহ সমর—যুদ্ধ রূপ কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা হইতে বিমুখ হইও না (শঙ্কর)।

(১৯) নহে হন্তারক—কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয় না অর্থাৎ সর্ব্ব বিক্রিয়া শূন্য। (মধু)

নিম্নোদ্ধৃত কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ১৯ শ্লোক দেখ—'হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

(২০) কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ১৮ শ্লোক যথাঃ

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'

জন্মি পুনঃ অস্তিত্ব—মূলে আছে, "নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" কেহ কেহ পাঠ করেন "ভূত্বা অভবিতা বা ·", আত্মার ভবন (জন্ম) ক্রিয়া অনুভবের পর পুনঃ তাহার অভাব (অভবিতা) হইবে

হেন নিত্য, অবিনাশী, অজন্ম অব্যয়,
ইহারে জেনেছে যেই, কেমনে সে জন
সাধিবে কাহার বধ, বধিবে বা কারে? ২১
ত্যজি যথা পুরাণ বসন,
নব বাস পরে নরগণ—
জীর্ণ দেহ ত্যজিয়া তেমতি,
দেহীগণ করয়ে ধারণ
পুনঃ অন্য নূতন শরীর। ২২
নারে অস্ত্র ছেদিতে ইহারে, নাহি পারে
দহিতে পাবক, আর্দ্র নাহি করে বারি,
না পারে পবন ইহা করিতে শোষণ। ২৩
'অভেদ্য' 'অদাহ্য' ইহা 'অক্লেদ্য' অশোষ্য,
নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অনাদি, অচল। ২৪
অচিন্ত্য অব্যক্ত ইহা হয় অবিকারী ;—

না। কিম্বা পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব না থাকিয়া একেবারে জন্ম গ্রহণ করিবে না। ইহার দ্বারা আত্মার জন্ম মৃত্যু হীনতার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (শঙ্কর), অথবা আত্মা কখন জন্মে নাই, কখন ভবিষ্যতেও জন্মিবে না, কিম্বা আত্মা একবার জন্মিয়া পুনর্ব্বার জন্মিবে তাহা নহে। স্বামী বলেন জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণতঃ বস্তু সকল যেমন অস্তিত্ব লাভ করে, অন্যথা তাহার অস্তিত্ব থাকে না—আত্মা সেরূপ নহে। অনুবাদ কালে এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। রামানুজ বলেন, ইহা কল্পাদিতে জন্মিয়া পুনর্ব্বার কল্পান্তে বিনাশ হইবে তাহা নহে—এ অর্থ গীতার ৮। ১৯ শ্লোকের সহিত সঙ্গত নহে।

শঙ্কর বলিয়াছেন, এই শ্লোকে সাধারণ লৌকিক বিষয় যেমন ছয় প্রকার বিকৃত হয় আত্মার সেরূপ হয় না, ইহাই দেখান হইয়াছে। স্বামী দেখাইয়াছেন, জন্ম, মরণ জন্মপরে অস্তিত্ব গ্রহণ বৃদ্ধি, ক্ষয় ও পরিণাম, ইহাই উক্ত ছয় প্রকার বিকৃতি।

পুরাতন—অতীত কালে বরাবর বিদ্যমান ছিল। সদা একরূপ—(শাশ্বত) ভবিষ্যতে বরাবর একরূপ থাকিবে (স্বামী)। অথবা প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী নহে (রামানুজ)।

(২১) নিত্য—পরিণাম রহিত। অবিনাশী,—অভাব বা বিকারহীন। অব্যয়—উপচয় অপক্ষয় রহিত। (শঙ্কর)। কাহার বধ—আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অকর্তা বলিয়া বধ করে না বা করায় না,—এবং নিত্য বলিয়া বধ্য হয় না।

(২২) অন্য নূতন শরীর—অতি সুখকর যুবা বা দেব শরীর। রণে যাহার স্থিত, তাহার রণে হত হইয়া স্বর্গে দেব শরীর ধারণ করিতে পারে (বলদেব)।

অর্জ্জুন মনে করিতে পারেন, আত্মার বিনাশ না হইলেও ত শরীর বিনাশরূপ দুঃখ হয়, আমি কেন তাহার কারণ হইব, ইহার উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

(২৩) নারে অস্ত্র—অস্ত্র (শস্ত্র) খড়্গাদি, পাবক—আগ্নেয়াস্ত্র। বারি—আগ্নেয়াস্ত্র। পবন—বায়ব্যাস্ত্র—যে সকল যুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। (বলদেব)

(২৪) অভেদ্য—আত্মার নিরবয়বত্ব বা সূক্ষ্মত্ব বুঝাইবার জন্য ইহা উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। স্থির—রূপান্তরাপত্তি শূন্য। অচল পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগ। সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপী। সনাতন চিরন্তন বা অনাদি। (স্বামী)। স্বকর্ম্ম হেতু দেব মানব পশু পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্ব শরীরে পর্য্যায়ক্রমে গমনশীল (বলদেব)। অচিন্ত্য অব্যক্ত অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের অবিষয়।

(২৫) এইরূপ জানিয়া ইহার—পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকের কোন স্থানে 'আত্মা' কথার উল্লেখ নাই। 'দেহী', "শরীরী" আর "ইহা" এই তিনটী কথা মাত্র ব্যবহৃত আছে। সুতরাং দেহে অবস্থিত জীবাত্মাই ইহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই জীবাত্মা বা পুরুষের যে সকল বিশেষণ কঠোপনিষদে ও সাংখ্য দর্শনে আছে, এই সব শ্লোকে তাহাই পাওয়া যায়।

সাংখ্য দর্শনে আছে, পুরুষ অসঙ্গ (১।১৫) নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব (১।১৯) নিষ্ক্রিয় (১।৪৯) নির্গুণ (১।৫৪) দ্রষ্টা বা সাক্ষি (১।১৬১) উদাসীন (১।১৬৩) সাংখ্য তত্ত্বসমাসের ব্যাখ্যায় আছে, "পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন অগুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রবিদ্, অমল ও অপ্রসবধর্ম্মী। পুরাণ বলিয়া, পুরীতে (দেহ বা প্রকৃতিতে) শয়ন করে বলিয়া অথবা

অতএব এইরূপ জানিয়া ইহার,
শোক করা কভু নহে উচিত তোমার। ২৫

কিম্বা যদি মহাবাহু ভাবহ ইহার,
নিত্য জন্ম হয়, আর নিত্য হয় নাশ,—
তথাপি ইহার তরে শোক অনুচিত। ২৬
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

পুরোহিত বা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী বলিয়া ইহাকে "পুরুষ" বলে। ইহার আদি অন্ত মধ্য নাহি বলিয়া, ইহা 'অনাদি', নিরবয়ব ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইহা 'সূক্ষ্ম', সর্ব্বস্থানে বিরাজমান বলিয়া এবং গগনবৎ অনন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া ইহা "সর্ব্বগত"।

জর্ম্মন পাণ্ডিত ক্যাণ্ট যেমন দেখাইয়াছেন 'দেশ' ও 'কালের' অস্তিত্ব জ্ঞান ও মনের, তাহার বাহ্য অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ সাংখ্যকার বলেন "দিক কালাবাকাশ দেভ্য' অর্থাৎ 'দেশ' 'কাল' প্রকৃতিজ আকাশের গুণ উহার নিত্য বা স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। আত্মা এই দিক্ কাল অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে বলিয়া ইহা 'সর্ব্বগত'। সুখ দুঃখ মোহ উপলব্ধি করে বলিয়া এই আত্মা "চেতন"। ইহাতে সত্ব রজ তমঃ গুণ আশ্রয় করে না বলিয়া ইহা "নিগুণ"। ইহা সৃষ্ট বা উৎপাদ্য নহে বলিয়া 'নিত্য"। প্রকৃতির বিকার উপলব্ধি করে বলিয়া "দ্রষ্টা'। চেতন জন্য সুখ দুঃখ পরিজ্ঞাত হয় বলিয়া "ভোক্তা"। উদাসীন ও অগুণ বলিয়া ইহা "অকর্ত্তা"। ক্ষেত্র ও গুণ বুঝিতে পারে বলিয়া ইহা "ক্ষেত্রজ্ঞ"। ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম নাই বলিয়া 'অমল"। নির্ব্বীজ বলিয়া ইহা অপ্রসবধর্ম্মী। এই পুরুষের নামান্তর আত্মা, পুমান, পুংগুণজন্তুজীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, নর, কবি, ব্রহ্ম, অক্ষর, প্রাণ, যে, কে, সে, এই, ইহা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্ত আছে।"

(২৬) নিত্য জন্ম হয়—এই লোকপ্রসিদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসে যদি তোমার আস্থা থাকে। (শঙ্কর) অথবা যদি পাঞ্চভৌতিক (স্থূল ভূত হইতে মদশক্তির ন্যায় জাত) বলিয়া আত্মাকে ধরিয়া লও—কিম্বা বৌদ্ধদের মত দেহ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা প্রতিক্ষণ বিনাশ হইতেছে বলিয়া লওয়া যায় (বলদেব), দেহের সঙ্গে আত্মার জন্ম ও দেহ নাশে আত্মার নাশ হয়, মনে কর (স্বামী) সৌগত লোকায়তিক ও চার্ব্বাকদিগের এইরূপ মত।

জীব গোস্বামী।

ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর বৃত্তান্ত এক্ষণে যতদূর জানা যায়, তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ঐ সংগ্রহে জীব গোস্বামী কৃত রূপ ও সনাতনের বংশাবলীর কোন উল্লেখ করি নাই বলিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়াছেন। আমার বিবেচনায় উক্ত বংশাবলী বিশ্বাস যোগ্য নহে।

জীব গোস্বামী রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। এ দেশে যেমন চৌকীদারের পুত্র চৌকিদার, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, তেমনি ভক্তের সন্তানও ভক্ত না হইবে কেন? জীব ও একজন তাদৃশ ভক্ত ছিলেন। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের প্রধান বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহাদের জীবনান্তে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে সেই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের গুণ কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায়।

৺ জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের স্বপ্রকাশিত চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটী সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত দিয়াছেন। চৈতন্যের প্রতি এবং গৌরাঙ্গ ভক্তের প্রতি গুপ্ত মহাশয়ের গভীর শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি জীবের চরিত্র প্রকৃত পক্ষে যেরূপ ছিল তাহা চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিলে জীব গোস্বামী অসূয়া পরবশ হইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন; এই বৃত্তান্ত গুপ্ত মহাশয় এই রূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"রাধাকুণ্ডতীরে গ্রন্থ প্রণয়ন পরিসমাপ্ত হইলে,ইহা প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তৎকালের নিয়মানুসারে গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে স্থানীয় প্রধান প্রধান মান্য ব্যক্তির অনুমতি লইতে হইত। তাঁহারা গ্রন্থপাঠ করিয়া যদি প্রকাশ-যোগ্য বিবেচনা করিতেন, তবে গ্রন্থ শেষে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতেন, তখন সে গ্রন্থ সাধারণে লিখিয়া লইতে পারিত। তৎকালে জীব গোস্বামী বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব-সমাজের অভিনেতা ছিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ইহা পাঠ করিতে ও প্রকাশের অনুমতি দিতে অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ সকল বঙ্গ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে, তাহা অবলীলা ক্রমে সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবে, অথচ রূপ সনাতন ও তাঁহার স্বরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অপ্রচারিত থাকিবে, কেহ আর সে সকল আদর করিবে না। এই আশঙ্কা করিয়া ক্ষুদ্রচেতা জীব গোস্বামী কোপাবিষ্ট হইয়া যমুনার জল স্রোতে ঐ গ্রন্থ নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত আছে যে গ্রন্থ ভাসিতে ভাসিতে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল। তখন জীব গোসাঞা তাহা তুলিয়া আনিয়া গোস্বামী দিগের অপর অপর গ্রন্থের সামিল একটা কুঠরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন যে সাধারণে গ্রন্থের আশ্চর্য্য মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য জীব গোস্বামী এই কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।* যাহাহউক বৃদ্ধ বয়সের বহু যত্নের ধন গ্রন্থের এইদশা হইল দেখিয়া কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হইয়া শোকাকুল চিত্তে মথুরায় গমন করিলেন, এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই খেদ করিতে লাগিলেন যে সাধারণে পড়িবে বলিয়া তিনি বহুযত্নে যে গ্রন্থ রচনা করিলেন—তাহা প্রকাশিত হইল না ও শ্রীচৈতন্যের শেষ-লীলা অপ্রচারিত রহিয়া গেল।

এই সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জানাইলেন যে, যখন চৈতন্য চরিতামৃত রচিত হইতে ছিল—তাহার এক এক পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইলে, তিনি (মুকুন্দ) উহা চাহিয়া লইয়া এক এক প্রস্থ নকল করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। ইহা শ্রবণে বৃদ্ধ কবিরাজের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ঐ প্রতিলিপি খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধনান্তে তাহা গোপনে রাখিয়া দিলেন। ইত্যবসরে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বঙ্গদেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং কৃষ্ণদাসের বাচনিক গ্রন্থ বিবরণ আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া জীবকে তাহা জানাইলেন, এবং ঐ গ্রন্থের টীকা করিয়া তাহা প্রচার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জীব গোস্বামী অগত্যা কবি কর্ণপুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া কুঠরী হইতে গ্রন্থ বাহির করতঃ তাহাতে অনুমোদন স্বাক্ষর করিলেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্য চরিতামৃত পর্য্যন্ত লিখিত ছিল, তিনি 'কহে কৃষ্ণদাস' ভণিতা বসাইয়া দিলেন।

তখন বৃন্দাবনবাসীগণ সকলে ঐ গ্রন্থ লিখিয়া লইলেন এবং ব্রজধামে উহা প্রচারিত হইয়া গেল। কিন্তু জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ এ গ্রন্থ বঙ্গদেশে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় কৃষ্ণদাস মুকুন্দ দ্বারা পূর্ব্বলিখিত নকলটি নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি উহা ক্রমে ক্রমে এদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। কৃষ্ণদাসের স্বহস্ত লিখিত মূলগ্রন্থ * * * এ দেশে কখন আইসে নাই।"

গুপ্ত মহাশয় জীব গোস্বামীকে "ক্ষুদ্র-চেতা" বলিয়া যে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। আসলবৃত্তান্ত এই যে, চৈতন্যচরিতামৃতের উপর ক্রুদ্ধ হইবার জীবের অপর এক কারণ ছিল; গুপ্তমহাশয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই। গৌরাঙ্গ যৎকালে জীবিত ছিলেন, সেই সময় হইতেই রূপ ও সনাতন জাতিতে মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে রূপ ও সনাতন,ইহা ঐ দুই ব্যক্তির পিতৃ-

---

* বৈষ্ণবেরা স্বীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের চরিত্রে কোন দোষ দৃষ্ট হইলে এইরূপ ওকালতি করেন।

দত্ত নাম তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চৈতন্য ভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাস লেখেন

"শেষ খণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবির খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি দুই ভাই বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন॥"

এখানে কোনও কূটার্থ করিবার আবশ্যকতা দেখিনা দুই ভ্রাতাকে উদ্ধার করিয়া —"শেষে"চৈতন্য তাহাদিগকে রূপ ও সনাতন নাম প্রদান করিলেন। চৈতন্যের নিজ নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে তদীয় গুরু তাঁহাকে"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই নাম প্রদান করেন। দবীর খাস ও সাকের মল্লিক গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের গুরু চৈতন্যদেব তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত নূতন নাম রক্ষা করিলেন, ইহাই সরল অর্থ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি দোঁহার নাম রূপসনাতন।
ইত্যাদি।

সরল শব্দের সবল অর্থ বুঝিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বাশ্রমে রূপ সনাতনের অন্য নাম ছিল। তাহা না হইলে""আজি হইতে"চৈতন্যমুখে এরূপ বাক্য কেন বহির্গত হইবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভূরি ভূরি স্থানে রূপ সনাতনকে ম্লেচ্ছজাতি—নীচজাতি—এইরূপ শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের প্রতি জীব গোস্বামীর ক্রোধের ইহাই নিগূঢ় কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ফলতঃ গৌরাঙ্গের সমাজে প্রথমতঃ জাতিভেদ একবারে না হউক—কিয়ৎ পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছিল। গৌরাঙ্গের জীবদ্দশায় ও অব্যবহিত পরে নীচ জাতি হওয়া যে বিশেষ কোন অশ্লাঘার কারণ ছিল তাহা নহে। বরঞ্চ নীচ জাতি হইয়াও যাহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা প্রশংসার পাত্র ছিল। সুতরাং রূপ সনাতনের প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিতে কৃষ্ণদাসের চিত্তে বিশেষ দ্বিধা হয় নাই কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার ঐ রূপ লেখা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। জীব গোস্বামী হইতেই এই হুলস্থুল আরম্ভ। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ পাঠ করিলেও জানা যায়, বৈষ্ণব সমাজে অনেকে তৎকালে রূপ ও সনাতনকে মুসলমান জাতি বলিয়া বিবেচনা করিত। উক্ত গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিয়া ম্লেচ্ছজাতি ও নীচজাতি শব্দের অর্থ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যে বৈষ্ণবগণ রূপ সনাতনকে ম্লেচ্ছজাতি বলে, তাহাদের উপর তীব্র গালিবর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"সনাতন রূপ দৈন্য না বুঝি পারিতে।
মূর্খগণ ইথে তর্ক করে নানামতে॥
মহাঘোর নরক যাইতে যার সাধ।
সে করুক ঐছে কুতর্কাদি অপরাধ॥" ইত্যাদি।

ফলতঃ সনাতনকে মুসলমান বলিলে দোষ কি হয়? হরিদাসও ত মুসলমান ছিলেন? তবে ভক্তিরত্নাকরের এত ক্রোধ কেন? রূপ সনাতনের ম্লেচ্ছাপবাদ ঘুচাইবার জন্যই জীবগোস্বামীর বংশাবলী রচনা। এই বংশাবলী কতদূর প্রামাণিক, তাহা প্রমাণান্তর না পাইলে,নিশ্চয় করা কঠিন। তাদৃশ প্রমাণান্তর আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। সুতরাং আমি এপর্য্যন্ত উক্ত বংশাবলীকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই, এবং আমার সংগ্রহে উহা উল্লেখ করা হয় নাই।

এক্ষণে ভক্তিরত্নাকরের পক্ষ সমর্থন মূলক ব্যাখ্যা কতদূর শ্রদ্ধেয় অর্থাৎ সনাতন যে,আপনাকে নীচজাতি ও ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া পরিচয়

দিতেন,তাহা দৈন্যোক্তি মাত্র কি প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ,তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ—চৈতন্যের চক্ষে মনুষ্যমাত্রেই জাতিনির্ব্বিশেষে সমান বলিয়া পরিগণিত। তিনি ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতেন না—চণ্ডালকেও চণ্ডাল বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন না। কৃষ্ণভক্ত হইলেই মনুষ্যকে তিনি আদর করিতেন। ঈদৃশ মহানুভব ব্যক্তির নিকট কেবল আপনার জাতির হীনতা দেখাইলে দৈন্য প্রকাশ কিরূপে হয়? কোনও নিষ্ঠাযুক্ত ব্রাহ্মণ আপনাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাতে দৈন্যোক্তি কি প্রকাশ পায়?

দ্বিতীয়তঃ—সনাতন নিভৃতে আপন মনোমধ্যে আপনাকে কিরূপ দেখিতেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রকাশ। তিনি মথুরা হইতে পুরীতে চৈতন্যকে দেখিতে যাইতেছেন। পথক্লেশে শরীরে রোগ জন্মিল। তখন কবিরাজ গোস্বামী লেখেনঃ—

'নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার।
নীচজাতি—দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥
মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি।
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধ
তাঁর স্পর্শ হইলে মোর হবে অপরাধ॥ ইত্যাদি।

ইহাকে আর দৈন্যোক্তি বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের কথা। তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন যে, জগন্নাথ মন্দিরে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি মন্দিরের নিকটে গেলেও দোষ বলিয়া পরিগণিত হইবে—কেন না জগন্নাথের পূজারি পরিচারকগণ যদি দৈবাৎ তাঁহাকে স্পর্শ করে, তবে তাঁহার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রণিধানের বিষয় এই যে, গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেবল তিনজন—হরিদাস, রূপ ও সনাতন জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেন না। ইহার কারণ তিন জনের পক্ষেই সমান ছিল। হরিদাস যে পূর্ব্বে মুসলমান ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। রূপ ও সনাতনও স্পষ্টাক্ষরে প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্রাহ্মণত্ব বিবর্জ্জিত ম্লেচ্ছ বলিয়া কীর্ত্তিত। সনাতন স্পষ্ট বলিয়াছেন, জগাই মাধাইয়ের ব্রাহ্মণত্ব ছিল—তাঁহার তাহাও ছিল না। হরিদাসের ন্যায় তাঁহারাও যে মুসলমান হইয়াছিলেন, ইহাই সরল তাৎপর্য্য।

তৃতীয়তঃ—চৈতন্য নিজে রূপসনাতনকে নীচ জাতি বলেন কেন? চৈতন্যের মুখে আর সে কথা দৈন্যোক্তি বলা যায় না। সনাতন আত্মহত্যার ইচ্ছা করিলে চৈতন্য তাঁহাকে বলিতেছেন—

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
'নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ ইত্যাদি

সনাতন আপনাকে "নীচ জাতি" বলিয়া বিবেচনা করিয়া দেহত্যাগের কল্পনা করেন। চৈতন্য তাই বলিতেছেন তুমি "নীচজাতি তাহাতে ক্ষতি কি? কৃষ্ণ ভজনে জাতি বিচার নাই। তুমি যদি ব্রাহ্মণ হইতে, তাহা হইলেই কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য হইতে না। ব্রাহ্মণ নহ, নীচ জাতি হইতেছ তাহাতেও অযোগ্য নহ। ইহা সরল অর্থ। এস্থলে চৈতন্যও বলিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সনাতন নীচজাতি বটেন।

আর একস্থলে চৈতন্যের নিজ মুখে সনাতনের জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্য সমুদ্রতীরে বৈষ্ণবদিগকে নিমন্ত্রণ করেন,

সনাতনও নিমন্ত্রিত হইলেন। জগন্নাথের সিংহ দ্বারের সম্মুখ দিয়া প্রশস্ত ও সোজা পথ; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সে পথে যবনের যাইবার অধিকার ছিল না। তখনও উৎকলে হিন্দু রাজত্ব প্রবল। সুতরাং সনাতনকে ঘুরিয়া উত্তপ্ত বালুকাপথে যাইতে হইল; তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গেল। মহাপ্রভু সনাতনকে এরূপ কেন করিলে জিজ্ঞাসায় সনাতন বলিতেছেন—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।
কারও সহিত স্পর্শ হইলে সর্ব্বনাশ করে॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে—তুষ্ট হৈল মোর মন।" ইত্যাদি।

এখানে মর্য্যাদা রক্ষার সরল অর্থ এই যে নীচজাতি হইয়া, শ্রেষ্ঠ জাতির ন্যায় ব্যবহার না করা। সনাতন আপনার ম্লেচ্ছত্ব অঙ্গীকার করিয়া যে বলিয়াছিলেন, ইহাতে মহাপ্রভু প্রীত হইয়াছিলেন।

অতএব বিবেচনা হয় যে, কৃষ্ণদাস রূপসনাতনকে যে নীচজাতি বলিয়া বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কেবল দৈন্যোক্তি নহে। জীবগোস্বামীর সে কথা ভাল না লাগায় তিনি কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃতকে যমুনায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন!

গৌরাঙ্গ ভক্তগণের সমাজে ইতিহাসের মর্য্যাদা কিরূপ, তাহা জীবগোস্বামীর ব্যবহারে প্রকাশ। কৃষ্ণদাস সত্যকথা লেখায় তাঁহার গ্রন্থ যমুনায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যাহারা সত্য ছাপিতে পারে, তাহারা যে মিথ্যা লিখিতেও পারে, তাহা বলা বাহুল্য। এইজন্য বৈষ্ণবগ্রন্থে ইতিহাস খুঁজিতে গেলে সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন।

আমি লিখিয়াছিলাম যে, মালদহ জেলার অন্তঃপাতি মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপসনাতনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়, এবং তাঁহারা ঐ স্থানে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একজন প্রতিবাদকারী বলেন, "মোরগ্রাম মাধাইপুরে রূপসনাতনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় নাই; পূর্ব্ববঙ্গের বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ও ফতোয়াবাদ গ্রামে পিতৃভবনে ইহারা লালিত পালিত হইয়াছেন।" মালদহ জেলার প্রাচীন গৌড়নগরের অন্তঃপাতি চণ্ডীপুর নিবাসী মহাবৈষ্ণবভক্তাগ্রগণ্য ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয় সনাতন ও রূপ গোস্বামীর যে জীবন চরিত্র লিখিয়াছেন, তাহাই আমার উক্তির মূল। উক্ত লেখক বলেন যে, বাকলা চন্দ্রদ্বীপে পাত্রী অভাবে কুমার দেবের বিবাহ না হওয়ায় একজন ঘটক গৌড়দেশে আসিয়া মাধাইপুরের হরিনারায়ণ বিশারদের রেবতী নাম্নী এক কন্যার সহিত কুমার দেবের সম্বন্ধ করেন, এবং কুমারদেব রেবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া ঘরজামাতা হইয়া মাধাইপুরে বাস করিয়াছিলেন। অধিকারী মহাশয় লেখেন—

"উদ্বাহান্তে মুকুন্দদেব (কুমারদেবের পিতা) স্ববাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুমারদেব শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া রাজধানী গৌড়নগরকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন বিলোকনে, এবং সম্ভ্রান্তগণের প্রণয়পাত্র হওয়াতে মাধাইপুরে চিরবাসেই বাধ্য হইলেন। কুমারদেবের কালে তিন পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ, কনিষ্ঠ অনুপম বা বল্লভ। পৌগণ্ডকালে ইঁহাদের তিন সহোদরের ব্যাকরণাদিতে সত্বর ব্যুৎপত্তি জন্মিল। গৌড়

হুসেনসাহ পাতসাহের রাজধানী, অতি সমৃদ্ধিশালী, এবং ইহাতে বহুদেশীয় বহুবিদ্যার পারদর্শীগণের নিয়ত গতিবিধি হইত। সুতরাং অনায়াসেই বহুবিদ্যা শিক্ষোপযোগী অধ্যাপক পাইয়া বহুবিদ্যাতেই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তথাপি শিক্ষাপরবী হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া অবশিষ্ট বিদ্যাশিক্ষা উদ্দেশে ভ্রাতৃত্রয় দেশান্তরে যাত্রা করিলেন। নানাদিগ্দেশ ভ্রমণ করতঃ চৌষট্টি বিদ্যার পারগ হইয়া যৌবনাবির্ভাবের প্রাক্কালেই প্রত্যাগমন করিলেন।"

এখানে প্রতিবাদকারী মহাশয়ের কথা সত্য, কি অধিকারী মহাশয়ের কথা সত্য, ঈশ্বর জানেন। সম্প্রতি বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রূপসনাতনের যে জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নবদ্বীপে অধ্যয়ন করা প্রকাশ আছে। ধনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয়ও এক টীকায় বলেন যে, সনাতন "বিদ্যাবাচস্পতির" নিকট অধ্যায়ন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যাবাচস্পতিকে আমি নবদ্বীপের একজন অধ্যাপক বলিয়া গ্রহণ করিযাছিলাম। ফলতঃ রূপসনাতনের জীবনবৃত্তান্তে গোলযোগের কথা এবং কাল্পনিক কথা এতই শুনাযায় যে, তাহা হইতে সত্যকথা বাহির করা কিছু সুকঠিন।

প্রতিবাদকারী বলেন "পরন্তু রূপগোস্বামী যে সাকরমা গ্রামে বাস করিয়াছেন, ইতিহাসে ইহার কোনও প্রমাণ নাই। উভয় ভ্রাতাই যে রামকেলী গ্রামে বাস করিয়াছেন ইহাই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এই বলিয়া ভক্তিরত্নাকরের প্রমাণ দিয়াছেন। ভক্তি রত্নাকরও যাদৃশ ইতিহাস, আমাদের অধিকারী মহাশয়ের গ্রন্থও তাদৃশ ইতিহাস। উভয় তুল্য প্রামাণিক গ্রন্থ। এখন আমাদের অধিকারী মহাশয় কি বলেন, প্রতিবাদকারী মহাশয় শ্রবণ করুন—

"সনাতন রূপ মন্ত্রী হইয়া রাজপ্রাসাদের অত্যল্প ব্যবধানে (অর্থাৎ রামকেলীতে) বাসাগৃহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তথাপি সময়ে সময়ে মাধাইপুরে বাটী গমন করিলে হস্তী অশ্ব শিবিকা পত্তাতিক সমভিব্যাহারে আসিলে স্থান সংকীর্ণ বশতঃ ক্লেশ হইবে, তজ্জন্য রূপ সাকার মল্লিক অত্যল্প ব্যবধানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করতঃ বহু প্রজাউপনিবেশে পরিশোভিত করিয়া নবগ্রামের নাম "সাকার মল্লিকপুর" রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই গ্রাম বিজনে পরিণত হইয়া সাকরমার কাঠাল নামে অভিহিত হইয়াছে বটে, তথাপি রাশি রাশি ইষ্টক পাষাণ স্থানে স্থানে ভূত কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"

প্রতিবাদকারীর সকল কথার উত্তর দিতে যাওয়া অনাবশ্যক। যাঁহাদের হৃদয়ে ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষণ স্থলেও বিচারের আসন নিয়ে, ভক্তির আসন উপরে, তাঁহাদের জন্য আমার সংগ্রহ রচিত হয় নাই। কেবল সংস্কৃত শ্লোক বা গ্রন্থের লিখক মাত্রেই যাঁহাদের চক্ষে প্রমাণ, তাঁহাদের জন্যও রচিত হয় নাই। ভক্ত বৈষ্ণবগণের লিখিত বৃত্তান্ত মালদহের দবীর খাস ও সাকার মল্লিক, ওরফে সনাতন ও রূপ গোঁসাঞীর প্রকৃত ইতিহাস কি পাওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া লওয়া আমার উদ্দেশ্য। আমার বিবেচনায় রূপসনাতন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন, এবং আবার অবশেষে ভেকধারী বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিষয় লোভেই মুসলমান হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, উদ্ধার হইয়া তাঁহারা বিশ্বম্ভরমিশ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের নিকট পরমার্থ বিষয়ে কি উপদেশ পাইয়াছিলেন এবং সেই উপদেশে তাঁহাদের জীবনের শেষ দশায় কিরূপ রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের বুঝা প্রয়োজন। মনুষ্য মাত্রেই প্রায় অজ্ঞান বা লোভের বশীভূত হইয়া বিপথ গামী হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একবার বিপথ-

গামী হইয়াও অনুতপ্ত হৃদয়ে আবার সন্মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। রূপসনাতনের জীবন এক সময়ে কলুষিত ছিল * একথা ভাবিয়া কাহারও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার আবশ্যক নাই। সনাতন নিজ মুখেই (কৃষ্ণদাসের লেখামত)

* রূপসনাতনের চাকুরি পরিত্যাগের কারণ আমি যেরূপ লিখিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া কোনও কোনও ভক্ত পাঠক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে আমার উক্তির বুনিয়াদ কি, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি।

আলাউদ্দীন হুসেন সাহা একজন অতীব ন্যায়-পরায়ণ ও প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। কতদিন গৌড় বিলুপ্ত হইয়াছে, তত্রাচ অদ্যাপি মালদহে হুসেন সাহাকে লোকে ভক্তির সহিত স্মরণ করে। তিনি প্রথম অবস্থায় অরাজকের অবসান ও শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য কয়েকটি যথেচ্ছাচার কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অতীব ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

ইতিহাসলেখক Stewart সাহেব বলেন—"After these arbitray but salutary acts, Ala Addin ruled with strict Justice." P. 72. পুনশ্চ 'AlaAddin enjoyed a peaceable and happy reign, beloved by his subjects and respect ed by his neighbours." P.73" এই বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতিরঞ্জন রাজা রাজস্ববিভাগে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থকে চাকুরি দিয়াছিলেন। সনাতন তাঁহারই রাজসরকারের একজন মুহুরি ছিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞায় সনাতন নিগড়বদ্ধ হইয়া কারাগারে অর্পিত হয়েন।

রাজস্ববিভাগের একজন কেরাণীর উপর দণ্ডাজ্ঞা এমন কোনও গুরুতর বিষয় নহে যে, তাহা মুসলমান ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। এদিকে ভক্তের নিকট প্রকৃত কথাও পাইবার আশা করা যায় না। সুতরাং সনাতন যে কি অপরাধে কারাদণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। তবে কৃষ্ণদাসের ভক্তিগ্রন্থে কতক আভাসে কতক স্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে—

(১) সনাতন কারারুদ্ধ হইবার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বেই রূপ অনেক অর্থ লইয়া গৌড় হইতে গৃহে গমন করেন। সনাতনের ব্যবহার জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ গৌড়ের এক মুদির ঘরে থাকিয়া যায়।

(২) রূপ বাড়ীতে আসিয়া যে অর্থ আনিয়াছিলেন, রাজদণ্ড হইলে উদ্ধার লাভের জন্য তাহার চতুর্থাংশ "ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য" বা গচ্ছিত রাখিলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে রাজদণ্ডের ভয় জাগরূক ছিল।

(৩) রূপ বাড়ীতে বসিয়া শুনিলেন যে সনাতন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তখন—

"শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঞী॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তথা হইতে॥
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিল গমন।"

এস্থলে বলা উচিত যে, রূপ গোসাঞী সংসারের একটা কোনও বিলি বন্দেজ না করিয়াই, তাড়াতাড়ি বাটী হইতে পলাইয়া গেলেন। এ কথা পরে প্রকাশ পাইবে। ভাবে বুঝা যায়,সনাতনের ন্যায় পাছে হুসেন সাহা তাঁহাকেও ধরিয়া কয়েদ করেন,এই ভয়েই রূপ তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্নচিত্তে গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া হুসেন সাহার রাজ্যের বাহিরে প্রয়াগে পলাইলেন।

(৪) প্রয়াগে বল্লভভট্ট যখন চৈতন্যের সহিত দেখা করিতে আইলেন, তখন চৈতন্য রূপকে নির্দ্দেশ করিয়া বল্লভভট্টকে বলিতেছেন—

"ইহা না স্পর্শিও ইহোঁ জাতি অতিহীন।"

রূপ গোসাঞীর যে তৎপূর্ব্বে জাতিপাত হইয়াছিল, তাহা এই চৈতন্য বাক্যে প্রকাশ।

(৫) তাহার পর সনাতন কারারক্ষককে অনেক টাকা ঘুস কবুল করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন এবং পলাইয়া গিয়া চৈতন্যের সহিত কাশীতে মিলিত হইলেন।

(৬) তাহার পর রূপ ও বল্লভ এবং সনাতন মথুরা বৃন্দাবনাদি তীর্থে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে গেলেন। মহাপ্রভু ইত্যবসরে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

আপন বিষয় কর্ম্মকে, নরকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মন্দকে মন্দ অবশ্য বলিতে হইবে, কিন্তু মনুষ্য হইয়া কে না দুএক সময়ে মন্দকার্য্য করে? এক্ষণে কি উপদেশের প্রভাবে রূপসনাতন উদ্ধার হইয়া ছিলেন, উদ্ধার কাহাকে বলে এবং প্রকৃতপক্ষে রূপসনাতন উদ্ধারের পথে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহাই বিবেচ্য। বারান্তরে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

---

(৭) কিছু কাল পরে রূপগোস্বামীও তীর্থ পর্য্যটনের পর অবশেষে নীলাচলে (পুরীতে) আসিয়া চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় কিয়ৎ কাল বাস করিলেন।

(৮) সনাতনও পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট কিয়ৎকাল থাকিয়া তাঁহার আদেশে স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বাস করিতে গেলেন। গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তিনি সাহসী হইলেন না।

(৯) রূপ কিন্তু বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে সংসারের বিলিবন্দোবস্ত করিতে (ফতেয়াবাদ বা চন্দ্রদ্বীপে নয়) গৌড়ে আর একবার আসিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

"এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি রূপ গোঁসাঞী তাঁহারে মিলিলা॥
এক বৎসর রূপ গোঁসাঞীর গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল॥
সব মন কথা গোঁসাঞী করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥"

এতদিনে রূপ গোঁসাঞী নিশ্চিন্ত হইলেন। এখানে যে এক বৎসর গৌড়ে থাকার কথা দেখা যায়, ইহা গৌড়ের সমীপবর্ত্তী সাকর মল্লিক পুরে (অধুনাতন সাকরমাতে) রূপ সনাতনের যে বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই সম্ভব। রূপের নিকট কুটুম্ব ও পরিবার বর্গ এইখানেই বরাবর বাস করিতেছিল অনুভব হয়।

ইহাতে রূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে, এবং সনাতন কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া যে চৈতন্য চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। ন্যায়পরায়ণ হুসেন সাহার নিকট তাঁহাদের এইরূপ দণ্ড বা দণ্ডের ভয় কেন ইহা কোন বৈষ্ণব লেখকই স্পষ্ট করিয়া বলেন না। কৃষ্ণদাস যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিচারে অগ্রসর হইলে পাঠকের বুদ্ধির অবমাননা করা হয়। কৃষ্ণধন অধিকারী মহাশয় এক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, হুসেন সাহার মুরসীদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যতদিন রূপসনাতন তোমার মন্ত্রী থাকিবে, ততদিন তোমার রাজত্ব বিনষ্ট হইবে না। ইহারা মন্ত্রিত্ব হইতে অবসর লইলে তোমার রাজ্য বিনষ্ট হইবে। এই জন্যই সনাতন মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া না পালায়, এই ভয়ে হুসেন সাহা তাঁহাকে কয়েদ করেন। ফলতঃ বৈষ্ণব ভক্তগণের পক্ষ কি দুর্ব্বল, তাহা এই কিম্বদন্তীতে প্রকাশ। নিতান্ত বালক না হইলে কেহ এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিবে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি। ফলতঃ রূপসনাতন চলিয়া গেলেও যে হুসেন সাহার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা ইতিহাসে প্রকাশ। ইতিহাসানভিজ্ঞ ভক্তেই রূপ সনাতনের সাফাই জন্য এরূপ অসার বালোচিত কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। মূল কথা, মুসলমান ইতিহাস রূপসনাতনকে চেনে না। অন্ততঃ আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে রূপসনাতন নামে কোন "উজীরের" নাম মুসলমান লিখিত হুসেন সাহার ইতিবৃত্তে দেখি নাই। তাঁহারা যে বৈষ্ণব গ্রন্থে রাজমন্ত্রীর পদ পাইয়াছেন, ভক্তিই তাহার মূল; তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখি নাই। ইতি।

বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল। (৩)

এমন দেখা যাউক, স্যর চার্লস এলিয়ট পয়োপ্রণালীর গঠন বিষয়ে বিলের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই,—

"The bill was not aimed at small clearances of marshy land or pools of water round villages or rural towns, this like the cleaning out or digging of new tanks and wells, could be reached through the local self government Acts and the operation of District Boards or possibly by village unions" পল্লীগ্রামের পয়োনালী বা জলমগ্ন ভূমি সংস্কার ও পরিষ্কার করা এই বিলের উদ্দেশ্য নহে। সে বাধা পুষ্করিণী সংস্কার ও নূতন পুষ্করিণী খননের ন্যায় স্থানীয় আত্মশাসন আইন, ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড দ্বারা হইতে পারিবে, সম্ভবতঃ ভিলেজ ইয়ুনিয়নও তাহা করিতে পারিবে।

অতএব অন্ততঃ আপাততঃ ইহা নিশ্চয় যে, গ্রাম্য পয়োনালা সৃষ্টি ও সংস্কার করার জন্য এই আইনের অনুষ্ঠান হয় নাই। গ্রাম্য ড্রেণেজ আইনে গ্রাম্য ড্রেণ প্রস্তুত ও পরিষ্কার হইবে না, ইহা হঠাৎ শুনিতে খুব নূতন কথা বটে, কিন্তু, নূতনই বা বলি কেন? ইহা আর অতঃপর আশ্চর্য্যই বা কি? যেমন পথ কর ও পূর্ত্ত করে, কোনও পুরুষেও গ্রাম্য পথ ঘাট প্রস্তুত হয় না, তেমনি ড্রেণেজ করেও গ্রাম্য ড্রেণ প্রস্তুত ও পরিষ্কার হইবে না। তবে, তদ্দ্বারা হইবে কি? যাহা হইবে, তাহা স্যর চার্লস সাধারণ আন্দোলনের আবর্ত্তে পড়িয়া আপনিই ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে ব্যাখ্যা এই,—

"The object of Government was to deal with the case of the silted up rivers and water channels which have ceased to perform their old functions and no longer carry off the rain water in a continuous stream. There were many of these in central Bengal and especially in Burdowan Hooghly, Nuddea, Jessore and Khoolna."

অর্থাৎ যে সকল নদী ও জলপ্রবাহ মৃত্তিকা বালু পূর্ণ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে, বৃষ্টি পতিত বারি আর পূর্ব্ববৎ সতেজ স্রোতে অবিরাম বহন করে না, এই আইনে তাহাদেরই সংস্কার করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। মধ্যবঙ্গে, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান, হুগলী নদীয়া, যশহর ও খুলনা জিলায়, এইরূপ অবরুদ্ধ স্রোত নদী প্রবাহ বিস্তর আছে।"

বঙ্গেশ্বরের মুখে গ্রাম্য পয়োপ্রণালীর এই অভূত পূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে বহু কথা, বহু ভাব, বহু প্রশ্নেরই উদয় হয়। গ্রাম্য ড্রেণ বা ড্রেণেজ বলিতে নদ নদী বুঝাইতে পারে, ইহা সাধারণ লোকের স্বপ্নাতীত। অন্ততঃ এত কাল সম্পূর্ণরূপে স্বপ্নাতীত ছিল। শব্দার্থের বিপুল ব্যাপকতা-বাদী অতি বড় শাব্দিক পণ্ডিতের মনেও কখনও গ্রাম্য পয়োনালীর এরূপ বিরাট অর্থ উদয় হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। নর্দ্দামা মানে নদ নদী একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও অভিধানেই বোধ হয় লিখিত হয় নাই। এমন কি বঙ্গীয় রাজ সভার কোনও সদস্য ইত্যগ্রে উহা অবগত ছিলেন, ইহাও অনুমান হয় না, কেননা তাহা হইলে ব্যবস্থাপক বৈঠকের অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা অঙ্কুরেই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইত। নর্দ্দামা অর্থে নদী, ইহা পূর্ব্বে জানা না থাকাতেই সরকারী ও বেসরকারী অনেক ব্যবস্থাপকের বক্তৃতা আজ "বাতিল" হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় সভা সমিতি ও সম্পাদকদিগের সময়ও বড় কম নষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের কয়েক মাস ব্যাপী আন্দোলন, আবেদন, আর্ত্তনাদ, যুক্তি তর্ক প্রায় সবই স্যর চার্লস একই উক্তিতে উধাও উড়াইয়া দিয়াছেন। কারণ অতঃপর সরকার বাহাদুর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ড্রেণ অর্থে নর্দ্দামা নহে, নর্দ্দামা অর্থে খানা খন্দ, বিল জোল জলা নহে; গ্রাম হইতে নদী অভিমুখে গ্রাম্য জল নিকা-

সেব পূর্ব্বাপর পরিচিত পথও নহে; শব্দার্থের নূতন নিয়মে, অলিখিত অভিনব অভিধানানুসাবে নর্দ্দামাব অর্থ বড বড় নদ নদী,—যেমন ভৈবব, কপোতাক্ষ, ইত্যাদি।

কিন্তু, শব্দার্থ ঘটিত এই অসামান্য বহস্য এখন যাউক। বঙ্গেশ্বব এই ড্রেণেজ বিলেব ড্রেণ ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বস্তুতই এক অতি বৃহৎ নৈয়ায়িক শক্তি প্রদর্শন কবিয়াছেন। বঙ্গীয় ন্যায়বত্ন মহাশয়দিগেব নিমন্ত্রণ সভাব "ন্যায়েব ফাঁকি" ও ইহাব নিকট অতি তুচ্ছ। কিন্তু,আম'-দেব আশঙ্কা হয়, ইহাতে জনসাধাবণেব মনে সবকাব বাহাদুবেব সদাভিপ্রায সম্বন্ধে সমূহ সন্দেহ জন্মিতে পাবে। কোথায় গ্রাম্য পয়োনালী পবিষ্কাব,আব কোথায় নদ নদী সংস্কাব। উভয়ে যে প্রায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহাকেই বোধ হয় বলে ধান্য পেষণে শিব সঙ্কীর্ত্তন। কিন্তু, নদী সংস্কাব কবিবাব জন্য নর্দ্দামাব নাম কবার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা কি, আমবা আদৌ অনুমান কবিতে অক্ষম। অবরুদ্ধ স্রোত নদী উন্মুক্ত প্রবাহ কবিতে হইবে, বেশ, আইনটী ঠিক তাহাই বলিয়া কবা হয় না কেন? তাহাব জন্য গ্রাম্য নর্দ্দামাব নাম কবা কেন? মৃত্যু, ম্যালেবিয়া, স্বাস্থ্য বক্ষা প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক আডম্বব কবিয়া আসল কার্য্যটীর উপবেই বা আববণ দেওয়া কেন? ইহা কি সত্য সত্যই রাজনীতিব একটী লক্ষণ? অথবা আইনের যদৃচ্ছা আকুঞ্চন প্রসাবণ করিবার জন্যই এরূপ জটিল ও কুটিল পথ অবলম্বন করা? উদ্দেশ্য যাহাই হউক,—উপস্থিত ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য মূলতঃ মন্দ নহে আমবা জানি, তথাচ অঙ্গীকার একরূপ করিয়া কার্য্য অন্য রূপ কবিলে লোকের মনে স্বতই শঙ্কা ও সন্দেহ জন্মে। এরূপ শঙ্কা ও সন্দেহের উদ্রেক করা, শাসন নীতির বিরুদ্ধ কিনা শাসয়িতাদিগেবই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। নদ নদী বহতা কবাই যখন গবর্ণমেণ্টেব উদ্দেশ্য বলিযা আমবা এখন শুনিতেছি,তখন এই বিলেব নাম ও গঠন ঠিক্ তদনুরূপ কবিলেই ত অনেক লেঠা মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাহাব নামে ও গঠনে ত নদ নদী পবিষ্কাবেব নাম গন্ধও নাই। অতএব বামেব নাম কবিযা শ্যামকে দেখাইলে লোকে কিরূপে বুঝিবে,গব।মেণ্টেব আসল উদ্দেশ্য কি? উপস্থিত সংকল্প ও ভবিষ্যত সাধনাই বা কি? লোকে কিরূপেই বা সে বিষয়ে সমীচীন মত সংগঠন কবিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইবে? বেঙ্গল ড্রেণেজ বিল সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রজা উপযুক্ত ও সাবগর্ভ অভিমত প্রকাশ কবিতে পাবে নাই বলিযা বঙ্গেশ্বব ইঙ্গিতে তাহাদিগকে একটু নিন্দা কবিযাছেন, কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, এই নিন্দাব ভাগী কে? বায়ত না বাজা? গবর্ণমেণ্ট নিজে অথবা দেশীয় সভা সমিতি ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ। গবর্ণমেণ্ট বিলে লিখিলেন, একরূপ বক্তৃতায় বলিলেন অন্যরূপ। লোকে কোন্ কথায় আস্থা স্থাপন কবিবে, কোন কথাটীকে কেন্দ্র কবিয়া আপন আপন অভিমত সংগঠন কবিবে।।

ফলতঃ বঙ্গেশ্বব তদীয় ঢাকা বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, এই বিল খানি বস্তুগত আদৌ তাহা নহে। তাহা কবিতে হইলে উহাব আমূল পবিবর্ত্তন কবা আবশ্যক হইবে, এবং সে পবিবর্ত্তন কবা হইলে পব, তবে লোকে সে সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিমত সম্যক সংগঠন কবিতে সমর্থ হইবে। তাহাব পূর্ব্বে অভিমত ব্যক্ত কবা প্রায় অন্ধকাবে ইষ্টক নিক্ষেপেবই তুল্য। বঙ্গেশ্ববেব ব্যাখ্যানুসারে "বেঙ্গল স্যানিটারী বিলেব" নাম হওয়া উচিত "বেঙ্গল রিভাব বিক্লামেসনবিল", পরন্তু, বিলের

অন্যান্য অনেক ধারারই পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রয়োজন। তবে কিনা এক কার্য্যের জন্য কর বসাইয়া অপর কার্য্যে তাহা ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট অনভ্যস্থ নহেন। পথ-কর, পূর্ত্ত-কর, দুর্ভিক্ষ কর, পথ ও পূর্ত্তের জন্য এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সংগৃহীত হইয়া, ব্যয় হইয়া থাকে শিক্ষা বিস্তারে, সীমান্ত-সমরে, অথবা ইয়ুরোপীয় সার্বিসের বিনিময়-বিভ্রাট সংহারে! অতএব এই হেতুবাদে যদি নর্দ্দামা-কর নদ নদীর কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তাহা আর তত আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু কর করই। নর্দ্দামার নামেই হউক আর নদীর নামেই হউক, এই কৃষি-কর অন্যায়, অনুপযুক্ত, অত্যাচার-প্রণোদিত। তবে কিনা নর্দ্দামার আইন করিয়া সেই নর্দ্দামা নিমেষ মধ্যে নদীতে পরিণত করা "জলকে দুধ, দুধকে জল করার মত যেন অশিক্ষিত চক্ষে অল্লাধিক অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে। স্যর চার্লস এলিয়ট বাহাদুর নর্দ্দামা বিলের যে নর্দ্দামাকে বলিতেছেন নদী, তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গেশ্বর তাহাকেই বলিতে পারেন, সমুদ্র! তস্য পরবর্ত্তী আর এক জন আসিয়া আবার তাহাকেই মহাসমুদ্র বা মরুভূমিতে পরিণত অনায়াসেই করিতে পারেন! কেননা এই আইনটী যে প্রকার অপরিসীম স্থিতি-স্থাপকতা ও অনন্ত ব্যাপকতা স্বরূপে সমন্বিত, তাহাতে উহা টানিলেই বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব মুহূর্ত্ত মধ্যে বঙ্গীয় গ্রাম্য পয়োনালী আটলাণ্টিক মহাসাগরে বা সাহারা মরুভূমিতে বিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না, কে বলিল? এবং বঙ্গীয় ভূমি সংশ্লিষ্ট ড্রেণেজ টেক্স আটলাণ্টিকমহাসাগর শোধন বা সাহারার মরু সংস্কার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? কারণ ম্যালেরিয়া বা মাসমাটা উপরোক্ত মহাসমুদ্র ও মরু হইতে উদ্ভুত হইয়া বঙ্গীয় প্রজার প্রাণান্ত করাও ত এক সময়ে অসম্ভাবিত না হইতে পারে। কাজেই ড্রেণেজ বিল বিষয়ক স্যর চার্লসের এই ব্যাখ্যা উহার শেষ ব্যাখ্যা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তাঁহার সহিত তদীয় এই ব্যাখ্যাও বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বিলাতে গমন করিবে। যখন অপর বঙ্গেশ্বর আসিয়া উহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, তখন বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বরকে হয় ত, এই বিশ্ব সংসারেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই কারণেই উপস্থিত আইনটীর এতাদৃশ অসংযত, অনির্দ্দিষ্ট ও অতি ব্যাপক ভাব দূরীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি।

কিন্তু, এই আইনটী আমূল ভ্রমসঙ্কুল; ইহার আদি অঙ্কুর হইতে প্রধান অঙ্গ, শাখা, প্রশাখা সমস্তই প্রমাদে পূর্ণ। ম্যালিরিয়া নর্দ্দামার ন্যায় নদীতে থাকাও অদ্যাবধি প্রমাণিত হয় নাই। নর্দ্দামার আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত যত কথা আমরা ইত্যগ্রে বলিয়াছি, সে সমস্তই নদী সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। অতএব নর্দ্দামা ছাড়িয়া নদীর পক্ষ অবলম্বন করাতেও প্রত্যক্ষ ঘটনা ও পরীক্ষিত ও প্রমাণীকৃত যুক্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। অবরুদ্ধ পয়োনালীর ন্যায় রুদ্ধ-স্রোত নদ নদী প্রবাহ পরিষ্কার ও প্রবাহিত করার প্রচুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে; প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু, তাহা অন্যান্য কারণে। ম্যালেরিয়া প্রসমন কল্পে সে প্রয়োজনীয়তা আদৌ অপ্রামাণ্য। এবং তজ্জন্য দেশব্যাপী কৃষি কর সংস্থাপন করা একান্ত অন্যায় এবং অসঙ্গত। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত কৃষক এ কর দিতে কেবল অসমর্থ বলিয়া নয়, এ কর দিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ সে বাধ্যই নহে।

অবরুদ্ধ নদী প্রবাহ পরিষ্কার করিবে কর; তাহা করা অতীব প্রয়োজন; কিন্তু, তজ্জন্য ম্যালেরিয়ার নাম লইও না। তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া প্রশমিত হয় নাই; প্রত্যুত প্রব লীকৃত হইয়াছে। প্রমাণ সাহাবাদ ও গয়া জিলার কেনাল কাটিয়া শোণ নদীর সংস্কার এবং হুগলী জিলায় "কাণানদী" ও "কাণা দামোদর" নদ পরিষ্কার। কৃত্রিম উপায়ে নদীর স্রোত সচল ও প্রবল করাতে উপরোক্ত উভয় স্থলেই ইষ্টের পরিবর্ত্তে প্রভূত পরিমাণে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। শিল্পের দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের উপর আঘাত করিয়া ছেলে খেলা করা, ব্যাপার বড় সহজ নয়। আগুনে হাত দেওয়ার মত হাতে হাতেই তাহার শাস্তি পাইতে হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে আরা, বক্সার, ডিহিরি, বারুণ প্রভৃতি স্থান কিরূপ চমৎকার স্বাস্থ্যকর ছিল, সকলেই অবগত আছেন। এই সকল স্থান বঙ্গদেশের স্যানিটেরিয়ম স্বরূপ ছিল। কিন্তু, কেনাল কাটিয়া শোণ নদের বারি রাশি সচল ও সুপ্রবাহিত করার পর হইতে ঐ সকল স্থানের কীদৃশ দুরবস্থা হই য়াছে? যাহা হইয়াছে তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। যে আরা বক্সার বারুণ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কেহ কখনও জ্বরজ্বালা চক্ষে দেখে নাই, তাহা এখন শোণ কেনালের প্রসাদাৎ ম্যালেরিয়ার মর্ম্মান্তিক হৃদ্‌কম্পে প্রকম্পিত, প্লীহা যকৃতে পূর্ণ। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত সেক্রেটারী মিঃ অডলিঙের উক্তির উল্লেখ করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। সরকারী আরও অনেক কাগজ পত্রে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। পাটনা বিভাগের সাম্বৎসরিক শাসন বিবরণী, আজ কয়েক দিন মাত্র হইল প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীতেও সাহাবাদ প্রভৃতি "কেনাল ডিষ্ট্রিক্ট" সকলের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা প্রকাশ। বিভাগীয় কমিসনর লিখিয়াছেন;—

"* * We have had everywhere great deal of fever, *especially in Shahabad* and also in the submerged tracts in the three northern districts as might have been expected, and though the mortality from this cause has been less (*except in Shahabad*) than in 1892, it has been greater than 1891 and previous years. This is partly, no doubt, to be attributed to improved registration as well as to the general increase in population, *but I am afraid that it must be admitted that the disease is itself every where gradually making headway* *

এ সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তিই প্রচুর। যে সাহাবাদ জিলায় লোকে কিছুকাল পূর্ব্বে জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইত, তাহা এখন জ্বরাসুরের লীলাভূমি। বিভাগীয় কমিসনর বলিতেছেন, সাহাবাদে মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জ্বরাসুর ম্যালেরিয়া মাতঙ্গোপরি উত্থিত হইয়া সমগ্র বিহার ভূমে প্রতিমুহূর্ত্তে আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। সংক্রামক ম্যালেরিয়ার মহিমা বিস্তার কল্পে এখন আর নিম্নবঙ্গে ও বিহারে বড় বেশী প্রভেদ নাই। কিন্তু বিহারভূমে অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও ম্যালেরিয়া ছিল না। কেনাল কাটার পর হইতেই উহা তথায় প্রবেশ করিয়াছে। অতএব আমরা অবশ্যই বলিতে পারি যে, বিহারের ম্যালেরিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজেরই সৃষ্টি, উহা সম্যক প্রকারে ইঞ্জিনিয়ারি শিল্প সঞ্জাত। বিহারী কেনালে কোটী কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়া উৎপন্ন করিয়াছে ম্যালেরিয়া, বিস্তার করিতেছে জ্বরজ্বালা ব্যাধি। বলিবে, কেনাল প্রবাহিত জলে জ্বরজ্বালার সৃষ্টি করিলেও, ভূমির উর্ব্বরত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে, অনুর্ব্বর ভূমি শস্যপ্রসূ করিয়াছে। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে এই কথাটাই কি ঠিক? অথবা ইহার বিপরীত কথা সত্য? কেনাল জলে

* The italics are ours

উর্ব্বর ভূমি উষর হইয়া যাইতেছে; মৌতাতী অহিফেন-সেবীর মত মৃত্তিকা নিজের স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া শস্যোৎপাদন কল্পে সম্পূর্ণরূপে সেই জলের উপরেই নির্ভর করিতেছে। অতএব পাঠক ইহাতেই বুঝুন, এই কেনালে ইষ্টানিষ্ট কি ঘটিয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট এই দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত সত্বেও যে নিম্নবঙ্গের নদ নদী লইয়া নাড়াচাড়া করিবার জন্য অসীম ব্যয়-সাগরে ঝাঁপ দিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সে দেশেরই দুরদৃষ্ট।

পরন্তু বহু ব্যয়ে হুগলীজিলার কাণা নদী ও কাণা দামোদর নদের সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহার ফল কি হইয়াছে? তাহাতে জ্বর জ্বালা প্রশমিত না হইয়া বৰ্দ্ধিত হইয়াছে কিনা? গবর্ণমেণ্ট নিজেই ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া দেখুন না কেন? ড্রেণেজ বিলব্যপদেশে অভিমত ব্যক্ত করিতে আদিষ্ট হইয়া বালী-সাধারণী সভা এ সম্বন্ধে লিখেন;—

"It may be mentioned, for example, that the project on the *Kana Nadi* and *Kana* Damodar in the district of Hooghly, for the better drainage of a portion of the district by the Damodar river which cost some Rs70000, proved worse than an utter failure."

অতএব ম্যালেরিয়া নিবারণের নাম করিয়া রুদ্ধস্রোতনদী প্রবাহিত করার প্রস্তাব দেদীপ্যমান ঘটনার বিপরীত। কেননা, তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে করিয়া ম্যালেরিয়ার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাই লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ ঘটনা ও অতীতের অভিজ্ঞতা, এ উভয়েই আমাদের গবর্ণমেণ্ট উদাসীন! নহিলে যাহাতে বার বার অনিষ্টোৎপাদন হইতেছে, তাহাই অতীব ইষ্টকর ভাবিয়া আইন করিতে উদ্যত হইবেন কেন?

নদীস্রোত সর্ব্বদা নৈসর্গিক নিয়মে চালিত হয়; নৈসর্গিক নিয়মে গতি পরিবর্ত্তন করে; খর্ব্ব-বেগ, বিচলিত-প্রবাহ এবং অল্পাধিক পরিমাণে অবরুদ্ধও হয়। মরা নদী, কাণা নদী, এবং পরিবর্ত্তিতস্রোতনদী নৈসর্গিক নিয়মের অবস্থারই ফল। এ কথা ছোট লাট বাহাদুর অবশ্যই স্বীকার করেন। তিনি নিজেই তাঁহার উপরোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন;—

"The destruction of these rivers might be partly due to a change in the coast elevation, which some geologists believe to be rising in the east, so that rivers, such as the Bhorab, Kobadak &c which used to flow eastwards now flowed south or south-west. এই সকল নদীর ধ্বংসের আংশিক কারণ উপকূলের উচ্চতা বৃদ্ধি। কোন কোনও ভূতত্ত্ববিদের বিশ্বাস, এই উচ্চতা পূর্ব্বাদিকপ্রসারী, পূর্ব্বাভিমুখে উত্থিত। অতএব ভৈরব, কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদ যাহারা পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত ছিল, তাহারা এখন দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিয়াছে।"

লাট সাহেবের এই উক্তিতে তাঁহার বক্তব্য বিষয় তাদৃশ স্পষ্ট ও পরিস্ফুট না হইলেও, অন্ততঃ ইহাতে এতটা বুঝা যাইতেছে যে, নৈসর্গিক ঘটনায় নদী-প্রবাহ পরিবর্ত্তিত, অবরুদ্ধ হয়, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষের ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে বা কৃত্রিম উপায়ে নৈসর্গিক ক্রিয়া সম্যক্ রূপে নিবারণ করা সম্ভবে কি? এবং তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করা সকল স্থলে আদৌ উচিত কি? স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম এবং শিল্পের কৃত্রিম কৌশলে তাহা বিচলিত করিবার প্রয়াস পাইলে, জীব জগতে স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্যই কি উৎপন্ন হয় না? তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের যে সমূহ সম্ভাবনা, তাহা আমরা সংঘটিত ঘটনা বিবৃত করিয়া ইতাগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি; প্রদর্শন করিয়াছি যে, নদী-প্রবাহের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সহিত

যুদ্ধ করিতে যাইয়া বঙ্গে ও বিহারে অস্বাস্থ্যেরই সঞ্চার হইয়াছে। পরন্তু, এখন বিবেচনা করিতেছি এই যে, নদ নদীর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন, সবল বা বক্রগতি, বার্দ্ধক্য বা মৃত্যু নিবারিত ও নিয়মিত করিতে যাইয়া তাহাতে সিদ্ধ-কাম হওয়ার আদৌ কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা? রাজ ভাণ্ডারে এবং রায়তের কুটীরে কত অর্থ সঞ্চিত আছে, সমগ্র দেশের ধনধান্যেরই বা পরিমাণ কি যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই অমানুষিক কার্য্য সাধনার্থে উদ্যত হইয়াছেন? সমগ্র দেশের প্রতিবৎসরের পথকর ও পূর্ত্তকরে এত কালের মধ্যে বঙ্গদেশের গ্রাম্য পথ ও পুষ্করিণী গুলার আংশিক সংস্কারও হইয়া উঠিল না, আর নর্দ্দমা-করে নদ নদী খনন সঙ্কুলন হইতে পারিবে, ইহা আমরা কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র বা মাদক দ্রব্য-সঞ্জাত তন্দ্রার সহায়তা ব্যতীত কিরূপে প্রত্যয় করিতে পারগ হই। ড্রেণেজ থিওরির আবিষ্কারক স্বয়ং রাজা দিগম্বর মিত্র, এবম্বিধ কার্য্যের, ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কার্য্যের কল্পনায় প্রতিবাদ করিয়া কি বলিয়াছিলেন? নদ নদী খনন বা তাহাদের গতি পরিবর্ত্তন ত বহু দূরের কথা, পয়োনালীর সম্যক্ সংস্থাপনও এ দেশের নৈসর্গিক অবস্থায় অসম্ভব, বহুব্যয়ের অসাধ্য এবং অনেক স্থলে অনাবশ্যক বলিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন এবং তাঁহার কথা তখনকার কাউন্সিলে গ্রাহ্যও হয়। ড্রেণেজ ও ইরিগেসন বিলের সময়, তিনি এ প্রকৃতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও তাহার মূল্য তদনুরূপ আছে এবং এসময়ে তৎপ্রতি সাধারণের বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন;—

"Now, referring to the report, he found that Mr Adley had made mention of nearly a dozen conditions under which miasm, whatever might that be, but which was said to be the germ of the epidemic fever, was generated, and none of them was removeable except by complete drainage both surface and subsoil, which the geological formation of the country could not possibly admit of at *any expenditure of of money* even if the same were both comming."

কিন্তু নদী-প্রবাহ পরিষ্কৃত ও প্রবলীকৃত এবং নদী-মুখ উন্মুক্ত করিলেই যে দেশের ড্রেণেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্বরজ্বালা কমিবে, এ তত্ত্ব, আমাদের শাসনকর্ত্তা কোথায় পাইলেন? ১৮৬১ সালের এপিডেমিক কমিসন অন্যান্য কথার সহিত প্রসঙ্গ ক্রমে ইহার একটু উল্লেখ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, এ তথ্যের অর্থাৎ পরিবর্ত্তিতগতি ও অবরুদ্ধপ্রবাহ নদী সংক্রান্ত সমস্যার প্রত্যক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষক ও প্রধান মুখপাত্র রাজা দিগম্বর মিত্র উহা স্বীকার করেন নাই, তিনি উহার বিপরীতই বলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ এপিডেমিক ড্রেণেজ মিনিটে লিখিয়াছিলেন এবং তাহার পর পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে,—

"An obstruction occurring in any one of these conduits must interfere with the drainage and its effects are felt more or less according to the proximity or remoteness of the obstruction from the scene of its influence. Accordingly it has been found, as will be noticed more particularly hereafter, that the *stoppage of the mouths of the different streams has not been productive of such serious consequences* to the villages lying within their influence as when the same occurred more in the vicinity of those villages."

দিগম্বর মিত্র তাঁহার মেলেরিয়া মিনিটে স্বয়ং উদ্ভাবন করিয়া ও উদ্যোগী হইয়া ড্রেণেজের প্রস্তাব করেন, সেই মিনিটেই তাহার পরীক্ষার ফল বিবৃতি কল্পে প্রসঙ্গ ক্রমেই উহা লিখিয়া গিয়াছেন, কাহারও কথার প্রতি-

*The italics are ours.

বাদ করিবার জন্য উহা লিখেন নাই। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষার ও ১ম এপিডেমিক কমিসনের কার্য্য ব্যপদেশে যাহা বুঝিয়াছিলেন, স্পষ্টভাষাতেই তাহা উপরোক্ত উক্তিতে ব্যক্ত। ব্যক্ত যে, নদী মুখ রুদ্ধ হইয়া গ্রাম্য ড্রেণেজের সুতরাং স্বাস্থ্যের তাদৃশ ব্যাঘাত করে না, অপেক্ষাকৃত অদূরবর্ত্তী পয়োনালী অবরুদ্ধ হইয়া তাহার যাদৃশ বিষম অনিষ্ট ঘটায়। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল দিগম্বর মিত্র এই কথা লিখিয়াছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে সরকারী ও বেসরকারী কি তথ্যানুসন্ধান হইয়াছে, যাহাতে করিয়া এখন দিগম্বর মিত্রের কথার অন্যথা হইয়া তাহার বিপরীত কার্য্য সমর্থিত হইতে পারে? বেঙ্গলগবর্ণমেন্ট ইহার কোনও উত্তর দিতে পারেন কি?

দিগম্বর মিত্র বলিতেছেন, অবরুদ্ধ মুখনদী গ্রাম্য ড্রেণেজের—অতএব জন সাধারণের স্বাস্থ্যের অব্যবহিত বা ঐকান্তিক অন্তরায় নহে। অথচ ইনিই ড্রেণেজ থিওরির প্রথম প্রবর্ত্তক এবং সংক্রামক মহামারীর কারণ নির্ণয় কল্পে, পরিবর্ত্তিতপ্রবাহ নদী-সংক্রান্ত সমস্যার সম্ভবতঃ আদি উদ্ধারক! কিন্তু, দিগম্বর মিত্র প্রবর্ত্তিত ড্রেণেজ প্রস্তাবটী কিরূপ, এস্থলে পাঠকের অবগত হওয়া আবশ্যক। পুরাতন তথ্য অজ্ঞাত থাকিলে, নূতন সমস্যার সমালোচনা সম্ভবে না। অতএব রাজা দিগম্বর মিত্রের অতি প্রসিদ্ধ ড্রেণেজ থিওরি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

এপিডেমিক কমিসনের বহু পূর্ব্বে দিগম্বর মিত্র, কাশিমবাজার নগরে অবস্থিতি কালে, তথাকার সংক্রামক জ্বরের কারণ নির্ণয়কল্পে মনোযোগ প্রদানকরেন। কাশিমবাজার প্রভৃতি নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক সংস্থান এবং কৃত্রিম উপায়ে তাহার পরিবর্ত্তনের পর হইতে তথায় সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব, তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। তিনি স্থানীয় অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও চিন্তা দ্বারা তথাকার জ্বরের কারণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, প্রথমতঃ এপিডেমিক কমিসনে, তদীয় ইংরেজী মিনটে তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ম্যালেরিয়া-জাত সংক্রামক জ্বর এ দেশে নেহাত নূতন নহে। মধ্যবঙ্গে উহা সঞ্চারিত হইবার বহু পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গের কাশিমবাজার, চুণাখালি প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ জনপদ তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহারও বহু পূর্ব্বে, বঙ্গের পুরাতন রাজধানী গৌড় নগর অতি সম্ভবতঃ ঐ জ্বরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। গৌড় নগরে এই জ্বর বহুদিন স্থায়ী হইয়া ভীষণ মহামারী উপস্থিত করাতে রাজধানী টণ্ডা নগরে অন্তরিত হয়। জাহ্নবীর জলপ্লাবন হইতে নগরের রক্ষার জন্য গৌড়ের পূর্ব্ব সীমা শিলাময় এক অতি সুন্দর সেতু দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এই সেতু বা বাঁধের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি উক্ত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে। দিগম্বর মিত্রের বিবেচনায় গৌড়নগরের ঐ সেতু স্বাভাবিক পয়োনালীর ব্যতিক্রম করিয়া নগরের অবাধ বারি নিঃসরণের ব্যাঘাত করাতেই ভূমির উপরিভাগ ও ভূমি—নিম্নস্থ মৃত্তিকা (Subsoil) ক্রমাগত জলসিক্ত ও অস্বাভাবিক শৈত্যে দূষিত হয় এবং তাহা হইতে ম্যালেরিয়া উৎসারিত হইয়া সংক্রামক জ্বর রোগে গৌড়-নগর অচিরাৎ উৎসন্ন করে। তাহার পর কাশিমবাজার প্রভৃতি নগরের সংক্রামক জ্বরের কারণ সম্বন্ধে তিনি উপরিউক্ত মিনিটে লিখেন;—

"চুণাখালি, ভাটপাড়া, কাশিমবাজার, কালকাপুর,

বামনঘাটা এবং কল্লাসডাঙ্গা গ্রাম পূর্ব্বে ভাগিরথী বা হুগলী নদীর একটী বাঁকের উপর অবস্থিত ছিল, ৬০ বৎসর অতীত হইল এই বাঁক কাটিয়া ভাগীরথীকে সরল স্রোতে পরিণত করত পথ সোজাকরা হয়। সুতরাং তদ্বারা এই নদী প্রবাহের প্রাকৃতিক গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং উপরোক্ত স্থান সকল নদী-তীর হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই শিল্পনৈপুণ্য বা কৌশলময় এঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যের অব্যবহিত পরেই ঐ সকল স্থানে সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরের প্রকোপ, পীড়ন এবং তজ্জনিত ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদিগের অসংখ্য মৃত্যু, কেবল এক গৌড় নগরের মহামারী ব্যতীত, বাঙ্গালার ব্যাধি-বিপত্তির ইতিবৃত্তে অতুলনীয়। এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব কালে মৃত দেহের অগ্নি সৎকার করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, প্রত্যহ এতই লোক মরিত যে মৃতদেহ গাড়ি বোঝাই দিয়া কোনও প্রকারে নগরের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে কাসিমবাজার নগর, যে কাসিমবাজার এক সময়ে বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে এতাধিক অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীসম্পন্ন ছিল যে, তাহার অৎ আদান প্রদানের নিত্য আবশ্যকতা পরিপূরণার্থে তথায় একশত শরফ বা বাণিজ্য ধনাগার অর্থাৎ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল—সেই কাসিমবাজার পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে এই সাংঘাতিক জ্বরের মহামারীতে প্রায় মরুক্ষেত্রে পরিণত হয়!"

"এই জ্বর অদ্যাবধি কাসিমবাজারে বিদ্যমান আছে। অতএব এই জ্বরের কারণও অদ্যাবধি তথায় বিদ্যমান। একটী ভিন্ন,অন্য আর কোন বিষয়েই কাসিমবাজার বঙ্গের কোনও স্বাস্থ্যকর সহর হইতে বিভিন্ন নহে। উহার বারি, বৃক্ষাদির উৎপত্তি, উহার গৃহ এবং অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী, অবিকল বঙ্গের অন্যান্য স্থানেরই সদৃশ; কিন্তু, কেবল একটী বিষয়ে কাশিমবাজার বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মত নহে। তথাকার বায়ু সর্ব্বদাই—বৎসরের বারমাসই সর্দ্দির শৈত্যময়। গ্রীষ্মকালেও তথায় এই সর্দ্দি-শীতলতার আতিশয্য। সে এতাদৃশ যে, এক দিনের জন্যও তথায় কেহ যাইলে উহা উপলব্ধি করিয়া আশ্চর্য্য হয়েন; কারণ,বাঙ্গালার কোণায়ও আর অমনটী নাই। কাশিমবাজারের এই সর্দ্দি-সিক্ততা কেবল তাহার মধ্যস্থ মৃত্তিকার অত্যধিক আর্দ্রত্ব হইতেই উদ্ভূত হইতে পারে; এবং তথায় নিম্ন মৃত্তিকার এই আর্দ্রতা, স্বাভাবিক পয়ঃনালীর ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম জনিতই ঘটিয়াছে; পরন্তু, এই ঘটনা ও প্রাকৃতিক পয়োনালীর ব্যতিক্রম, অতি সম্ভবতঃ উপরিউক্ত কৃত্রিম উপায়ে ভাগিরথীপ্রবাহের পরিবর্ত্তন জনিতই ঘটে। নদী স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা এবং (হইতে পারে) নগরের পয়োনালী প্রতিরোধক কতকগুলি রাজপথ দ্বারা ঐ স্থানের জল নিকাসের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হওয়াতে ভূপৃষ্ঠ ক্রমাগত জলসিক্ত হইয়া নিম্ন মৃত্তিকা অত্যার্দ্র এবং তাহাতে করিয়া ম্যালেরিয়ার বীজ সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। প্রকৃতির কি প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমে এইকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে,এত কাল পরে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ এস্থলে তাহার তত প্রয়োজনও নাই। ইহাই প্রচুর যে এই স্থানটী অতিশয় সর্দ্দিযুক্ত এবং আর্দ্র। উহার অত্যধিক আর্দ্রতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, এবং আমি বিবেচনা করি,ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, ঐ আর্দ্রতা নিম্ন মৃত্তিকার মজ্জাগত অতিরিক্ত সর্দ্দিসিক্ততা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।'

এ দেশের ড্রেনেজ তত্ত্বের প্রধান পুরোহিত রাজা দিগম্বর মিত্রের ড্রেণেজ মতের মূল এই।—১ম, এপিডেমিক কমিসনে এই মতই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এবং তাহার পর ড্রেণেজের পক্ষপাতী বড় বড় পণ্ডিত ও রাজপুরুষদিগের নিকট উহা গৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে। এক কথায়, দিগম্বর মিত্রের মতে, যে কোনও কারণেই হউক, কোনও জনপদের স্বাভাবিক পয়োপ্রণালীর অবরোধ হইলে, তাহার উপর আঘাত হইলে, তাহার ব্যতিক্রম বা বিচলন হইলে,তথাকার নিম্ন মৃত্তিকাঅত্যার্দ্র হইয়া সংক্রামক জ্বরবীজ জনন করে। জ্বরবীজ বা ম্যালেরিয়া শব্দটী মিত্রজ মহাশয় বড় ব্যবহার করেন নাই। তিনি মৃত্তিকার অত্যার্দ্রতা জনিত জ্বর মাত্র অঙ্গীকার করিয়া

গিয়াছেন। যাহা হউক, স্বাভাবিক পয়োনালীর ব্যাঘাত এবং তাহার পুনঃ সংস্থাপনই তাঁহার মতের মূল সূত্র। কিন্তু, সেই ব্যাঘাতের যে সকল পরিদৃশ্যমান কারণ পরম্পরা তিনি নির্ণীত ও প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন এবং যে কারণ পরম্পরা বহু বিজ্ঞ ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা এতাবৎ কাল স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা অন্তরিত করার পরিবর্ত্তে, উপস্থিত ড্রেণেজ অনুষ্ঠানে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বরং তাহাই বর্দ্ধিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। কিরূপে, আমরা কিঞ্চিৎ পরে দেখাইব। এস্থলে কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাস্য যে,নদী-প্রবাহ প্রবল ও বেগবান্ করিবার অভিপ্রায়ে,তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্কার কল্পে, স্রোতের স্বাভাবিক গতি বা পথ পরিবর্ত্তিত করিয়া অনেকস্থলে প্রাকৃতিক পয়োনালী প্রতিরোধ করিবে না,তাহার প্রমাণ কি, তাহার প্রতিভূ কে?

সাধারণতঃ মধ্যবঙ্গের ম্যালেরিয়া নিপীড়িত স্থান নিচয়ের পয়োনালী ও তাহার অবরোধ সম্বন্ধে দিগম্বর মিত্রের মত এই;—

"সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত নিম্ন বঙ্গের অন্যান্য সকল গ্রামের প্রাকৃতিক পয়োনালীর প্রথা বা প্রকরণ এইরূপ যে, গ্রামের জল প্রথমতঃ তাহার নিকটবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্র নিচয়ে যাইয়া পতিত হয়, কারণ সচরাচর সকল গ্রামেরই "গড়ান" তন্নিকটবর্ত্তী ধান্য ক্ষেত্রের অভিমুখে। গ্রামের জল প্রথমতঃ ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়ে; তথা হইতে সেই জল বিলে যাইয়া জমা হয়। পরন্ত, বিল হইতে সেই জল খাল দিয়া নদীতে যাইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী এই জল লইয়া বৃহত্তর নদীতে যাইয়া পতিত হয়। এই সকল পয়োনালীর কোনও একটীর অবরোধেই জল নিকাসের বাধা জন্মে; এবং অবরোধের দূরত্বের বা নৈকট্যের অনুপাতানুসারে তাহার কুফল অনুভূত হয়। অর্থাৎ গ্রাম্য জল অপেক্ষাকৃত দূরে যাইয়া পতিত হওয়ার পর যদি কোথাও জলনালীর অবরোধ ঘটে তাহাতে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে না; যাদৃশ মহানিষ্ট ঘটে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থলে জলনালীর অবরোধ ঘটিলে। অতএব ইহা দেখা গিয়াছে যে,ভিন্ন ভিন্ন নদী-মুখ রুদ্ধ হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের তাদৃশ অনিষ্ট সাধন করে নাই, গ্রাম সকলের অনতিদূরবর্ত্তী স্থলে জলনালী বদ্ধ হইয়া তাহার যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছে।

"প্রধানতঃ রাজপথ দ্বারা এবং অংশতঃ মৎস্য ধরিবার জন্য খাল অবরোধক বাঁধ দ্বারা গ্রাম্য জলনালী রুদ্ধ হইয়াছে। উন্নত-শরীর ইষ্টক বা মৃত্তিকাবর্ত্ম ইদানীং এমন সকল স্থান ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে যে,সকল স্থলে পূর্ব্বে জল নিকাসের স্বাভাবিক পথ ছিল। সে পথ বদ্ধ, সুতরাং গ্রাম্য জল আর অবাধে বাহির হইতে পারে না। গ্রামের মধ্যে তাহা বদ্ধ থাকিয়া নিম্ন মৃত্তিকা আর্দ্র ও গ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্য হানি করে। পরন্ত, মৎস্য ধরিবার বাঁধ খালের স্রোত রুদ্ধ করিয়া গ্রাম্য বারির দূর নিঃসরণে বাধা জন্মায়।"

"বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরভূমি স্বভাবতঃই উচ্চ সুতরাং ভাগিরথীতীর হইতে গ্রাম সকলের জল নিকাসের পথ নদী তীরের বিপরীত অভিমুখে। অতএব ত্রিবেণী হইতে নোয়াসরাই পর্য্যন্ত গ্রাম সমূহের এবং নদীতীর হইতে দূরে অবস্থিত আরও অনেক গ্রামের জল নিকটস্থ ধান্য ক্ষেত্র দিয়া ঝিনুক খালির খাল বহিয়া কুন্তী নদীতে যাইয়া পতিত হইত। ঝিনুক খালির খালে উৎকৃষ্ট বালু জন্মে। সে বালু অট্টালিকাদির প্রলেপ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ঝিনুক খালির খালে বালু উত্তোলন প্রক্রিয়ায় উপরিস্থ মৃত্তিকা রাশি খালে ধৌত হইয়া পড়িয়া ক্রমে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার প্রবাহের হ্রাস করিয়া জল স্রোতের কিঞ্চিৎ অবরোধ ঘটায়; পরন্ত,নোয়াসরাই খাল নামক কুন্তী-নদীর মুখ পলি পড়িয়া কয়েক বৎসর যাবৎ অবরুদ্ধ হইয়াছে। বর্ষার পর তথায় আর নৌকা চলে না। এই দুই কারণে জল নিকাসের কতক ব্যাঘাত ঘটিলেও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসীদিগের কিছুমাত্রও স্বাস্থ্য হানি হয় নাই। কেননা তদ্দ্বারা গ্রাম্য জলনালীর অব্যবহিত অবরোধ ঘটে নাই। কিন্তু, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাবু মধুসূদন নন্দী মগরা হইতে নোয়াসরাই পর্য্যন্ত এক রাস্তা বাঁধাইয়া দেন। এই রাস্তার মধ্যে কোথায়ও জল নিঃস-

যণের জন্য সেতু নির্ম্মিত হয় নাই, পরন্তু এই রাস্তা উপরোক্ত গ্রাম সকলের জল প্রণালী বহুস্থলে রোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল কি হইয়াছে? ফল হইয়াছে এই যে, এই রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় এক বা দুই বৎসর মধ্যে ঐ সকল গ্রামে যুগপৎ সংক্রামক জ্বর ডাকিয়া উঠিয়াছে। পুনশ্চ, ত্রিবেণী হইতে মগরা পর্য্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা উচ্চ ও পাকা করিয়া বাঁধার পর হইতেই জয়পুর, বাগাটী ও অন্যান্য গ্রাম সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। এই শেষোক্ত রাস্তাতেও জল নিঃসরণার্থে সেতুপথ নাই। এই রাস্তা পূর্ব্বে যখন কাঁচা ছিল, এবং গ্রাম্য জলনালীর সহিত সমতল ছিল, তখন গ্রাম্য জল অবাধে যাইয়া কুন্তীতে পড়িত, সুতরাং জ্বরজ্বালা ছিল না।"

"রাজহাট হইতে দ্বারবাসিনী পর্য্যন্ত এক রাস্তা হইয়া জল নিকাসের পথরোধ করতঃ দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রামে ভীষণ সংক্রামক জ্বর আনয়ন করিয়াছে। আমি নিজে "সারেজমিনে" উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শনে ও তদন্তানুসন্ধানের দ্বারা এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। পুনশ্চ অঞ্জনা নদীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এই মরা নদী এক সময়ে বিলক্ষণ বহতা ছিল। ইহার প্রবাহে নৌকা চলিত এবং সে প্রবাহ মাতাভাঙ্গা নদীতে যাইয়া মিশিয়াছিল। অঞ্জনা কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম নিচয়ের সলিল বহন করিত। কিন্তু, ১৪ বৎসর যাবৎ অঞ্জনার দুই মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়াতেও তাহার তীরস্থ নিকট বা দূরবর্ত্তী কোন গ্রামেরই স্বাস্থ্য হানি হয় নাই, সংক্রামক জ্বর কোথায়ও প্রবেশ করে নাই। কিন্তু, গত দুই বৎসর মধ্যে কৃষ্ণনগরের বড় বাজার হইতে লালবাগান পর্য্যন্ত এক কাঁচা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়া বারুই পাড়ার জল নিকাসের পথরোধ করিয়াছে। সুতরাং তাহার পর হইতেই বারুইপাড়া গ্রামে ভয়ঙ্কর সংক্রামক জ্বর ডাকিয়া উঠিয়াছে।

"এইরূপে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল-পথ, এবং উহার পরিপোষক পাকা ও কাঁচা রাস্তা সকল, ভাগিরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের তথা নদী তীরের দূরবর্ত্তী এবং এই রেল পথের পশ্চিম পার্শ্বস্থিত গ্রাম সকলের জল-প্রণালী অবরোধ করিয়াছে। কারণ, আমি ইহা পূর্ব্বেই সূচিত করিয়াছি যে, ভাগিরথীর পূর্ব্ব তীরস্থ গ্রাম সকলের জল নিকাসের পথ পূর্ব্বনিম্নাভিমুখী। সুতরাং চাকদহ, কাঁচড়া পাড়া, হালিসহর প্রভৃতি এবং তদনুরূপ অবস্থিত আরও বহু সংখ্যক গ্রাম সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরে উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে।

"এ দেশের ভূমি সম্পূর্ণ রূপে সমতল। সুতরাং জল-প্রবাহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ব্যাপিয়া ক্রমনিম্নাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তজ্জন্য বক্রগামী রেল পথও অন্যবিধ রাজ পথ সকল ইহার মধ্য ভেদিয়া যদৃচ্ছা নির্ম্মিত হওয়াতে অগত্যা তদ্দ্বারা স্বাভাবিক পয়োনালী নিচয় রুদ্ধ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এই উভয় রেল পথেই, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় বটে যে, জল নিঃসরণার্থ বড় বড় সেতুপথ আছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা ছোট বড় খাল ও নদী প্রবাহ, গ্রাম্য জল গ্রহণের স্থান মাত্র, নিঃসরণের পথ নহে। সুতরাং দেশবাসী এই সকল বর্ত্ম গ্রাম্য জল নিঃসরণের একান্ত অন্তরায়।

গ্রাম্য ড্রেণেজের ঐকান্তিক পক্ষপাতী এবং আমূল সমর্থক রাজা দিগম্বর মিত্রের উপরোক্ত অভিমত হইতে কি প্রকাশ পাইতেছে? প্রকাশ হইতেছে, মোটের উপর দুইটী তত্ত্ব। প্রথম নদী প্রবাহের অবরোধে বা প্রশমিত স্রোতোবেগে কোথাও স্বাস্থ্যের হানি নাই। দ্বিতীয়,—যদৃচ্ছা নির্ম্মিত রেল পথ ও রাজপথ দ্বারা গ্রাম্য জল নিকাসের অব্যবহিত ও স্বাভাবিক পথ অবরুদ্ধ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অপরিসীম অনিষ্ট সাধন করিয়াছে: দেশে সাংঘাতিক সংক্রামক জ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। গতাসু রাজা সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা এই দুই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার পর এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কেহই এই দুই সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা উহা খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন (দৃষ্টান্ত স্থলে ডাক্তার লেথব্রিজ প্রভৃতি) তাঁহারাও কেহ এমন বলেন নাই যে, নদী-স্রোতের সংস্কার করিলে এ দেশীয় লোক সংক্রামক জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

লোকের ঐকান্তিক অন্নকষ্ট ও উপবাস নিবারিত করাই এপিডেমিকের মস্তকে আঘাত করার সর্ব্বপ্রধান উপায়। সে সকল কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। এখন রাজা দিগম্বর মিত্রের মতানুসারেও যদি ড্রেণেজ করিতে হয়, তাহা হইলে, নদী স্রোত সংস্কারের উদ্যোগ করিতে হয় না। রেলপথ ও অসংখ্য রাজপথের অবরোধ যথা সম্ভব উন্মুক্ত করিয়া দেশের স্বাভাবিক জলনালী প্রকৃতিস্থ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ছোট লাট বাহাদুর তাহাতে একান্ত উদাসীন, সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষাবান্। তিনি প্রমাণিত কারণ অবহেলা করিয়া, যাহা আদৌ কারণ বলিয়া অদ্যাবধি প্রতিপন্ন হয় নাই, তাহারই প্রতিকারে অভিলাষী, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তিনি রেলপথ ও রাজপথের বিভ্রাট একেবারেই অস্বীকার করেন, কারণ, তাহা স্বীকার করিলে, বোধ হয়, ড্রেণেজের জন্য রেলওয়ে কোম্পানির উপর কর বসাইতে এবং রাজকোষ হইতে অর্থ দিতে হয়। কিন্তু এ উভয়ই অতি সঙ্কটজনক কার্য্য, সুতরাং তিনি নদীস্রোতের উপর লোকের স্বাস্থ্য সংস্থাপন করিয়া একটী অভিনব কৃষিকরের আইন করিতে উদ্যত, ইহা অগত্যাই লোকে সন্দেহ করিতেছে।

কাঁচাপাকা রাস্তা ও রেলপথে পয়োনালীর অবরোধ কেবল যে দিগম্বর মিত্রের ব্যক্তিগত অভিমত, তাহা নহে। এ তথ্য তৎকর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু, স্বীকৃত ও সমাদৃত হইয়াছিল বহু বহুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের দ্বারা—১ম, এপিডেমিক কমিসন ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাৎকালিক বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স ইহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। পরন্তু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গাধীপ স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dr. Pettenkoffer এবং চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট" ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রথম এপিডেমিক কমিসনের অভিমত আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি। লর্ড লরেন্সের কথা কয়েকটী এই —

"The only new cause suggested by the native member of the Commission, Babu Digambar Mitra, as probably increasing the dampness, which the Commission considered to be the main source of the disease, was the obstruction to drainage by railways and roads and shutting up of outlets into rivers."

কিন্তু যাহা বড় বড় লোকে গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, যাহা চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং তত্ত্বদর্শী লোকে মানিয়াছেন, যাহা স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও লাট লরেন্স স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করেন কেবল আমাদের এখনকার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর চার্লস এলিয়ট।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

আত্মার অস্তিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত্ব।*

সুখ দুঃখাদি সমবায়িকারণ আত্মা। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশ আত্মার গুণ। আত্মা বিভু অর্থাৎ ব্যাপনশীল, অহঙ্কারের আশ্রয় অর্থাৎ অহংজ্ঞানের বিষয়, মনোমাত্রের গোচর

* এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটী সাহিত্য সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করিতে অস্বীকার করায় নব্যভারতে দেওয়া হইল।

অর্থাৎ চাক্ষুষাদি ষড়্বিধ প্রত্যক্ষের মধ্যে কেবল মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। রথগতি দর্শনে সারথির বিদ্যমানতা যেরূপে অনুমিত হয়, প্রবৃত্ত্যাদি দ্বারা আত্মা সেইরূপ অনুমেয়।

যদিও "আমি জানি" "আমি সুখী" ইত্যাদি প্রত্যয় দ্বারা সকলেই আত্মার মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তথাপি যে সকল বিপ্রতিপন্ন ব্যক্তিরা "দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই," "মানবের সুখ, দুঃখ আকস্মিক" ইত্যাদি বহুপ্রকার প্রলাপ বাক্য ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রতীতির নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধে আত্মার অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও জন্মান্তর পরিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাইতেছে।

আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ও পরম্পরা সম্বন্ধে শরীরের চৈতন্য সম্পাদক। যেমন ছেদাদি ক্রিয়ার করণ অর্থাৎ সাধন, কুঠারাদি বিদ্যমান থাকিলেও কর্ত্তা ব্যতীত ছেদাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না; সেইরূপ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্যমান থাকিলেও, কর্ত্তা ব্যতীত দর্শন, শ্রবণাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানের করণ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বিদ্যমানতা দেখিয়া তাহাদের অধিষ্ঠাতা (কর্ত্তা) এক অতিরিক্ত আত্মার অনুমান করিতে হইবে, অর্থাৎ আত্মা কর্ত্তা, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ করণ ও দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান ক্রিয়া।

এ স্থলে কোন কোন তার্কিক এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, চক্ষুঃ কর্ণাদি করণ ও দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা কেহ আছেন, না হয় অগত্যা স্বীকার করা গেল; কিন্তু সেই কর্ত্তা শরীর-মন বা ইন্দ্রিয়গণ ইহাদের মধ্যে কেহ হইবেন, আত্মা নামক অতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, তাহাদের এই তর্কের মূলে কোন যুক্তি নাই।

শরীর আত্মা নহে। যদি শরীর চেতন হইত, তাহা হইলে মৃতব্যক্তির শরীর বিদ্যমান আছে, অথচ চৈতন্য নাই কেন? (১) যদি কেহ বলেন, প্রাণবায়ুর বিনির্গমন বশতঃ শরীরে চৈতন্যের অভাব হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বে অবয়বের উপচয় ও অপচয় বশতঃ শরীরের উৎপাদ বিনাশশালিত্ব হেতু বাল্যকালে বিলোকিত পদার্থের বৃদ্ধকালে কিরূপে স্মরণ সম্ভব হয়? শরীরাবয়বের প্রতিক্ষণ বৃদ্ধি ও ক্ষয় হেতু শরীর প্রতিক্ষণ বিনষ্ট ও উৎপন্ন হইতেছে, অতএব শৈশবে যে সকল পদার্থ দর্শন করিয়াছিলাম, এখন বৃদ্ধকালে তাহার স্মরণ কিরূপে সম্ভবিত হয়; কেননা যে শরীর বাল্যকালে পদার্থ দৃষ্টি করিয়াছিল, অবয়বের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হেতু সে শরীর বহুপূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছে ও নূতন শরীর

উৎপন্ন হইয়াছে। দ্রষ্টা ও স্মর্ত্তা একই ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক, পূর্ব্ব শরীর কোন পদার্থ দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু নূতন শরীর সে পদার্থ স্মরণ করিবে, এ কিরূপ ন্যায়? (২) যদি কেহ বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরোৎপন্ন সংস্কার সকল পরপরবর্ত্তী শরীরে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করা যাইতে পারে যে, এরূপ অনন্ত সংস্কার কল্পনায় যুক্তির গৌরব দোষ উপস্থিত হয়, আর বাসনার সংক্রমও হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে মাতার বাসনা পুত্রে সংক্রমিত হইত। (৩) ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণই দর্শন শ্রবণাদির ক্রিয়ার একাধারে করণ ও কর্ত্তা, অর্থাৎ চৈতন্য ইন্দ্রিয় সমূহেই বিদ্যমান আছে, এরূপ কথা বলা অসঙ্গত, কেননা কোন ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলে তদিন্দ্রিয় জনিত অনুভবের স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চক্ষুর নাশ হইল, অথচ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ হইতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এ স্মরণ কে করিতেছে? অবশ্যই যে অনুভব করিয়াছিল, সেই স্মরণ করিবে কিন্তু অনুভবিতা চক্ষুরিন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই। অপর কাহা কর্ত্তৃক স্মরণও সম্ভবপর নহে, কারণ স্মরণ ও অনুভবের সামানাধিকরণ্য হেতু পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধ। অনুভব করিয়াছিলেন গোবর্দ্ধন, স্মরণ করিলেন হরিহর, তাহা সম্ভব নহে। অবশ্যই ইন্দ্রিয়গণ ব্যতিরিক্ত কোন আত্মা আছেন, যিনি মন ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থ দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে চক্ষুর নাশ হইলে তৎপদার্থের স্মরণ করিতেছেন।

মনও আত্মা নহে। জ্ঞানসুখাদি মনের ধর্ম্ম বা গুণ হইলে আমরা জ্ঞানসুখাদি অনুভব করিতে পারিতাম না। "ত্বঙ্মনঃ সংযোগো জ্ঞানসামান্যেকারণং" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে সময়ে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত রূপের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ ও মনের সংযোগ হইয়া দর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ হইলেও মনঃ সংযোগাভাবে শ্রবণ উৎপন্ন হয় না। যদি মন মহৎ, বিভু বা ব্যাপনশীল পদার্থ হইত, তাহা হইলে যখন মন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া দর্শন জ্ঞানোৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণ জ্ঞানোৎপাদনেও ব্যাপৃত থাকিতে পারিত। তাহা হইলে যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত। কিন্তু সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনও স্বীকার করিয়াছে যে, এককালে দুই বিষয়ে মনঃ সংযোগ করা যায় না। জ্ঞান সকলের যুগপৎ অনুপপত্তিহেতু মন মহৎ, বিভু বা ব্যাপনশীল পদার্থ নহে, সুতরাং মন অণু পদার্থ। অণু পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব মনেরও প্রত্যক্ষ অসম্ভব। যদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা হইলে জ্ঞানসুখাদি মনের গুণ সমূহও অপ্রত্যক্ষ হইবে, অর্থাৎ চাক্ষুযাদি মানস পর্য্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না। আমাদের মতে মন ব্যতীত এক স্বতন্ত্র ব্যাপনশীল আত্মা আছে, জ্ঞান সুখাদি উঁহারই গুণ, মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান সুখাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়।

উপরি লিখিত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গণ ইহাদের কেহই আত্মা নহে, অতএব এক অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি কোন নাস্তিক চক্ষুবাদি করণ আত্মরূপ কর্ত্তা ব্যতীত

দর্শনাদি ক্রিয়া নিষ্পাদনে অসমর্থ দেখিয়া চক্ষুরাদির করণত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞান সমষ্টিই আত্মা, সুখদুঃখাদি উহারই আকারবিশেষ বলিয়া অবধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, এ তর্কও যুক্তিসঙ্গত নহে।

জ্ঞানসমষ্টি আত্মা নহে। স্বভাবতই জ্ঞান জন্মিতেছে, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ যথাক্রমে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান সমূহের কারণ বা সাধন নহে, এরূপ যুক্তি যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, স্বভাবত যে জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কি যৎকিঞ্চিৎ বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান? যদি অখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন। আর যদি যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়, তবে কোন বিষয়ের জ্ঞান এরূপ নিয়ামকের অভাব হইয়া পড়ে। কোন ব্যক্তিই কোন বস্তু নিশ্চয়রূপে দেখিতে পাইবেন না, কেননা কোন্ জ্ঞান জন্মিবে তাহার নিশ্চয় নাই। জ্ঞান স্বতঃ প্রকাশ স্বীকার করিলে ঘটাদির জ্ঞান হইবা পড়ে, জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত কোন পদার্থই থাকে না। যদি বল জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, অতএব ঘটও জ্ঞান, তাহা হইলে অনুভূয়মান ঘটাদির অপলাপ করা হয়। যদি বল ঘট জ্ঞানেরই আকার বিশেষ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু কি না? যদি আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু হয়, তাহা হইলে আকারের জ্ঞান হইতে পারে না এবং জ্ঞানব্যতিরিক্তও পদার্থ আছে স্বীকার করা হয়। আর যদি আকার জ্ঞানাতিরিক্ত কিছু না হয়, তাহা হইলে সমূহালম্বনে নীলাকার ও পীতাকার হইয়া পড়ে, কেননা জ্ঞানের স্বরূপতঃ কোন বিশেষত্ব বা বিভেদ নাই। যদি বল অপোহরূপ অর্থাৎ অতদ্ব্যাবৃত্ত (different from what is not that, *i. e.* a blue is that which is different from not blue) নীলত্বাদি জ্ঞানের ধর্ম্ম হউক, অর্থাৎ নীলজ্ঞান হইবার সময় অনীল (পীত, শ্বেত ইত্যাদি) হইতে পৃথক্, এরূপভাবে জ্ঞান হউক, তাহা অসম্ভব কেননা নীলত্ব ও অনীলত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র জ্ঞানে সমাবেশ ব্যতীত, অনীল হইতে পৃথক্ নীল এরূপ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধধর্ম্ম একত্র জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে না। যদি বল নীলত্ব ও অনীলত্ব বিরুদ্ধধর্ম্ম একত্র জ্ঞানে সমাবেশিত হইতে পারে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, নীলত্ব ও অনীলত্ব এরূপ বিরোধ কিরূপে উপপন্ন হইল।

অতএব জ্ঞান সমষ্টি, ইন্দ্রিয়গণ, মন ও শরীরাতিরিক্ত বুদ্ধ্যাদিগুণবান্ ব্যাপনশীল এক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সেই অবিনাশী আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ইহ জন্মে ভোগসাধন দেহ আশ্রয় করিয়াছেন। আবার বর্ত্তমান জন্মের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার দেহান্তর আশ্রয় করিবেন। এরূপে অনন্তজন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহাকে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে না ও তিনি চির নির্বৃতি লাভ করিবেন। কৈবল্যরত্নে উক্ত আছে—

যানি কর্ম্মাণি স নার ফলকে জুনি সপ্তম।
তানি তৎসাধন স্বন দেহমুৎ পারম্ব পূর্ব॥
শরীরারম্ভকং কর্ম্ম যোগিনাং সর্বদাপিবা।
বিনা ফলোপ ভোগেনৈব নশ্যত্য সংশয়ম্॥

হে সত্তম! যে সমস্ত কর্ম্ম সংসার ফল হেতুভূত, তাহারা ফলভোগ সাধন দেহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যোগী বা অযোগী সকলেরই শরীরারম্ভক কর্ম্ম ফলোপভোগ ব্যতীত নিশ্চয়ই নষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন বা ভূয়ঃ ন
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না, ইনি অজ (জন্মশূন্য) নিত্য, ক্ষয় রহিত ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলেও ইঁহার নাশ হয় না। যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন অপর দেহ গ্রহণ করেন।

ভগবান্ মনু স্মরণ করিয়াছেন—

যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি সভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ॥
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥
এতা দৃষ্ট্বাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ॥

যিনি এই শরীরকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা বলে এবং যে কর্ম্ম করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পাঞ্চভৌতিক দেহ বলেন। মনুষ্য শারীরিক পাপদ্বারা স্থাবর যোনি, বাচিক পাপদ্বারা তির্য্যগ্ যোনি ও মানসিক পাপদ্বারা অন্ত্যজাতি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে জীবের যে সকল দশা উপস্থিত হয়, তাহা স্বয়ং অবলোকন করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

কুসুমাঞ্জলিতে, ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট, পরোলোকের হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বা বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ববৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥

যেহেতু প্রত্যেক কার্য্য কারণের সাপেক্ষ, সংসার অনাদি, জগৎ বিচিত্র ও লোকের স্বর্গাদি ফললাভের নিমিত্ত যাগাদিতে প্রবৃত্তি হয়; এবং প্রত্যেক আত্মা স্বকীয় কর্ম্মফল স্বয়ংই ভোগ করিয়া থাকে। অতএব পরলোক সাধন অদৃষ্টনামক অলৌকিক হেতু বিদ্যমান আছে। সংসারের প্রত্যেক কার্য্যই কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ সাপেক্ষ, অকারণে কিছুই উৎপন্ন হয় না। অতএব আমাদের দেহও অকারণ উৎপন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যই এ দেহোৎপত্তির কারণ। যদি বল প্রত্যেক কার্য্যই কারণের উপর নির্ভর করিলে শেষ সীমায় যাইয়া যে কারণে পৌঁছিবে, তাহার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, যখন সংসার অনাদি, তখন ইহার শেষ সীমায় কিছুতেই উপস্থিত হওয়া যায় না। যদি কেবল ব্রহ্ম বা প্রকৃতিই এই সংসারের কারণ হইতেন, তাহা হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র এরূপ বৈচিত্র্য হইল কেন? বিচিত্র কারণ ব্যতীত বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যদি এক ব্রহ্মই সংসারের কারণ হইতেন, অদৃষ্ট নামক অপর কোন কারণ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্ম কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী সৃষ্টি করিয়া বৈষম্য (partiality) ও নৈর্ঘৃণ্য (cruelty) দোষের আস্পদ হইতেন। অতএব এই বৈচিত্র্যের কারণ অদৃষ্ট; আরও দেখ, সংসারের সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বর্গাদি ফলকামনায় যাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যদি স্বর্গ নরকাদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বের লোকের যাগাদিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? বহুকাল পূর্ব্বে যাগাদি ব্যাপারের ধ্বংস হইলেও তজ্জনিত অদৃষ্ট ভোগকাল

পর্য্যন্ত আত্মায় বিদ্যমান থাকে। ভোগের শেষ হইলেই অদৃষ্টের শেষ হয়। প্রত্যেক আত্মা স্বকীয় কর্ম্মের ফল স্বয়ংই ভোগ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জন্মের সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম সম্ভূত অদৃষ্ট আত্মায় বিদ্যমান থাকিয়া মৃত্যুর পর আত্মাকে দেহান্তর আশ্রয় করায়। এই জন্মেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, কেননা

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি"

শতকোটী কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। অতএব এই জন্মের পর জন্ম আছে। ইহার পূর্ব্বেও জন্ম ছিল। অবিনাশী কোন আত্মা বিদ্যমান না থাকিলে,বালকের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকিলে প্রবৃত্তি জন্মে না। জন্মের অব্যবহিত পরে বালকের কোন ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থাকে না, তবে তাহার স্তন্যপানে কেন প্রবৃত্তি জন্মিবে? তাহার অবিনাশী আত্মা জন্মান্তরানুভূত ইষ্টসাধনত্বের স্মরণ করিতেছে বলিয়া প্রবৃত্তি জন্মিতেছে। উদ্বোধকাভাবে জন্মান্তরানুভূত অন্য কিছু স্মরণ করিতে পারিতেছে না। যখন উপযুক্ত উদ্বোধক (Association or Stimulation) উপস্থিত হইবে,তখন তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই বিকাশ হইবে। এখানে জীবনাদৃষ্টকেই স্তন্যপানে প্রবৃত্তির উদ্বোধক বলিতে হইবে। এইরূপে সংস্কারের অনাদিত্ব নিবন্ধন আত্মা অনাদি। অনাদিভাবের নাশ হয় না, অতএব আত্মা নিত্য।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, মহাশয় গত আশ্বিন মাসের সাহিত্যে "একটী পুরাতন বিষয়" শীর্ষক প্রবন্ধে আত্ম নিরূপণের যে অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন,তাহা আমরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তিনি বলেন "পরস্পর-কিয়দংশে-সদৃশ ও কিয়দংশে-বিসদৃশ-রূপে প্রতীত এই জ্ঞান সমূহের যে সমষ্টি, তাহারই নাম অথবা অভিধান, অথবা সংজ্ঞাই আত্মা অথবা আমি।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞান সমূহ কি? ইহারা কিরূপে উৎপন্ন হইল? তিনি বলিবেন, এ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য। স্বতঃ প্রকাশ জ্ঞান সমষ্টি যে আত্মা নহে,তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য এই যে জড়-জগৎ কিরূপে বিজ্ঞান জগতে পরিণত হইল, physical phenomena কিরূপে psychical phenomena হইয়া পড়িল, এ অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন পরিত্যাগ করিলে প্রশ্নের সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে স্বীকারই করিয়া লওয়া হইল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিবেন, রূপ কর্ত্তৃক চাক্ষুষ স্নায়ু অভিহত হইলে, তন্মধ্যস্থিত স্বচ্ছ তরল পদার্থের কম্পন হয় এবং তন্মধ্যে এক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্ক কেন্দ্র বা মস্তকের স্নায়ুকে আঘাত করতঃ দর্শনজ্ঞান উৎপন্ন করে। শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদন, স্পর্শন-আদি জ্ঞানেরও এইরূপে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ক্রমে Sensation (নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান) হইতে perception (বেদনা,) imagination (সংস্কার) conception (সবিকল্প-কজ্ঞান) judgement (পক্কতাজ্ঞান) ও reasoning (যুক্তি অনুমানাদি) ইত্যাদি জটিলতর জ্ঞানের উদ্ভব হয়। কিন্তু স্নায়বিক উত্তেজন nervous stimulation কিরূপে নির্ব্বিকল্পজ্ঞান (sensation) পরিণত হইল, এ জটিলতার ভঞ্জন পদ্ধতি, এখনও বোধহয় সম্যক আবিষ্কৃত হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক পণ্ডিত James Sully) লিখিয়াছেন :—

"This doctrine is known as that of human automatism, the doctrine that we are

essentially nearvous machines with a useless appendage of consciousness somehow added. The doctrine obviously fails to explain why consciousness should appear on the scene at all."

যদি জ্ঞান সমূহকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ভেদজ্ঞান (differentiation), সাদৃশ্যজ্ঞান (assimilation), উদ্বোধক (association) ও ধারণা (retentiveness) ইত্যাদি যত ইচ্ছা ধরিয়া লওয়া হউক, তাহাতে জটিলতার সমাধান কি হইল? এখানে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে সকল জ্ঞান রামেন্দ্র বাবু স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন তাহারা, কি একাকার জ্ঞান? কি তাহাদের কোন বিভেদ আছে? যদি একাকার জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সাদৃশ্যজ্ঞান, ভেদজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের বিভেদ কিরূপে উৎপন্ন হইল? যদি জ্ঞানগুলি পরস্পর বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে বিভেদসম্বন্ধ নামক অতিরিক্ত জ্ঞান স্বীকারের কি প্রয়োজন? বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হইল বলিলেই ত বুঝাযায় যে, আমি জানি ইহা হইতে ইহা পৃথক, তবে আর অতিরিক্ত বিভেদ সম্বন্ধের কল্পনায় কি প্রয়োজন? রামেন্দ্র বাবু যে জ্ঞান সমষ্টির কথা বলিয়াছেন, সে সমষ্টি কিরূপে উৎপত্তি হইল? তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্যই জ্ঞানের দৈশিক ব্যাপকতা (extension in space) তিনি স্বীকার করেন না, তবে কালিক সম্বন্ধ (relation in time) তিনি মানেন। তাঁহার মতে যখন জ্ঞানাতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা নাই, তখন সেই জ্ঞান সমূহের সমষ্টি কোথায় হইল? আর জ্ঞানের সমষ্টি বলিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের স্মরণ ও বর্ত্তমান জ্ঞান এই দুইএর সমষ্টি বুঝিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপূর্ব্ব জ্ঞানের স্মরণ কে করিল? আর জ্ঞান সমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ বিসদৃশ রূপে প্রতীত হইল? কেননা তাঁহার মতে জ্ঞানের প্রত্যেতা (জ্ঞাতা) নাই, অথচ জ্ঞান প্রতীত হইতেছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে "জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে কে বলিল?" আমরা বলি ক্রিয়া মাত্রেরই কর্ত্তা আছে, কর্ত্তৃবিহীন ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিহীন কর্ত্তা, আমরা অনুভব করিতে পারি না। বস্তুতঃ কর্ত্তার কার্য্যই ক্রিয়া, ক্রিয়ার কারকই কর্ত্তা সুতরাং অনুমান প্রণালী দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞাতা নিরূপিত হইবে।

ক্রিয়া মাত্রের কর্ত্তা আছে জ্ঞানক্রিয়া সুতরাং জ্ঞানের কর্ত্তা (জ্ঞাতা) আছে।	জ্ঞানং কর্ত্তৃবৎ ক্রিয়া ত্বাৎ ঘট নির্ম্মাণবৎ।

এখানে যদি রামেন্দ্র বাবু বলেন যে, জ্ঞানাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে কি না, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ না করিয়া ক্রিয়া মাত্রের কর্ত্তা আছে, এরূপ ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞা (universal proposition) কিরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। আমাদের উত্তর এই যে, মানবের অনুভবে অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কেহ কখনও ইহার ব্যভিচার দেখেন নাই। অতএব এই ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞা লইয়া বর্ত্তমান অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার অনুমান করিতে হইবে। যদি সৃষ্টির আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া একটী ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইত, তাহা হইলে যুক্তির অধিরোহণ (Induction) ও অবরোহণ (deduction) প্রণালী অসম্ভব হইয়া পড়িত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রবাবু যদি এই প্রতিজ্ঞারই সন্দেহ করেন তাহা হইলে প্রচলিত ইংরেজী অনুমান প্রণালী কিরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

সক্রেটিস্ মরণধর্ম্মবান্ মনুষ্যত্বাৎ হরিবৎ।

All men are mortal Socrates is man Socrates is mortal.	সক্রেটিস্ মরণধর্ম্মবান্ মনুষ্যত্বাৎ হরিবৎ।

ইত্যাদি প্রতিজ্ঞায় পূর্ব্ব পক্ষেই সিদ্ধান্ত অন্তর্নিহিত আছে। সক্রেটিস্ মরণ ধর্ম্মবান্ কি না, তাহার নির্দ্ধারণ না করিয়া মানবমাত্রই মরণ ধর্ম্মবান্, এরূপ প্রথম পক্ষ কিরূপে স্থাপিত হইল? মানবের নিশ্চিত জ্ঞানে যত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মনুষ্যত্ব ও মরণ ধর্ম্মবত্ত্বের সামানাধিকরণ্য ছিল। এই ঐকাধিকরণ্য দেখিয়া বিশ্বের সমস্ত মনুষ্যকে পরীক্ষা না করিয়াই মানব মাত্রই মরণ ধর্ম্মবান্ প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা যায়। অতএব বিপরীত-বাদী যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ নিশ্চিত দৃষ্টান্ত

দেখাইয়া “ক্রিয়া মাত্রের কর্ত্তা আছে” এই ব্যাপিণী প্রতিজ্ঞার ব্যভিচার প্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ “জ্ঞানের জ্ঞাতা আছে কি না?” এরূপ ভাবের যত সন্দিগ্ধ (doubtful cases) অনিশ্চিত (uncertain cases) প্রতিজ্ঞা আসিবে, সে সকলকেই আমরা উক্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা পরীক্ষা করিব।

জ্ঞানসমষ্টি আত্মা নহে, জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞাতা আছে ইহা যে কেবল হিন্দু দর্শনেরই মত, তাহা নহে, মহামতি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল ও উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

“If, therefore, we speak of the mind as a series of feelings we are obliged to complete the statement by calling it a series of feelings which is aware of itself as past and future, and we are reduced to the alternative of believing that the mind or ego, is something different from any series of feelings, or possibilities of them, or of accepting the paradox, that something which ex hypothesi is but a series of feelings, can be aware of itself as a series.”

আত্মতত্ত্ব অতি গহন বিষয়, উহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আইসে না। অতএব শ্রুতি এবিষয়ে কিরূপ মীমাংসা করিতেছেন, দেখা যাউক। শ্রুতি বলেন :—

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

“অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা ইত্যাদি।

কঠ শাখায় উক্ত আছে :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইত্যাদি
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে॥

হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌতৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত আছে :—

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটী পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহার মধ্যে একটী (জীবাত্মা) সুস্বাদু কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন মাত্র করেন। অতএব সংস্কৃত ও ইংরেজী দর্শন এবং উপনিষদাদি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

যদি কেহ মনে ভাবে, জগতের কর্ত্তা অথবা আত্মা বলিয়া কিছু নাই, যতদিন আমি এই পৃথিবীতে আহার বিহার ক্রিড়া কৌতুক করিব, ততদিনই আমার, ইহার পর আমার এই নশ্বর ভৌতিক দেহ ভূতে মিশিয়া যাইবে, “আমি” বলিয়া জগতে আর কিছুই থাকিবে না, আমি জীবের প্রতি দয়াই করি, আর হিংসাই করি, সত্য কথাই বলি অথবা শঠতা প্রবঞ্চনাই করি, ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহই করি কিম্বা অবাধ পরিচালনা করি, দানই করি আর ঋণ করিয়াই ঘৃত ভোজন করি, আমার কৃতকর্ম্মের জন্য আমি দায়ী নহি। আমার কার্য্যের পুরস্কর্ত্তা বা দণ্ডবিধাতা কেহ নাই, তাহা হইলে এই জীবন কিরূপ নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, নিরাশা আসিয়া কি প্রকারে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিবে! বস্তুতঃ নাস্তিকের জীবন ভীষণ যন্ত্রণাময়। অনেক তার্কিক প্রথমে ঈশ্বরের ও আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছেন শেষে জীবনাবসান সময়ে পরলোকের ভয়াবহ ভাব স্মরণ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব সঞ্চিত যুক্তিরাশি বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি এ জগতে কেহই ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করে, সকলেই পাপ পুণ্যকে অলীক কল্পনা সম্ভূত মনে ভাবে, তাহা হইলে বেদ কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের কার্য্যকারিতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রের অনুশাসন অথবা আইনের বন্ধন মিথ্যা জানিয়া কেহই তাহাতে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না। মানবসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় পৃথিবী এক অভিনব ভীষণতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অধোগতির নিম্নতম সীমায় নীত হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য।

বর্ষার বোধন।

বিষম বরষা আজি ; সান্দ্র অন্ধকার
মৃত্যু মেঘছায়া রূপে এসেছে ঘেরিয়া ;
ঝরঝর ঝরে ধারা, বৃষ্টি অনিবার,
অশনি সঘন-ঘনে উঠিছে শ্বসিয়া ;
গর্জ্জিছে জীমূত-মন্দ্র কম্পিত গগনে ;—
আমি পান্থ সঙ্গীহীন সংসার-গহনে। ১

ছিল একদিন, নাট্যশালা সম যবে
পরিপূর্ণ প্রীতিরসে, উল্লাস-লালসে
উথলিত এ আলয় ; আনন্দ-উৎসবে
কাটিত চঞ্চল কাল, নিদ্রার পরশে
সুদীর্ঘ-প্রহর নিশি নিমিষের প্রায় ;
ছিল সেই একদিন, আজি নহে, হায় ! ২

ছিল প্রেমসাথী এক ; সন্ধ্যায় প্রভাতে
নিশ্বাস-মলয়ে যা'র উঠিত শিহরি'
হৃদি মোর, শর্ব্বরীর স্নেহবারি পাতে
সদ্যসিক্ত শতদল সম ; প্রাণ ভরি'
সে পুণ্য সৌরভ-সুধা মধু করি' পান
সকল সংশয়-ব্যথা হ'ত অবসান। ৩

তখন ছিলাম যেন প্রকৃতির কোলে
শান্ত শিশু অতি সুকুমার ;—ঋতুরাজ
আপনি যোগা'ত ফুল ; সুনীল নিচোলে
বীজনিত নীলাম্বর ; পরি' নব সাজ
নিত্য বসি' বীণাপাণি মানস-শিখরে
কাব্যছলে দিব্য হাসি ফুটা'ত অধরে। ৪

হায় ! লুপ্ত আজি সব ; অদৃষ্ট পবনে
একে একে দীপগুলি আইল নিবিয়া ;
সঙ্গে সে উৎসব-রব, যৌবন-কাননে
অনাঘ্রাত ফুলমালা রহিল পড়িয়া ;—
দাঁড়াইনু পথে আমি ; হ'ব অগ্রসর,
সম্মুখে বরষা সিন্ধু হেরিনু দুস্তর। ৫

কতবার করিনু কামনা, জীবনের
ছিন্ন গ্রন্থি-অবশেষ করিয়া ছেদন,
একেবারে পশি গিয়া মহা অনন্তের
চির-অন্ধকার মাঝে ; ত্যজি' এ ভুবন
অজ্ঞাত, নিভৃত, নিত্য রহস্যের ছায়
দেখি আরও দেখিবার আছে কি কোথায় ! ৬

কিন্তু অন্তর্যামি দেব ! এ মম অন্তর
জান তুমি ;—নহি আমি সংসারের রণে
ভীরু-কাপুরুষ, শক্তিহীন ক্ষীণ নর ;
যুঝিয়াছি বীরবেশে ; তরঙ্গ-তর্জ্জনে
বজ্রনাদে বৃষ্টিপাতে বক্ষ প্রসারিয়া,
আজন্মের সে গৌরব রেখেছি ধরিয়া। ৭

আজিও দুর্দ্দিনে তাই চাহি পুনর্ব্বার
মহান্ মন্দির নব করিতে সৃজন ;
পবিত্র ত্রিকালজয়ী উপাদান যা'র
যোগাইবে ত্রিজগৎ ; করিয়া হেলন
দারিদ্র্য-দীনতা-ভরা মর্ত্ত্যের প্রবাসে
অভ্রভেদী চূড়া যা'র উঠিবে আকাশে। ৮

বিপুল বাসনা হেন বহিয়া মানসে
মুছিয়াছি অশ্রুনীর ; জীর্ণ এ হৃদয়
বাঁধিয়াছি বজ্রময় অন্তিম সাহসে ;
পাতিয়া মঙ্গল-ঘট, শুভ্র চিন্তাচয়
গাঁথিয়া কুসুম সম, হে বিশ্ব-শরণ,
করিতেছি বরষায় তোমারই বোধন। ৯

দেখিনে, জানিনে, আমি চিনিনে তোমারে ;
শুধু এ সৌন্দর্য্য ঘন সৃষ্টি পানে চাহি'
করিয়াছি অন্ধ অনুভব ; আপনারে
করি' বিশ্লেষণ, সন্তর্পণে অবগাহি'
অন্তরের অন্তহারা অকূল মাঝার,
বুঝিয়াছি স্বপ্নসম রহস্য অপার। ১০

বরষার মেঘমন্দ্রে করেছি শ্রবণ
গম্ভীর আহ্বান রব ; বসন্ত-বাতাসে
পরশিয়া স্নিগ্ধ কর পল্লব মতন
উঠেছি কাঁপিয়া ; শরতের শুভ্রহাসে
হেরেছি বয়ান-বিভা, নিদাঘ-সন্ধ্যায়
সকল সন্তাপহারী পেয়েছি তোমায়। ১১

নিখিলীন মূর্ত্তি সেই আজি একবার
করিয়া গ্রহণ, গৃহ-দেবতার ভাসে
অপূর্ব্ব আলোক-গর্ব্বে অন্তর আগার
উজলিয়া, দেখা তুমি দাও আসি দাসে ;
মিটাও এ উগ্রক্ষুধা, কাঙাল-কামনা,
উদগ্রীব আগ্রহ-ভরা অশান্ত প্রার্থনা। ১২

যৌবন-নিকুঞ্জে মোর লুণ্ঠিত ভূতলে
সে তরুণ তরু আর চাহিনা তুলিতে ;
এস তুমি ; দুর্ব্বলেরে নিজ পদবলে
কর সর্ব্বরিপুজয়ী ; হৃদয়-ভূমিতে
স্বহস্তে দেউলখানি করিয়া নির্ম্মাণ
চির-অধীশ্বর রূপে কর অধিষ্ঠান। ১৩

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

দ্বাদশ খণ্ড—নবম সংখ্যা।　　　　পৌষ, ১৩০১।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়।　　　　পৃষ্ঠা

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত বসুমতী প্রেসে, শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত,
২১০/৪নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮ই পৌষ, ১৩০১।

ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲　　[এই সংখ্যার মূল্য ৷৵০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন

আমার শরীর বড়ই অপটু হইয়াছে; প্রায় আড়াই মাস যাবৎ একটু জ্বর অবিচ্ছিন্নভাবে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আবার জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। বায়ুপরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য মাঘ মাসের সংখ্যা ফাল্গুন সংখ্যার সহিত একত্রে প্রকাশিত হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির না হইলে গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন।

বহু গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী, এদিকে টাকার অভাবে আমাদিগের যারপর নাই কষ্ট হইতেছে। এই সময়ে গ্রাহকগণ দয়া করিয়া কিছু কিছু দিলে যারপর নাই উপকৃত হইব।

নব্যভারতের এজেণ্ট বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মূল্য আদায় করিতে কোথাও উপস্থিত হইলে, গ্রাহকগণ আমার স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া ও টাকার পরিমাণ চেকের মুড়িতে লিখিয়া দিয়া মূল্য প্রদান করিবেন।

মূল্যাদি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয়।

বহু সমালোচনার পুস্তক জমিয়াছে, শরীরের অসুস্থতার দরুণ সমালোচনা হইতেছে না, গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

নব্যভারত সম্পাদকের বিশেষ পরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ও বিদ্যালয়।

কবিরাজ শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন।

৫৮ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় অমৃতপ্রাশ, চ্যবনপ্রাশ, ছাগাদি ও চরক সুশ্রুতোক্ত নানাপ্রকার বৃষ্যঘৃত, মহামাষ, মহারুদ্র, কন্দর্পসার, বৃহদ্বিষ্ণু, মধ্যমনারায়ণ, বাসারুদ্র, সপ্তশতী প্রসারণী প্রভৃতি তৈল; নানাবিধ বটিকা, মোদক, বটিকা চূর্ণ, অবলেহ, অরিষ্ট, আসব ও জারিত ধাতু দ্রব্যাদি সকলই সুলভমূল্যে পাওয়া যায়। মফঃস্বলে ভ্যালুপেবল ডাকে পাঠান হয়। ব্যারামের অবস্থা সহ রিপ্লাই কার্ড, কি টিকিট্ পাঠাইলে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠান হয়।

"আমি শ্রীযুক্ত কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয়ের চিকিৎসা প্রণালী দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ইনি অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি, আমার বাড়ীতে নানাপ্রকার কঠিন পীড়া অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য করিয়া আমাকে চিরঋণী করিয়াছেন। স্বভাব উত্তম, প্রকৃতি মধুর, ব্যবহার অতি সুন্দর। ইঁহার দ্বারা যিনি কোন রোগীর চিকিৎসা করাইবেন, তিনিই মোহিত হইবেন, বিশ্বাস করি।"

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, নব্যভারত সম্পাদক।

একবার পড়িয়া দেখুন।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ প্রণীত বনফুল ৷৷০, প্রেমহার ৷৷০, এবং বিবিধ প্রবন্ধ ৷৷০। এই তিনখানি পুস্তক এক টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ডাকমাশুল লাগিবে না। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার, সংস্কৃত ডিপজিটারি, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যোগজীবন—উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছে, মূল্য ১৲। নব্যভারত কার্য্যালয়ে ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

উপনিষদঃ।

অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত "শঙ্কর-কৃপা" নাম্নী সরল ও সংক্ষিপ্ত টীকা ও "প্রবোধক" নামক বঙ্গানুবাদ সমেত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। ২১০।৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য।

সোণারতরী। (নূতন কবিতা পুস্তক)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য দুই টাকা

ছোট গল্প। (১৬টী ছোট উপন্যাস) মূল্য ১৲।

এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক গুলি ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

নব্যভারত সম্পাদকের সুপরিচিত।

ঔষধের মূল্য—মাদার টিংচার ড্রাম ।৵০, ডাঃ ১২ পর্য্যন্ত ।০, ৩০ ক্রম ।৵০; ১২ শিশির ঔষধপূর্ণ কলেরা বাক্স পুস্তকাদি সহ ৩, ঐ ২৪ শিশির ৮৷৷০, ৩০ শিশির ১০৷৷০ ইত্যাদি। গার্হস্থ্য চিকিৎসার ঔষধপূর্ণ বাক্স ও পুস্তক, ফোঁটা ফেলার যন্ত্র ২৪ শিশির ৬৷০; ৩০ শিশির ৯৷৵০; ৩৬ শিশির ১২৲ ইত্যাদি থার্ম্মমিটার ২৷০; খুব ভাল "হিক্স" ৩৲, ৪৷৷০, ৬৲, রুবিণির ক্যাম্ফার ১ আউন্স ৸০, অর্দ্ধ আউন্স ।০।

এমেরিকান ও জার্ম্মেন ফার্ম্মাকোপিয়ার বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংক্ষেপ সংস্করণ ২৲। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ৭৮ নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল।

আজ কাল অনেকেই যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক ঐতিহাসিক মীমাংসাও হইয়া গিয়াছে। আবার সেই পুরাতন কথার উত্থাপনে প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইতে পারে।

দুই প্রণালীতে যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। একটি জ্যোতিষিক, অপরটি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক প্রণালীতে ঐ কাল সম্যক্ বিচারিত হইয়াছে। জ্যোতিষিক প্রণালী দ্বারা লক্ষকালও আলোচিত হয় নাই, এমন নহে। তবে এ বিষয়ের মীমাংসা আমি যতদূর দেখিয়াছি—অবলম্বিত গণনাপ্রণালীর সহিত কোন কোন বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। তাই এ প্রবন্ধের অবতারণা। পাঠকগণের বোধসুকর করিবার নিমিত্ত জ্যোতিষিক উপায়গুলি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে বলা যাইতেছে।

১। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় দুইটি শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই শ্লোক দ্বয়ের প্রকৃত অর্থগ্রহ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। নানাবিধ অনুমানের অভাব নাই সত্য, কিন্তু কোনও অনুমান তত সন্তোষপ্রদ বোধ হয় না। আমিও একটা অনুমান করিতেছি। পাঠকগণ ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন।

শ্লোক দুইটি অনেকবার উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের সারার্থ এই। বরাহমিহির লিখিয়াছেন, যে "বৃদ্ধ গর্গের মতানুসারে যুধিষ্ঠির নৃপতির পৃথ্বী শাসনকালে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। শকাব্দার সহিত ২৫২৬ বর্ষ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে কত বর্ষ গত হইয়াছে, তাহা জানা যায়। এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ শতবর্ষ পর্য্যন্ত বিচরণ করেন।" খগোলের উত্তরাংশে সপ্তর্ষি নামক সাতটি তারকা আছে। তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, ইহার অর্থ কি? এবং তাঁহারাই বা কি অর্থে এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন? দুইটি অর্থ লইয়াই গোলযোগ।

বিষ্ণুপুরাণের ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েঐরূপ ভাবের কয়েকটি শ্লোক আছে *। তাহাদের অর্থ এই। সপ্তর্ষিগণের যে দুইটি তারা পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্য দিয়া একটি রেখা টানিলে সেই রেখা অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র দিয়া গমন করে। আমাদের একশত বর্ষ পর্য্যন্ত সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন এবং তখন কলির দ্বাদশ শতবর্ষ প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পাঠক দেখিবেন যে সেই এক কথা। অতিরিক্তের মধ্যে পরীক্ষিতের সময়ে কলির দ্বাদশশত বর্ষ গত বলা হইয়াছে। বৃদ্ধ গর্গাচার্য্য মতে বরাহমিহির বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময় জানিতে হইলে শকাব্দার সহিত ২৫২৬ বর্ষ যোগ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, আজ অবধি ২৫২৬ + ১৮১৬ = ৪৩৪২ বর্ষ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ছিলেন। এখন কলির ৪৯৯৫ বর্ষ গত। অতএব এই মতে যুধিষ্ঠিরের সময় কলিযুগ আরম্ভের পরে ৬৫৩ বর্ষ গত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন, তখন কলির প্রায় ১২০০ বর্ষ। এখানে আবার বৃদ্ধ

* ভাগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ কয়েকটি শ্লোক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হয়। শ্লোকগুলির সামান্য অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। কিন্তু ভাবার্থ সকলের একই।

গর্গ ও পুরাণকারের মধ্যে বিবাদ। বরাহমিহির বৃদ্ধ গর্গকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। বৃদ্ধ গর্গ একজন জ্যোতিষী ছিলেন। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্যোতিষীর না পুরাণকারের কথা গ্রাহ্য করা যাইবে? যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের বা পরীক্ষিতের সময় সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, একথা দুই জনেই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল।

আলবেরুণী নামক জনৈক আরবী পণ্ডিত ও পথিক প্রায় শক ৯৫৩ অব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনিও বরাহমিহিরের সপ্তর্ষিগণ সম্বন্ধে মতটি তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। বৃদ্ধ গর্গের ভিত্তি কাল্পনিক বা মিথ্যা বলিতেও ক্রটি করেন নাই। বৃহৎ সংহিতায় উক্ত শ্লোক গুলির তিনি যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ ৬০০ বর্ষ থাকেন। বোধ হয় তিনি ভুল করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তিনি ৯৫২ শকাব্দার একখান কাশ্মীরের পঞ্জিকা দেখেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, তখন অনুরাধা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের ৭৭ বর্ষ গত হইয়াছিল। মঘা দশম নক্ষত্র, অনুরাধা সপ্তদশ নক্ষত্র। অন্তর ৭ নক্ষত্র—৭৭ বর্ষ। সপ্তর্ষির এক এক নক্ষত্রে শত বর্ষ ভোগ ধরিলে ঐ অন্তর ৭৭৭ বর্ষ পাওয়া যায়। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে, সপ্তর্ষিগণ মঘা হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার মঘাতে আসিয়াছিলেন এবং তথা হইতে শকের ৯৫২ অব্দে অনুরাধায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৭ নক্ষত্রের ভোগকাল ২৭০০ বর্ষ; উহাতে ৭৭৭ বর্ষ যোগ করিলে ৩৪৭৭ বর্ষ হয়। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির শক ৯৫২ অব্দ হইতে ৩৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৪২ বর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, কাশ্মীরের পঞ্জিকাকারের গণনা বৃদ্ধ গর্গের অনুরূপ। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের পঞ্জিকাকার বরাহমিহিরোক্ত বৃদ্ধ গর্গের বচনকেই তাঁহার গণনার মূল ধরিয়াছিলেন।

আমরা উপরে দেখিলাম যে, বৃদ্ধ গর্গের বচন অনুসারে যুধিষ্ঠির প্রায় ২৪০০ খৃঃ পূর্ব্বে এবং পুরাণকারের মতে প্রায় ১৯০০ খৃঃ পূর্ব্বে ছিলেন ... . (ক)

সপ্তর্ষিগণের মঘা নক্ষত্রে থাকার কি অর্থ হইতে পারে, তাহার বিচার করা যাউক। বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ চরিত্রে লিখিয়াছেন যে, "যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে।"

মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির অবস্থিতির সহিত ভারতবর্ষে ইংলণ্ড থাকার তুলনাটি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কেননা, পুরাণকার এমন কথা বলেন নাই যে, সপ্তর্ষিগণ সশরীরে ৫০।৬০ অংশে দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে লুব্ধক তারা (Sirius) ক্রান্তিবৃত্তের ৪০ অংশ দক্ষিণে অবস্থিত। অথচ মিথুন রাশির বিংশতি অংশে লুব্ধক আছে, একথা লিখিত আছে। বাস্তবিক, বঙ্কিম বাবু এখানে একটা ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, পুরাণকার সপ্তর্ষির দুইটি তারা দিয়া উত্তর দক্ষিণে একটা রেখা টানিতে বলিয়াছেন। সেই রেখাটি যুধি-

ষ্ঠিরের সময় রাশি চক্রকে মঘা নক্ষত্রে বিদ্ধ করিত। বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অংশের ৭।৮।১২ অধ্যায়ে অনেক জ্যোতিষিক বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাণকার যে সপ্তর্ষি বা মঘা চিনিতেন না, এমন সন্দেহ কিছুতেই হইতে পারে না।

এই সকল বিচার করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, (১) সপ্তর্ষির একটা বিশেষ অর্থ ছিল (২) ইহার একটা গতি ছিল, এবং (৩) এতদ্দ্বারা জ্যোতিষিক কোন বিশেষ ঘটনা ব্যক্ত হইত। সপ্তর্ষিরেখা শব্দের পরিবর্ত্তে সম্ভবতঃ সপ্তর্ষি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্যোতিষে এরূপ শব্দ-সংক্ষেপের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অতএব পুরাণকার যেমন আভাষ দিয়াছেন, তদনুসারে সপ্তর্ষি অর্থে সপ্তর্ষিরেখা বুঝিতে হইবে। তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে জিজ্ঞাসা এই যে, ইহা দ্বারা জ্যোতিষিক কোন্ রেখা বুঝিতে হইবে?

জ্যোতিষিক গণনার নিমিত্ত গতিশীল দুইটি রেখা বা বৃহদ্বৃত্ত কল্পিত হয়। একটি ক্রান্তিপাত বিন্দু দিয়া, অন্যটি অয়নান্ত বিন্দু দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে এই দুইটির নাম Epuinoctial colure এবং Solstitial colure গণনার পক্ষে উভয়েরই একই প্রকার ব্যবহার, একই ফল। ইংরাজি জ্যোতিষে ক্রান্তিপাতগতরেখার সমধিক ব্যবহার, আমাদের জ্যোতিষে অয়নান্ত রেখার তাদৃশ ব্যবহার। আমরা ক্রান্তিপাতের চলন না বলিয়া অয়নচলন বলি।

অতএব সপ্তর্ষিরেখা অর্থে অয়নান্তবৃত্ত এবং সপ্তর্ষির গতি অর্থে অয়নচলন বুঝিতে হইবে। বেণ্টলী সাহেবও বলেন, সপ্তর্ষির গতি অর্থে ক্রান্তিপাত বা অয়নগতি সূচিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে "মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতি ও তাহাদের অন্যান্য নক্ষত্রে গতি, অয়নচলন পরিমাণ করিবার একটা উপায় স্বরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মঘা নক্ষত্রের আদি দিয়া কদম্বসূত্র ধরিলে, তাহা সপ্তর্ষিগণকে ভেদ করিয়া যায়। সপ্তর্ষি দিয়া ঐ রেখা টানা যায় বলিয়া ঐ রেখার নামও সপ্তর্ষি হইয়াছে। উহা মঘা নক্ষত্রে চিরকাল আছে। সুতরাং তাহা কখন কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত, তাহা জানিতে পারিলেই অয়নচলনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল।"

বেণ্টলী সাহেবের পুস্তক পাঠ করিলে পদে পদে তাঁহার ভারতবিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয়। তিনি ভারতীয় আর্য্যগণকে প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী বলিতে কোন স্থানে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের অপরাধ এই যে, তাঁহারা সত্য ত্রেতা যুগাদি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যেমন করিয়াই হউক, ভারতের জ্যোতিষ অত্যন্ত আধুনিক এবং তাহাও পাশ্চাত্যদেশ হইতে "চোরাই মাল" এই কথা প্রতিপাদনই তাঁহার পুস্তক লেখার অভিপ্রায় বোধ হয়। সুতরাং তিনি জ্যোতিষী হইলেও তাঁহার মত গ্রাহ্য নহে। এ কথা অনেকে অনেক স্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন। বেণ্টলী সাহেব, যুধিষ্ঠির পরাশর ও গর্গকে সমসাময়িক ঠাওরাইয়াছিলেন। পরাশরসিদ্ধান্ত ও গর্গসংহিতার কাল নিরূপণ করিয়া তিনি সেই কালে যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয় স্থির করিয়াছেন। "এইরূপ গণনা করিয়া বেণ্টলী যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন।"

সপ্তর্ষির অর্থ আমি যেরূপ দেখাইলাম, তাহাতে কোন আপত্তি দেখি না। এক্ষণে ঐ অনুমানটি সত্য মনে করিয়া গণনা করা যাইতেছে। যুধিষ্ঠিরের সময় সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহার অর্থ তবে এই হইল যে, তাঁহার

সময়ে রবির দক্ষিণায়ন মঘা নক্ষত্রে ঘটিত। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায়, পুনশ্চ বৃহৎ সংহিতায় লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে রবির দক্ষিণায়ন অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্দ্ধে ঘটিত। যুধিষ্ঠির বা পরীক্ষিতের সময় তাহা মঘাতে ঘটিত, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

পঞ্জিকা দেখিলে জানা যায় যে, আজকাল রবির দক্ষিণায়ন আর্দ্রা নক্ষত্রের ৮০ কলায় ঘটিতেছে। আর্দ্রা ষষ্ঠ নক্ষত্র, মঘা দশম নক্ষত্র *। অতএব বলিতে হইবে যে, দশম নক্ষত্র হইতে ষষ্ঠ নক্ষত্রে অয়ন সরিয়া আসিয়াছে। মঘা নক্ষত্রের কোন্ অংশে দক্ষিণায়ন ঘটিত, তাহার নির্দ্দেশ নাই। এজন্য আমাদিগকে উহার আদি ও অন্ত উভয়ই গ্রহণ করিতে হইতেছে। আদি ধরিলে জানা যায়, যুধিষ্টিরের সময় হইতে এখন অয়ন ৩ নক্ষত্র ৭২০কলা সরিয়া আসিয়াছে। অয়নের বার্ষিক গতি জানিলে এতদ্দ্বারা যুধিষ্টিরের আবির্ভাব কাল নিরূপিত হইবে। আমাদের সিদ্ধান্তাদির মতে অয়নের এক এক নক্ষত্র যাইতে প্রায় ৯০০ বৎসর লাগে। অতএব যুধিষ্টির এখন হইতে প্রায় ৩৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টের ষোড়শ শত বর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন।

মঘার অন্ত ধরিলে অবশ্য ঐ সময় আরও ৯০০ বর্ষ পিছাইয়া যাইবে। যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি যে, মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতির দ্বারাতেই জানিতেছি যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ ১৫০০ হইতে ২৪০০ মধ্যে কোন সময়ে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

* নক্ষত্র শব্দে রাশি চক্রের ৮০০ কলা পরিমিত অংশ বুঝিতে হইবে। বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাবে বুঝা যায় যে, তিনি নক্ষত্র অর্থে তারা বুঝিয়া গোলে পড়িয়াছিলেন। নচেৎ ইংলণ্ড ভারতবর্ষে থাকিতে পারে না, ইত্যাদি বলিতেন না।

২। পুনশ্চ, মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৬৭ অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আছে :—

মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগ-শেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥*

কথাটা এই। সকলেই জানেন যে, কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ ১৮ দিন ব্যাপিয়া হইয়াছিল। দশম দিবসে ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করেন। রবির দক্ষিণায়নে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় নহে। এজন্য তিনি রবির উত্তরায়ণ অপেক্ষায় ৫৮ দিন জীবিত রহিলেন। শুভ কাল উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"হে যুধিষ্ঠির, সহস্রাংশু দিবাকর পরিবৃত্ত হইয়াছেন। শয়নস্থ হইয়া আমার ৫৮ দিন গত হইয়াছে। চান্দ্র মাঘের শুক্লপক্ষ উপস্থিত; এখনও এই মাসের তৃতীয়াংশ থাকিতে পারে।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে চান্দ্র মাঘ মাসে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, এখন ৭ই কিম্বা ৮ই পৌষ রবির উত্তরায়ণ হইতেছে। বঙ্কিম বাবু চান্দ্র মাঘের পরিবর্ত্তে সৌর মাঘ ধরিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার গণনা সোজা হইয়া পড়িয়াছে। "২৮ শে মাঘেও উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ।" ৪৮ দিনে রবির যত অংশ যত কলা গতি হয়, তত অংশাদি অয়ন সরিতে কত বৎসর লাগিয়াছে, তাহার গণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে,

* বৰ্দ্ধমান মহারাজার মহাভারত হইতে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল। এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতে 'মাসঃ সৌম্যঃ' পরিবর্ত্তে 'মাসঃ পুণ্যঃ' পাঠ আছে। বঙ্কিম বাবু সৌম্য মাঘ অর্থে সৌর মাঘ বুঝিয়াছেন। সৌম্য অর্থে সুন্দর কিম্বা চান্দ্র বুঝায়। এখানে যে চান্দ্র মাস বুঝিতে হইবে, তাহা মহাভারতের উক্ত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায়। (ভীষ্ম পর্ব্বের ১১৬ ও ১১৭ অধ্যায় এবং শান্তি পর্ব্বও দ্রষ্টব্য।)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৫৩০ অব্দের পূর্ব্বে ঘটে নাই। পুস্তকের পাদে টিপ্পনী করিয়াছেন যে "সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা মহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না। কুরু পাণ্ডবের সময় যে সৌরমাস দৈনিক কার্য্যাদিতে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ তিনি দেন নাই। প্রমাণ পাইলে ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষের একটা নূতন তত্ত্ব জানা যাইত। মহাভারতে ঋতুর নাম আছে বলিয়া যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সময়ে সৌর মাস প্রচলিত ছিল, এ কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতেছে না। ঋগ্বেদেও রবির উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ, ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস লিখিত আছে। যাহা হউক, তাঁহার গণনায় কতকটা গোঁজা মিল আছে বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, চান্দ্র মাস ধরিলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল যে একেবারে গণনা করা যায় না, এমন নহে। চান্দ্র মাঘ মাস সৌর ফাল্গুনের কতক দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। এমন কি ২৮।২৯ ফাল্গুনেও চান্দ্র মাস শেষ হইতে পারে। উপরিউদ্ধৃত শ্লোক হইতে আমরা জানিতেছি যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে যখন রবির উত্তরায়ণ হয়, তখন শুক্লপক্ষ এবং তখন চান্দ্র মাসের প্রায় চতুর্থাংশ গত হইয়াছিল। ৩০ ফাল্গুনও যদি চান্দ্রমাস শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগকে ৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত দিন গণনা করিতে হইবে। ৭ পৌষ হইতে ৭ ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রায় ৫৮ কি ৫৯ দিন পাওয়া যায়। এখন যেরূপ রবির গতি আছে, তদনুসারে এই ৫৮ কি ৫৯ দিনে রবি প্রায় ৫৮ অংশ গমন করে।* এই ৫৮ অংশ অয়ন সরিয়া যাইতে কত বৎসর লাগে? সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে অয়ন চলন ধরিলে এতদ্দ্বারা প্রায় ৩৮০০ বৎসর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য মত ধরিলে উহা প্রায় ৪০০০ বৎসর হয়। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতেছি যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বেশী পুরাতন হইলেও খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৯০০ কি ২১০০ বর্ষের পূর্ব্বে ঘটে নাই। (গ)

৩। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভ কালে কোন্ কোন্ গ্রহ কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহার একটা বিবরণ ভীষ্ম পর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন গ্রহগণ বর্ণিত নক্ষত্রে ছিল, কিম্বা যুদ্ধের অশুভ ফল ঘটিবে, ইহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ফলিত জ্যোতিষের বচনানুসারে তৎসমুদায় কেহ বসাইয়া দিয়াছেন, এই দুয়ের কোন্‌টি ঠিক, তাহা বলা যায় না। সেই রূপ জ্যোতির্নিবন্ধ নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রহগণের তৎকালীন স্থিতি ধরিয়া কোন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা কেহ কেহ নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এইরূপ বাল্মিকী রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকালীন গ্রহস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া তদনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব কাল গণনা করা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে?

* বর্ত্তমান কালে পৌষ মাঘ মাসে রবির যেরূপ গতি, ৩।৪ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে গতি ছিল না। বাস্তবিক বর্ত্তমান কালের কোন গতি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কালের গণনা করা নিতান্ত দুষ্ট, এমন কি অসম্ভব। তবে এরূপ গণনা দ্বারা সময়ের একটা স্থূল আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম বাবু কোন্ পঞ্জিকায় পৌষ মাঘ মাসের ৪৮ দিনে রবির ৪৩ অংশ ৪কলা গতি পাইয়াছিলেন?

জ্যোতিষ সাহায্যে গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরের যে যে কাল পাওয়া যায়, তাহা বলা হইল। এখন একটা প্রধান আপত্তির উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। সপ্তর্ষির অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে শতবর্ষ ব্যাপিয়া স্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে। পুরাণকার বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যেমন করিয়া হউক, তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে, এই প্রকার ভাবই অনেকের লেখায় দৃষ্ট হয়। সপ্তর্ষির যে অর্থ এই প্রবন্ধের প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির স্থিতির সামঞ্জস্য হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সপ্তর্ষির দ্বারা অয়ন চলন সূচিত হইয়াছে। যদি তাহা ঠিক হয়, তবে এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষির ৯০০ বর্ষ স্থিতি না লিখিয়া গর্গ কিম্বা পুরাণকার ১০০ বর্ষ ভোগ লিখিলেন কেন?

ইহার উপর আর ও কথা আছে। বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে লিখিত আছে যে, নন্দের সময় সপ্তর্ষিগণ পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন। পুরাণে আরও আছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেচন পর্য্যন্ত সময় প্রায় সহস্র বর্ষ। মঘা হইতে পূর্ব্বষাঢ়ার অন্তর দশ। সুতরাং একশত বর্ষে সপ্তর্ষির এক নক্ষত্রগতি স্বীকার না করিলে পুরাণকারের গণনার সহিত নন্দের ঐতিহাসিক কালের ঐক্য হয় না। শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় গত বৎসরের ভারতীতে লিখিয়াছেন যে, সাকল্য সংহিতায় লিখিত আছে, সপ্তর্ষিগণ প্রতি বৎসর ৮ কলা করিয়া অগ্রসর হয়েন।

আরও কথা আছে। কালক্রমে অয়নের পশ্চিমগতি হয়। এতদনুসারে আমরা সপ্তর্ষির বিলোমগতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গর্গাদি ঋষিগণ বলিতেছেন যে, সপ্তর্ষিগণের অনুলোম গতি।

এই সকল আপত্তির জন্য সপ্তর্ষির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ উহাকে কাল গণনার একটা বিধিমাত্র বলিতে চাহেন। কাশ্মীরে এক শত বর্ষ পরিমিত একটা লৌকিকাব্দ প্রচলিত ছিল। ইহা আলবেরুণীর কথায় জানা যায়। তদ্ভিন্ন কানাই বাবু ও দেখাইয়াছেন, কহ্লন পণ্ডিত তাঁহার সময়ে তাহা চতুর্ব্বিংশতি দিয়াছেন।

এক শত বর্ষ পরিমিত লৌকিকাব্দের কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সেই লৌকিকাব্দের মূল কি? তাহাই অবধারণের চেষ্টা করা যাইতেছে। কানাই বাবু লিখিয়াছেন "যেমন সকল কল্পনারই (Theory) এক একটি অবলম্বন (Locus Standi) আছে, সেই প্রকার যুধিষ্ঠিরাদির সময় নিরূপণেও বরাহাদি একটি অবলম্বনের আশ্রয় লইয়াছেন।" বরাহমিহির স্বয়ং সপ্তর্ষির গতিসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি বৃদ্ধ গর্গের দোহাই দিয়াছেন। বৃদ্ধগর্গ এরূপ অসঙ্গত কল্পনা কেন করিলেন, তাহা ত বুঝা যায় না। আর কল্পনার মূলে কি সত্য ঘটনা কিছুই থাকিবে না? কাব্য উপন্যাসে যাহাই হউক, জ্যোতিষে এরূপ কল্পনা শোভা পায় না। বৃদ্ধ গর্গের কল্পনার অবলম্বনটি (Locus Standi) কি ছিল?

বরাহমিহির স্বয়ং অয়নচলন বা কোন নক্ষত্রের গমন বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। অয়নচলন বিষয়ে বলিবার মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে অশ্লেষার অর্দ্ধে রবির দক্ষিণায়ন ঘটিত। সুতরাং সপ্তর্ষির গমন সম্বন্ধে তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন বা শুনিয়া-

ছিলেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, এইরূপই মনে করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, এরূপ একটা কিম্বদন্তী, বোধ হয়, পূর্ব্ব কাল হইতে প্রচলিত ছিল। তাহাই হয়ত বৃদ্ধগর্গ কোন সংহিতায় লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীর মূল অনেক স্থলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ গর্গ মূল অন্বেষণ না করিয়া তাহার উপর শতবর্ষ গতি যোগ করিয়া গিয়াছিলেন।

ভারতে অয়নচলন প্রথমে কে কোন্ সময়ে নিরূপণ ও পরিমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে বৃদ্ধ গর্গের মনোগত প্রকৃত অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট জানা যাইত। এমন হইতে পারে, মূলে সহস্র বর্ষ ছিল, লিপিকর প্রমাদ বশতঃ হউক বা অপর কোন কারণে পরে তাহা শত বর্ষ হয়। সেই শতবর্ষ ধরিয়াই পুরাণকার নিজের গণনা করিয়া গিয়াছেন। অথবা বৃদ্ধগর্গ যখন ছিলেন, তখন ভারতে অয়নচলনবেগ অজ্ঞাত ছিল। স্থূল যন্ত্রের সাহায্যে অয়নচলনের মৃদু বেগ এক শত কি দুই শত বৎসরের পরিবর্ত্তনে পরিমিত হয় না। বৃদ্ধগর্গ শকাব্দা প্রচলনের পরে ছিলেন কি? শকাব্দার সহিত ২৫২৬ যোগ করিতে বলেন, কে, গর্গ না বরাহ?

যাহা হউক, এক্ষণে পূর্ব্বপ্রাপ্ত গণিতাগত কাল সকলের তুলনা করিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করা যাউক।

যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয় কাল

	কল্যব্দ	খৃঃ পূঃ
(ক) বৃদ্ধ গর্গের মতে	৭০০	২৪০০
পুরাণকার	১২০০	১৯০০
(খ) সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে	৭০০-১৬০০	১৫০০-২৪০০
(গ) চান্দ্র মাঘ মাসের রবির উত্তরায়ণ	১১০০	২০০০
		(পরমসীমা)
ঐ সৌর মাসে	১৫০০	১৬০০
		(পরম সীমা)

এ কয়েকটির মধ্যে কোন্‌টা কত সত্য, তাহা বলা যায় না। তবে কলির একাদশ বা দ্বাদশ শত বৎসরের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন নাই, তাহা স্বীকার করিতে কোন গোলযোগ নাই। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেবল ঐতিহাসিক বিচার অবলম্বন করিলে যুধিষ্ঠির খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যান না এবং জ্যোতিষিক বিচার দ্বারা ঐ শতাব্দ হইতে গণনা প্রায় আরম্ভ করিতে হয়। মহাভারত কিম্বা পুরাণ সকলও কাল সম্বন্ধে এক মত নহে। কোথাও দ্বাপরান্তে কোথাও বা কলির দ্বাদশ শত বর্ষান্তে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান। যাহা হউক, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ কলির সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব কাল ফেলিতে হয় *। অবশ্য এরূপ গণনায় দুই এক শত বর্ষের প্রভেদে তত আসে যায় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* এই কালের সহিত পুরাণোক্ত কালের ও সামঞ্জস্য আছে। বিষ্ণুপুরাণমতে পরীক্ষিত হইতে নন্দের সময় ১০১৫ বৎসর। মৎস্য পুরাণ মতে তাহা ১০৫০, ভাগবতমতে ১১১৫ বর্ষ। মহাপদ্ম নন্দ ও তাঁহার পরবর্ত্তী নবজন নন্দ এক শত বর্ষ রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত ইঁহাদের পরবর্ত্তী —চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩১৫অব্দে ছিলেন। এই রূপে জানা যায় যে পরীক্ষিত প্রায় খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে। তৎসমুদায় আলোচনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা প্রতিবাদ। (৪)

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলে, সেই সঙ্গে সাকার জগৎও চিন্তা করিতে হয়। জগৎ বাদ দিয়া আমরা কখনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারি না। আমাদের ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে, জগতের সাকার ও স্বগুণ ভাব তাঁহাতে আরোপ না করিয়া আমরা পারি না। আমাদের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বরকে জানিতে পারি। তাঁহার নিরাকার স্বরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তির অগোচর বলিয়াই ব্রহ্মকে "অবাঙ্মনসগোচর" বলা হইয়াছে। তবে কি কখনও মানুষ ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারে না? মানুষ কি কখনও নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না? পারে বৈ কি। কিন্তু তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। তখন মানুষের মনুষ্যত্ব ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া যায়। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে মানুষ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
কঠোপনিষৎ।

ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম। তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ রহিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত। তিনি ক্ষয় রহিত, অব্যয়। তিনি অতি সূক্ষ্মতম, যে বুদ্ধি বা মহত্ত্ব তাহার ও পরবর্ত্তী ও সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে এই অবস্থাপন্ন জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

তন্দুর্দর্শং গূঢ় মনু প্রবিষ্টং
গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্ পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ কঠ।

ব্রহ্ম দুর্দ্দর্শ, কারণ তিনি অতি সূক্ষ্ম। তিনি প্রকৃতিজাত বিষয় বিকারের জ্ঞান দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। তিনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত। তাঁহাকে সেই গুহার মধ্যে দেখিতে হইলে অনেক অনর্থ ও শঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। তিনি পুরাতন। সেই দেবতাকে ধীরব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্ত মুত্তমম্॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তু রমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥
কঠ।

"আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষা অভিমান উৎকৃষ্ট, অভিমান অপেক্ষা বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, প্রকৃতি অপেক্ষা স্বয়ং আত্মা উৎকৃষ্ট—যিনি ব্যাপক, অলিঙ্গ, তাঁহাকে জানিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমৃত হয়।"

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাঽভি ক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি॥ কঠ।

ব্রহ্মের রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। চক্ষু দ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারে না। অন্তঃকরণ স্থিত বুদ্ধি ও মননরূপ সম্যগ্দর্শন দ্বারা তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যে তাঁহাকে

জানিতে পারে, সে অমৃত হয়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে।

জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম মৃত্যু প্রহাণিঃ।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

সেই পরম দেবতাকে জানিলে সর্ব্বপাশ ছিন্ন হয়, ক্লেশ সকল দূর হয়, ও জন্ম মৃত্যু শেষ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি। আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। —বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

হে মৈত্রেয়ি! সেই আত্মাকে দেখিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে পারিলে ও ধ্যান করিতে পারিলে, এই বিশ্বজগৎ সকলই জানা হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥
প্রশ্নোপনিষৎ।

"হে সৌম্য! যাহাতে সমস্ত দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, প্রাণ সমূহ এবং ভূতগণ সম্প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হয়েন"—অর্থাৎ তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

পুরুষ এ বেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।
এতদ্‌যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং
বিকিরতীহ সৌম্য॥ মুণ্ডকোপনিষৎ।

"সেই পুরুষই এই বিশ্ব, কর্ম্ম, তপ, ব্রহ্ম এবং পরম অমৃত। যিনি এই ব্রহ্মকে আপন হৃদয় গুহায় নিহিত জানেন, হে সৌম্য! তিনিই অবিদ্যাগ্রন্থি অর্থাৎ মায়াপাশ ছিন্ন করেন—মুক্ত হন।"

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে পড়িয়া স্ব স্ব নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে লয় হইয়া যায়, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া-নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হীন হইয়া সেই পরাৎপর পরমপুরুষের স্বরূপে পরিণত হন।

সযোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো
বিমুক্তোঽমৃতোভবতি॥

"যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হয়েন। শোক পাপ উত্তীর্ণ হইয়া এবং হৃদয় গুহা গ্রন্থি সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অমরত্ব লাভ করেন।" নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপে রাশি রাশি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিবাক্য সকলের দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায়, মানুষ যখন নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তখন সে সর্ব্ব প্রকার সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া যায়। উল্লিখিত শ্রুতি সকলের মধ্যে যেখানেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, আবার সেখানেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষকে তাহার মানুষত্ব, "আমিত্ব" (individuality) ছাড়িতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" এরূপ কখনও কেহ বলিতে পারে না। কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত

আমি "আমি" থাকিব, ততক্ষণ আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারিব না। "আমিত্ব" বর্জ্জন না করিলে, সেই অনন্ত পরম পুরুষকে জানা যায় না। আবার যখনই তাঁহাকে জানা যায়, তখন আর আমার "আমিত্ব" থাকিতে পারে না। তখন "আমি" আর ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। সুতরাং "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি," এরূপ কেহ কখনও বলিতে পারে না। আর যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। বোধ হয় এই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন—

যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥
কেনোপনিষৎ।

"যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে, আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি।"
নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গানুবাদ।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা এই দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম—

(১) নিরাকারব্রহ্মজ্ঞানের অন্য নাম মুক্তিলাভ।

(২) মুক্তিলাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মসম্বন্ধে আমাদের যে কিছু জ্ঞান জন্মে, সে সকলই জগৎসংশ্লিষ্ট, সুতরাং সাকার। মানুষ মোক্ষলাভের পূর্ব্বে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

নিরাকারবাদী বলেন, তাঁহার প্রচারিত নিরাকার ব্রহ্মবাদ শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তিনিও নাকি তাহাই প্রচার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ, তাহা তিনি একবারও ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখেন না। শ্রৌতব্রহ্মজ্ঞান ও নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রৌতব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। কিন্তু নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিলে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়। নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি সহজ। এমন কি, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মগণ যে যে প্রণালীতে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সে প্রণালীতে কদাচ লাভ করা যাইতে পারে না। "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" বলিয়া বিশুদ্ধ সুরতাললয় সংযোগে গান করিলেই, সেই "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" পরব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া অনর্গল বহুক্ষণ স্থায়ী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেই, সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া কোলাহল করিলেই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে না। "জ্ঞানচক্ষু", "বিশ্বাসনয়ন" প্রভৃতি রূপকময় কথা ব্যবহার করিলেই নিরাকার ব্রহ্ম দর্শনোপযোগী জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয় না। যাহা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা লাভ করার উপায় ও প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকারী সকলেই হইতে পারে না। এ বিষয় সেই শ্রুতিই বলিতেছেন—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নুয়াৎ।
কঠোপনিষৎ।

যে দুষ্কর্ম্মপরায়ণ, সে আত্মাকে (ব্রহ্মকে) পাইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়লোলাসম্পন্ন, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয় ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকে সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে নাই, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। তবে কে তাঁহাকে পাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারেন। শ্রুতি আবার বলিতেছেন

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্য লিঙ্গাৎ॥

"এই আত্মাকে বলহীন (অধ্যাত্মবলহীন) ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। বিষয়াসঙ্গ নিমিত্ত প্রমত্ত বা ত্যাগবুদ্ধিহীন ব্যক্তি তপস্যা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।"

এই সকল শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সকলের অধিকার নাই। যিনি জিতেন্দ্রিয়, বিষয়াসঙ্গবিহীন ও প্রজ্ঞ-সম্পন্ন একমাত্র তিনিই শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্মকে জানিবার, আর কাহারও অধিকার নাই। পুরাণ ও ইতিহাসে পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণের সাধনপ্রণালী ও জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্তের ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনী পাঠ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, এই সকল মনীষিগণ বিষয়-বাসনা সকল হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন। দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে দমন করিবার জন্য আজীবন যম নিয়মাদি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি ধর্ম্মানুশীলন পূর্ব্বক কামনা-পরিশূন্য হইয়া কেবল সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিয়া মন, বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃতিকে বিনাশ পূর্ব্বক অবশেষে সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পন্ন পরমাত্মাকে লাভ করিয়াছিলেন। যদি পুরাণ ও ইতিহাসকে *myth* বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও, দেও। তাহাতে কোনই আপত্তি নাই। এই সকল জ্বলন্ত তপস্তেজঃসম্পন্ন মনীষিগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিলেও শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেরূপ অশেষ ত্যাগস্বীকার, কঠোর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অসীম কৃচ্ছ্রসাধন করা আবশ্যক, এই সকল জীবন বৃত্তান্ত যে তাহার concrete example সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মগণের সাধনপ্রণালী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে যম নাই, নিয়ম নাই, জ্ঞান নাই, তপস্যা নাই, বৈরাগ্য নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই, ধ্যান নাই, ধারণা নাই, সমাধি নাই। আছে কি? যাহা আছে, তাহা না বলাই ভাল। অতএব নিরাকারবাদী নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কিনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি।" নগেন্দ্র বাবু শ্রুতিবাক্যের এই অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার মত স্থাপন করিতে চাহেন। তিনি বলেন, শ্রুতিই বলিতেছেন, নিরাকার ব্রহ্মকে

দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা যায়, ধ্যান করা যায়; তবে সাকার উপাসনার প্রয়োজন কি? যাহারা মূর্খ, তাহাদের জন্যই শাস্ত্র সাকার উপাসনা বিধান করিয়াছেন। এ স্থলে, দুঃখের বিষয় এই যে, "কাণ টানিলে মাথা আসে" নগেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। ব্রহ্মকে দেখা যায়, শুনা যায়, মনন করা যায়, ধ্যান করা যায়, যেন মানিলাম। কিন্তু তাহা কি তুমি আমি পারি? তাহা কে পারে? সেই শ্রুতিই তাহা বলিতেছেন—

"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্"।

"সেই আত্মাকে দেখিলে, শুনিলে, বুঝিলে, জানিলে, সকলই জানা হয়।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যান। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মকে দেখার কথা বলেন, তাঁহারা যখন কেহই ব্রহ্ম হইতে পারেন নাই, তখন অবশ্যই মানিতে হইবে, তাঁহাদের কাহারও নিরাকার ব্রহ্মদর্শন হয় নাই। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল, নিরাকার ব্রহ্মবাদ এদেশে প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু কোথায়, একজন ব্রাহ্মও ত ব্রহ্ম হইতে পারেন নাই? যদি বল, তাঁহারা মৃত্যুর পরে ব্রহ্ম হইয়াছেন। তাহারই বা প্রমাণ কি? আর শ্রুতি ত সে কথা বলেন না। অতএব আমরা দেখিলাম, নিরাকারবাদীর নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান কেবল কথার কথা মাত্র। তাঁহারা যে সাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বলেন, আমরা নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি, সে কেবল তাঁহাদের আত্মপ্রবঞ্চনাময় অন্ধবিশ্বাস। তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি সমর্থন করে না। এস্থলে, 'নিরাকারবাদ শ্রুতি-মূলক, এই মত চূর্ণীকৃত হইল।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, "বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, মূর্খলোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা। তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই।" এ কথা গুলি সব ঠিক। ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু "মূর্খ লোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা," ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রের অভিপ্রায় যেন মানিলাম, কিন্তু এম্, এ; বি, এ, পাশ করা, পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী পণ্ডিতের চিত্তস্থৈর্য্যের নিমিত্ত মূর্ত্তিপূজা যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা আমি মানিতে পারি না। "উচ্চশিক্ষা" পাইলেই যে, আমার চিত্ত স্থির হইবে, আমার প্রতিমা পূজার কোন আবশ্যকতা থাকিবে না, তাহা বলিতে পারি না। তাহা যদি হইত, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ ষোল আনা যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হয় কোথায়? বস্তুতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এক জিনিষ নহে। অশিক্ষিত, মূর্খ ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট সুশিক্ষিত, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ কেশব বাবু অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারেন। আবার সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী যিনি, তিনিও অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মূর্খ হইতে পারেন। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ কঠ।

"কেবল বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। কেবল মেধা বা গ্রন্থার্থ ধারণাশক্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিয়ত বেদার্থ শ্রবণের দ্বারাও আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু সেই

আত্মা যাহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। কেবল তাঁহারই নিকট আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন।”

অতএব দেখা গেল, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা কেবল শিক্ষার উপর নির্ভর করেনা। যাঁহার উপর ব্রহ্মকৃপা পতিত হয়, তিনিই অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এতভিন্ন আর সকলকেই—শিক্ষিত হউন বা অশিক্ষিত হউন—প্রতিমা পূজার ক, খ, হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। এই সকল মন্দাধিকারীর জন্যই শাস্ত্র প্রতিমূর্ত্তিপূজা বিধান করিয়াছেন। ইহাতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি অপমান বোধ করেন, তবে তিনি কখনও মুক্তিপথের অধিকারী হইতে পারিবেন না। ইহাই শাস্ত্রের মত। ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

বেঙ্গল স্যানিটারি ড্রেণেজবিল। (৪)

কাঁচা পাকা রাস্তা ও রেল-পথে পয়োপ্রণালীর অবরোধ, স্যর চার্লস এলিয়ট সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেন। কেবল অস্বীকার নহে; তিনি এই মতাবলম্বী লোকদিগের কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করিতেও অকুণ্ঠিত! এ সম্বন্ধে স্যর চার্লসের উক্তি, তদীয় ঢাকা নগরে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি;—

“As regarded the *second objection*” (obstruction of drainage by Railways and roads) “he thought it was rather curious to note that no one had taken the trouble to prove the point that this was an objection professing to be based on facts obvious to all observers, especially as regarded the railway embankments, but that it was of absolutely no value to merely assert in a general way that road and railway embankments obstructed drainage without designating the places where such obstructions occurred. It would have been easy for those who gave this as a cause, to look about them when travelling by road or by rail, and to note whether water was being ponded up and lying against the embankment, so that the country looked more water-logged on one side of it than on the other. If it was so then it might be alleged that at such and such a spot there was not sufficient water-way and that the health of the neighbourhood was suffering in consequence. But no one has asserted that he had seen any thing of this sort. Of course when great floods occured it was inevitable that those embankments prevented the water from flowing off quite as speedily as it would otherwise have done, but at such times the whole country was under water. Malaria was not caused by such flood but by the slow drying up of stagnant pools and marshes, and no one had declared that such stagnant water-pools were to be found by the railways or more on the one side than on the other. As has been said before, this particular objection was eminently capable of proof, and yet numerous authorities made and used it without feeling at all responsible for adding any proof.”

স্যর চার্লস এলিয়টের উক্তি আমরা অতি বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃত করিলাম; তাহার একটী (পাঠক ক্ষমা করিবেন)—একটী অক্ষরও অনুদ্ধৃত রাখিলাম না। কারণ আমরা চাই যে, লোকে তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝে যে, তিনি যাহা বলিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, তাহাকেই এ দেশীয়েরা চলিত কথায় বলিয়া থাকে “সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কা’র ভার্য্যা?” যে বিষয় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে এক ব্যক্তির অর্থ ব্যয়ে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, প্রমাণিত বলিয়া বিশিষ্ট ও অত্যুচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে; এবং তাহার পর এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যাহা সময়ে সময়ে

আলোচিত ও প্রদর্শিত হইয়া আসিয়াছে; তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া আজ আমাদের ছোটলাট সাহেব অনায়াসে বলিলেন "কই কে কবে তাহা প্রমাণ করিল? কে কবে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র কষ্ট স্বীকার করিল?"

কিমাশ্চর্য্যমতপরং। ইহাকেই কি বলে না "সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কাহার পিতা বা পত্নী?" কিন্তু স্যর চার্লস সাত কাণ্ড শুনিয়া বা না শুনিয়াই এ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন! অসংখ্য রাজকীয় কার্য্যের অপ্রতিহত অনবকাশে তথা অবিশ্রান্ত শকর-ভ্রমণ ও মফঃস্বল পরিদর্শন ক্লেশে, বোধ হয় ছোট লাট বাহাদুর এই রাস্তা ও রেলরোড বনাম পয়োপ্রণালীর অবরোধ ঘটিত সুদীর্ঘ ইতিবৃত্তে দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত করিবারও সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাহাতেই সম্ভবতঃ তিনি উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; নহিলে কখনই করিতেন না; অন্ততঃ করিবার পূর্ব্বে একবার একটু ভাবনা চিন্তাও করিতেন।

স্যর চার্লস এলিয়ট তদীয় উপরোক্ত ইংরেজী উক্তিতে প্রথমে বলিতেছেন; —

"বড় বড় রাস্তায় ও রেলরোডে পয়োনালী অবরোধ করিয়াছে, এই কথাটা লোকে যখন তখন বলে, কিন্তু যাহারা এ কথা বলে, তাহারা এবং তাহাদের কেহ কখনও, সেরূপ অবরোধ দেশের কোন্ কোন স্থানে ঘটিয়াছে তাহা বলিতে পারে নাই, পরন্তু সেরূপ অবরোধ কি প্রকারে ঘটিয়াছে তাহাও প্রমাণ করিবার কষ্ট স্বীকার করে নাই।"

আপাততঃ অন্ততঃ আমরা এ কষ্ট কিছু স্বীকার করিয়াছি; তাহা এই প্রবন্ধের পাঠকবর্গ জানেন। মধ্য বঙ্গের যে সকল স্থানে রাস্তায় এবং রেলরোডে গ্রাম্য পয়োনালী অবরুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহা যে প্রকারে করিয়াছে, তাহা রাজা দিগম্বর মিত্রের মিনিট এবং প্রথম এপিডেমিক কমিসনের মিনিট হইতে আমরা ইতাগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা স্থান নিচয়ের নামও করিয়াছি; এবং সেই সকল স্থানে যে প্রক্রিয়ায় রেলরোড ও রাস্তার দ্বারা পয়োনালীর অবরোধ ঘটিয়াছে, তাহাও বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়াছি। বাঙ্গালী পাঠক আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অবশ্যই বুঝিয়াছেন। অতঃপরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অবগতির জন্য আমাদের অবলম্বিত ইংরেজী মিনিট গুলির প্রতিই অতি বিনীত ভাবে, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছি। * কিন্তু, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট অত্যুচ্চে অবস্থিত। ক্ষুদ্রের ক্ষীণ স্বর তাদৃশ উন্নত স্থলে উপস্থিত হইতে পারার একান্ত উপায়াভাব।

তথাচ কর্ত্তব্যানুরোধে উপরোক্ত ইংরেজী মিনিট নিচয় হইতে এক আধ ছত্র ইংরেজী এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া স্যর চার্লস এলিয়টের উক্তির সানুনয় উত্তর দেওয়া উচিত বিবেচনা করি।

স্যর চার্লস বলেন, — "It was of absolutely no value to merely assert in a general way that road and railway embankments obstructed drainage without designating the places where such obstruction occurred."

উত্তর, "A road was run by Babu Madusudon Nundi (unprovided with a single bridge) from Mugra to Nasurye crossing the water course and thereby completely intercepting the drainage of all the villages noted above (namely the villages from Tribeni to Nasurye as also of those lying more inland) in its flow into the Koontee. This resulted in the breaking out of the epidemic a year or two after almost simultaniously in those in all those villages. In the same manner Joypur, Bagaty and the other adjacent

* (১) প্রথম এপিডেমিক কমিসনের মিনিট। ১৮৬৪ খৃঃ অঃ (২) ঐ মিনিট সংশ্লিষ্ট রাজা দিগম্বর মিত্রের মিনিট নিচয়। (৩) রাজা দিগম্বর মিত্র লিখিত ১৮৭৬ সালের ড্রেণেজ মেমোরাণ্ডাম।

villages were attacked soon after the village road from Trebeni to Mugra was raised and metalled ইত্যাদি।'

পরন্ত,—A road from Rajhat to Dwarbasini * * * has stopped its passage into the Kadermutti. There is an apology for a bridge * * but I was satisfied by personal observation that it was quite insufficient to afford free passage to the drainage of the place. * * The result is that a violent epidemic has been raging. A Kacha road * * runing from the Bordbazar of Kishnaghur to Lallbagan, crossin the water courses of Baroepara has been raised * * intercepting the drainage of that village * * and it has been followed by the breaking out of a fearful epidemic in Baroepara ইত্যাদি।

পুনশ্চ —In like manner the Eastern Bengal Railway and its feeders, when the same have crossed the water courses of villages lying on the eastern bank of the river Hooghly, and of others more inland but situated to the west of the line have obstructed the drainage of those places the fall of the villages lying on the eastern bank of the Hooghly, as I have before observed being towards the east and consequently Chagdah, Kanchrapara, Halisahar and many others similarly situated have suffered *

স্যর চার্লস এলিয়ট পূর্ব্বকথা না জানিয়া বা উড়াইয়া দিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, রাস্তায় ও রেলরোডে পয়োনালা কোথায় অবরোধ করিয়াছে, কেহ কখনও বলে নাই, বহ বলুক না। আমরা উপরে এ প্রশ্নের উত্তর দিলাম। পুনঃ উপরোক্ত মিনিট নিচয়ের আর একখানিতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সাদুনয় উত্তর দিতেছি,—

"A line of villages extending from Itchapur, adjoining the Nawabgunge manufactory to Chagdah

এইরূপে ছোট লাট বাহাদুরের প্রত্যেক উক্তি, প্রত্যেক প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া, ভূরি-ভূরি প্রমাণের সহিত তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কেবল "পুঁথি" বাড়িয়া যাইবে; এ সম্বন্ধে আমরা যে সকল পুরাতন মিনিট পেশ করিয়াছি তাহাই প্রচুর। তবে স্যর চার্লস এলিয়ট পূর্ব্ব কথা না জানিয়া বা তাহা বিস্মৃত হইয়া, সবিস্ময়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহাই যারপর নাই বিস্ময়ের বিষয়। ফলতঃ তিনি, যাহা প্রমাণিত, তাহা আদৌ উপেক্ষা করিয়া, যাহা অপ্রমাণিত, তাহারই উপর এই ড্রেণেজ বিলের গঠনে ও ব্যাখ্যায় একান্ত নির্ভর করিয়াছেন।

স্যর চার্লস প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ পন্থায় গমন করিতেছেন, ইহা বুঝা কঠিন। আমরা ক্রমে এই ড্রেণেজ বিলের ইতিবৃত্ত, মূলতত্ত্ব, ও গঠনাদির বিষয় একে একে আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। দেখাইয়াছি যে এই বিল আমূল ভ্রম সঙ্কুল, ইহা কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত হয় নাই, অথচ পূর্ব্ব পরীক্ষিত ও পূর্ব্ব প্রমাণিত পুরাতন পথ মাত্রই পরিত্যাগ করিয়াছে। স্যর চার্লস এলিয়ট প্রথম এপিডেমিক কমিশনের অভিমত ও অনুরোধ গ্রাহ্য করেন নাই, দ্বিতীয় এপিডেমিক কমিসনের কথাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরন্ত তিনি এ বিষয়ে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর নিচয়ের কথায়, এমন কি ভারতীয় সিংহাসনের অতি সন্নিহিত ও অব্যবহিত উচ্চ্চাধিকারী বিগতবর্ষের একটিন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেলের কথাতেও কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সরকারী বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের, তথা বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত একদা উপেক্ষা করিয়া এমন এক অন্ধের অপরিজ্ঞাত ও তাঁহার নিজের স্বকপোল-কল্পিত পথে চলিয়াছেন, যাহাতে করিয়া বোধ হয় যেন তিনি কি

---

* এই সকল ইংরেজী উক্তির অনুবাদ প্রবন্ধের অন্তরালেই দেওয়া হইয়াছে। পাঠক পুনরুক্তি দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

একটা অতুল কীর্ত্তির অভিলাষী। তাঁহার এই কীর্ত্তিলালসা সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও তাহা বঙ্গীয় কৃষককুলের অপরিসীম কষ্টের কারণ হইবে, ইহা কিন্তু তাঁহার এখনও প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

স্যর চার্লস এলিয়ট বা বর্ত্তমান বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যদি প্রথম এপিডেমিক কমিসনের কথা গ্রাহ্য করিতেন, তাহা হইলে প্রথমেই রাজকোষ ও রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য জল নিকাশের পথ পরিষ্কার ও প্রশস্ত করিতে হইত। অগ্রেই দূরে নদীতীরে না যাইয়া গ্রাম্য লোকের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহার অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরিষ্কার পানীয় জলাদির ব্যবস্থা করিতে হইত। পরন্তু, এই গবর্ণমেণ্ট যদি দ্বিতীয় এপিডেমিক কমিসনের কথায় কর্ণপাত করিতেন, তাহা হইলে অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্য দেশের লোকের অপ্রচুর আহার, অনাহার ও উপবাস নিবারণের চেষ্টা করিতে হইত; আর কিছুই করিতে হইত না। পরন্তু, স্যর চার্লস যদি শ্রেষ্ঠতর-প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্যর এণ্টনীর অভিমত উপেক্ষা না করিতেন; তাহা হইলে, এই বিল দ্বারা বহু ব্যয়েরও অসাধ্য এক অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বঙ্গীয় কৃষককুলের শেষ রক্তবিন্দু শোষণের উদ্যোগ করিতে হইত না। স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেল, (পাঠক জানেন, ইনি এখন সুপ্রিম লেজিসলেটিব কাউন্সিলের হোম মেম্বর) এই ড্রেণেজ ব্যপদেশে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৮৯২ সালের স্যানিটারী রেজলিউসনে লিখিয়াছিলেন ;—

The most noticeable aspect of these figures is the increased mortality due to cholera and fever. The causes assigned are the excessively insanitary condition of the towns, and in rural arreas, defective drainage and bad drinking water, and, no doubt, these are the true causes. They are suceptible of remedy with money and systematic effort. How the money is to be provided, and what the sanitary organization should be, for rural arreas, are points to which reference will presently be made; here the officiating Lieutenant-Governor would say that as sanitary improvements are expensive and not always acceptable to the people, it behoves all local authorities to concentrate their efforts on that improvement which is never unacceptable, never misunderstood and never ineffectual in preventing disease. That improvement is the provision of good drinking water; other expensive sanitary measures may wait.

স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেল বহুব্যয়সাধ্য ও সন্দেহ সঙ্কুল ড্রেণেজ কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ার পূর্ব্বে, লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্থানীয় রাজপুরুষদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু, ছোট লাট বাহাদুর সগণ অগণ, শ্বেত কৃষ্ণ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে অসম্মত। সুতরাং এই ড্রেণেজ বিলের দৌরাত্ম্য; দেশে এই অভিনব কৃষিকরের আসন্ন-আবির্ভাব।

কিন্তু কৃষক-শ্রেণী কি আদৌ এই কর দিতে বাধ্য?

আমরা এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ কৃষকশ্রেণী এই করের এক কপর্দ্দকও দিতে বাধ্য নহে ;— সমীচীন ব্যবস্থা ও ব্যবহারানুসারে নহে, সুধী ও সাধুজনসম্মত আইন অনুসারে নহে এবং এ মুহূর্ত্তের উন্নত সভ্যতার আদেশানুসারেও নহে। এই কর স্বাস্থ্যের জন্যই হউক, ড্রেণের জন্যই হউক, আর নদ্যাদি সংস্কারের জন্যই হউক, যে জন্যই হউক, কোনও ন্যায়-নীতি ও যুক্তি অনুসারে এই কর কৃষক-শ্রেণীর দেয় নহে। কৃষক যদি এই কর দিতে বাধ্যও হইত, তাহা হইলেও, এ দেশীয় কৃষক সমাজের উপ-

স্থিত করভার-বিড়ম্বিত অবস্থা ও অনাহার উপবাসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উহা তাহাদের উপর সংস্থাপন করা বিধেয় হইতে পারে না; ইহা আমরা ইত্যগ্রে প্রমাণ করিয়াছি। এখন প্রতিপন্ন করিব, কৃষকেরা এই কর দিতে কোন ক্রমেই বাধ্য নহে।

যে ভাবে যে যে শ্রেণীর প্রজার উপর এই ড্রেণেজ-কর সংস্থাপিত করিয়া অপর শ্রেণীর লোকদিগকে ইহা হইতে অব্যাহতি দিবার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে, সবিস্তারে তাহার আলোচনা করিতে হইলে, স্বতন্ত্র একটী প্রবন্ধের আবশ্যক। যদি সুযোগ হয়, আমরা বরং স্বতন্ত্র ভাবে পরে সে আলোচনা করিব। এ স্থলে অতি সংক্ষেপে এই করের কথা কিছু কহিয়া কৃষক যে তাহা দিতে কোন ক্রমে দায়ী নহে, তাহাই দেখান যাইতেছে।

পথ কর ও পূর্ত্ত-কর সংস্থাপনের পর হইতে এ দেশীয় রাজনীতির কেমনই এক গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভূমির সহিত যে সকল লোকের সংস্রব, কেবল তাহাদেরই উপর কর বসাইয়া অন্য শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোক-দিগকে তাহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইতেছে করভার হইতে কোনও শ্রেণীর লোক অব্যাহতি পাইলে, অপর শ্রেণীর তাহাতে হিংসা করা উচিত না হইতে পারে। কিন্তু, কথা হই-তেছে, এই যে, যে কার্য্যে সকলেরই সমান স্বার্থ, ইষ্ট এবং উপকার বলিয়া কথিত, সে কার্য্যের জন্য কেবল, এক, দুই বা তিন শ্রেণীর লোকে কর দিবে, অপর অসংখ্য শ্রেণীর অসংখ্য বৃত্তি ব্যবসায়ে ব্যাপৃত দেশীয় বা এ দেশ-প্রবাসী বিদেশীয় লোক সে কর দিবে না, আইনানুসারে দিতে বাধ্য হইবে না; ইহা অপেক্ষা অধিকতর অন্যায় আর কি হইতে পারে? কিন্তু, এই প্রকারের অপ-রিসীম অন্যায় আচরণই হইয়াছে, দেখিতেছি, এ দেশে আইন সংগঠনের মূলনীতি! পথ-করে ও পূর্ত্ত করে এ অন্যায় ব্যবস্থা হইয়াছে; ড্রেণেজ করেও সেই অন্যায় আচরণ পুনরুক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে।

রাজপথে সব লোকেই সমান চলে; তাহাতে সকলেরই সমান ব্যবহার ও অধিকার, কিন্তু পথ কর দেয় কেবল তিন শ্রেণীর লোকেরা। প্রথম কৃষক, দ্বিতীয় জমিদার, তৃতীয় পক্ষে, ইত্যাদি ভোগী লাখেরাজদার। অর্থাৎ ভূমির সহিত যে সকল লোকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্রব ও সংযোগ তাহারাই পথকর দিতে বাধ্য, অপরে তাহা দেয় না। কুবের বান সামী ধনকুবেরই হউন আর বিপুল বিত্তশালী দেশ প্রবাসী বিদেশীয় বণিকই হউন, পথ কর ও পূর্ত্ত কর তাঁহারা কেহই দিতে বাধ্য নহেন, কৃষক "অন্ন ভক্ষ ধনুর্গুণ" হইয়াও তাহা দিতে বাধ্য। অতি অপূর্ব বিচার বটে! পথে যেন আর কাহারও প্রয়োজন নাই, পথে পা দিয়া যেন আর কেহই হাটে না, সকলেই উড়ন্ত আকাশচর। পথে যা কিছু প্রয়োজন, তাহা কেবল ভূমি জমা জোতা লোকের, যেন তাহারাই কেবল পথ দিয়া চলে, অপরে আকাশে আকাশে চলা ফেরা করে। সুতরাং একরূপ একে কর দেয়, অপরে দেয় না। এইরূপ অতি অদ্ভুত সিদ্ধান্তানুসারেই পথকর ও পূর্ত্তকরের আইন প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বড় বড় পাকা রাস্তায় মেটাল্ডরোডে সাহেব-লোকের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, তাঁদের বগী-ক্রুচ ক্রুহেম, চেরেট, টাণ্ডাম আকাশ দিয়া উড়িয়া যায়! দেশের পাকা রাস্তার যাহা কিছু ব্যবহার, তাহা করে কেবল মেঠো-কৃষাণ ও দুই চারি কাঠা ব্রহ্মোত্তর মাত্র সম্বল-

দরিদ্র ব্রাহ্মণ! বলা বাহুল্য যে, যাহারা পথকর দেয়, তাহাদের অনেকেই কোনও পুরুষে বাঁধা রাস্তা কেমন, কখনও চর্ম্ম চক্ষে দেখে নাই।

পথকর ও পূর্ত্তকরের অবিকল অনুরূপ হইয়াই এই ড্রেণেজকর বসিতেছে। এই কর কেবল জমিজমাসংশ্লিষ্ট লোকেরাই দিতে বাধ্য হইবে। দিতে বাধ্য হইবে কেবল কৃষক, জমিদার ও লাখেরাজদার। আর কেহই নহে। ভাল, স্বীকারই বারেক না হয় করিলাম যে, তোমার এই তথাকথিত ড্রেণেজ দ্বারা দেশে অব্যাহত অসীম স্বাস্থ্যেরই সঞ্চার হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই ড্রেণেজ-সঞ্জাত স্বাস্থ্যের দ্বারা কি কেবল উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকেরই উপকার হইবে; আর কাহারই কিছু মাত্র ইষ্টসাধন হইবে না? দেশের উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোকই কি কেবল ম্যালেরিয়া রোগ-গ্রস্ত, আর কেহই নহে? তাহা যদি না হয়, তোমার ড্রেণেজ সঞ্চারিত স্বাস্থ্যের দ্বারা যদি শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল লোকেরই সমান উপকার—সমান ইষ্ট সাধিত হয়, তবে অপর সকল লোককে ছাঁটিয়া রাখিয়া কেবল ঐ তিন শ্রেণীর লোকের উপর কর বসাও কেন?

ড্রেণেজকর সংস্থাপনের সাধারণ নিয়মে ড্রেণেজবিলের এ অংশও অত্যন্ত দূষিত: অত্যন্ত অন্যায়নীতিপ্রণোদিত। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, উপস্থিত আন্দোলনে এ কথাটীর উল্লেখ প্রায় কেহই কিছু করিতেছেন না। কিন্তু এই ড্রেণেজকর যে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর বর্ত্তিতেছে, বিশেষ ভাবে তাহাই আমাদের আপাততঃ আলোচ্য।

গ্রাম্য-ড্রেণেজ সঞ্চারিত স্বাস্থ্যের জন্যই হউক, অথবা নদ্যাদি সংস্কারের জন্যই হউক, কোনও দিক দিয়াই কৃষক শ্রেণী এই কর দিতে বাধ্য নহে।

অগ্রে গ্রাম্য ড্রেণেজ-জনিত স্বাস্থ্যের কথাই কিছু আলোচনা করা যাউক। স্বীকার করা যাউক, তাহাতে অবিমিশ্র স্বাস্থ্যই উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তাহার জন্য কৃষক কর দিতে বাধ্য নহে; কর দিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য ভূম্যধিকারী জমিদার। ইহা ন্যায়-নীতির আদেশ; আধুনিক উন্নত সভ্যতার অঙ্গীকার। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধরিয়া বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাসানাল কংগ্রেসের বিগত বেঙ্গল কনফারেন্সের অধিবেশনে কথাটী অস্ফুট ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এ দেশীয় তথা কথিত কৃষক-বন্ধুবর্গের কৃষকসম্প্রদায়ের প্রতি এমনই প্রকৃত প্রাণের টান এবং এমনি জমিদার মুখাপেক্ষতার অনন্ত যে, কথাটী উপস্থিত হইতে হইতেই অশ্রদ্ধার ও অসমর্থনের অতিমাত্র ফাঁকা আওয়াজে আকাশমার্গে উধাও উড়িয়া আকাশেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল! ইণ্ডিয়ানএসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত উক্তিতে কথাটী উপস্থিত করিয়া কনফারেন্সের একটী মন্তব্য সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা কয়েকটী এই;—

"That before having recourse to any fresh taxation for the sanitary improvement of the country, the Government should recognise and give effect to the principle enunciated by Professor Thorold Rogers that it is the duty of every land-lord to keep his land in a habitable condition by making adequate provision for pure water, proper drainage and free access of air and light which are essential conditions of healthful living."

অর্থাৎ দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অভিনব কর সংস্থাপনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের উচিত, অধ্যাপক থোরল্ড রজার্সের ব্যাখ্যাত ব্যবস্থা অনুমোদন করত তাহা কার্য্যে পরিণত করা। অধ্যাপকের উক্তি এই যে,

স্ব স্ব অধিকার মধ্যে রায়ত লোকের আবাস ভূমিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, উপযুক্ত পয়োনালী এবং অবাধ আলোক ও বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করা, তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী করা, প্রত্যেক ভূম্যধিকারীরই প্রধান কর্ত্তব্য; কেন না, ঐ সকল উপাদান স্বাস্থ্যরক্ষার্থে একান্ত আবশ্যকীয়।"

বলাবাহুল্য, ইহা কেবল উপরোক্ত অধ্যাপকের অভিমত নহে ? ভূম্যধিকারীর কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার আদেশ। কিন্তু আক্ষেপ এই, এ দেশীয় জমিদার মহাশয়েরা কর্ত্তব্যের এ আদেশ কচিৎ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিয়া উপরোক্ত উক্তি কনফারেন্সের মন্তব্যে প্রকটিত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু, কেবল মাত্র এক ব্যক্তি ব্যতীত এই ন্যায্য প্রস্তাব সমর্থন করিবার জন্য অপর একটী সভ্যও উত্থিত হয়েন নাই!! পক্ষান্তরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক স্বয়ং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রস্তাবকে অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চিত ও অনিষ্টকর বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তা দিবারই কথা বটে! নহিলে অকৃত্রিম প্রজা-নীতি ও আকণ্ঠপূর্ণ রায়তসহানুভূতি প্রকাশ পাইবে কেন! প্রকৃত প্রজানীতির এ প্রকার কলঙ্ক কবে এদেশ হইতে দূরীভূত হইবে বলা যায় না। বিহার সার্ভের প্রতিবাদ করিয়া ঐ ন্যাসান্যাল কংগ্রেস নিজেই যখন এ কলঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন, তখন আর অন্যের কথা কি ?

ফলতঃ এদেশে প্রকৃত প্রজানীতি অদ্যাবধি আবির্ভূত হয় নাই। তাহা যদি হইত, রায়ত শ্রেণী যদি অথর্ব্ব, অচল, নির্ব্বাক্ না হইত, দেশে দরিদ্রের বন্ধু যদি দুই দশজনও থাকিত—কৃষকের আপনার বলিবার যদি কেহ থাকিত, তাহা হইলে দ্বারিক বাবুর উপরোক্ত প্রস্তাব উপলক্ষে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইত সন্দেহ নাই; এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, অন্যান্য ন্যায্য আন্দোলনের ন্যায় ড্রেণেজবিলের এই আন্দোলনেরও এমন করিয়া "অন্তর্জ্জলী" হইত না। কিন্তু, প্রকৃত প্রজা-নীতি কোথায় ? যদি এখানে কোনও প্রকার নীতি থাকে, তাহা ধনীর নিকট ধানাধরানীতি।

নদ্যাদি পরিষ্কার ও সংস্কারের জন্যও কৃষক কর দিতে বাধ্য নহে। কৃষক কেন তাহার জন্য কর দিবে? নদীর ফেরি ও টোল টেক্স লয়েন গবর্ণমেণ্ট, জলকর লয়েন জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট উভয়ে। কৃষক নদী সংস্কারের জন্য কর দিবে কেন? নদীর উপস্বত্বে তাহার অধিকার কি? যাঁহারা তাহার উপস্বত্বের অধিকারী তাঁহারাই তাহার সংস্কার করিতে ন্যায়ানুসারে বাধ্য।

নদীতীরনিবাসী কৃষক নদীর জল খায় বটে। তা, তেমন সূর্য্যের উত্তাপও লয়, আকাশের বায়ুও অবাধে গ্রহণ করে। চন্দ্রের কিরণ ও তাহার গৃহ প্রাঙ্গণে পতিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের তাপ, আকাশের বায়ু, বা চন্দ্রের জ্যোতি ব্যবহার করার জন্য যখন কৃষকের নিকট কর আদায় করা সে দিন ন্যায়ানুমোদিত হইবে, সেই দিনই নদীর জল পান করার নিমিত্ত সে কর দিতে বাধ্য হইবে; তাহার পূর্ব্বে নহে। তা বর্ত্তমান বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের শাসনে সে দিন সত্যই কি উপস্থিত হইয়াছে?

কথা উঠিয়াছে, কথা ইঙ্গিতে গবর্ণমেণ্টই উঠাইয়াছেন যে, এই ড্রেণেজ নামক নদ-নদীর সংস্কার-উন্নতিতে কৃষকের শস্য-

ক্ষেত্রের উন্নতি হইবে; সুতরাং সে নদী ঝাড়াইবার কর দিবে না কেন? কিন্তু নদী-সংস্কারে সাধারণতঃ শস্য ক্ষেত্রের উন্নতিটা কিপ্রকারের এবং কোন দিক্ দিয়া হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা কিছুই খুলিয়া বলেন নাই। বাঙ্গালার কোন কোনও জিলার কৃষক শস্য-ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে (অর্থাৎ কচিৎ অত্যধিক শুষ্কতা উপস্থিত ও বৃষ্টিপাতের একান্ত অভাব হইলেই) সেঁচের জল ব্যবহার করিয়া থাকে বটে। কিন্তু, সে কচিৎ এবং কোন কোনও স্থানে মাত্র। পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গে সেঁচের ব্যবহার প্রায় কোথায়ও নাই। যে ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদের সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, তাহাদের তীরে সেচের ব্যবহার কোথায় আছে, দেখাইয়া দিলে বুঝিতে পারিতাম। পক্ষান্তরে সেচের জলের কর আদৌ এক অভিনব কথা। বিহারে ও বাঙ্গালার এক আধ জিলার শস্য ক্ষেত্রে কেনালের জল উঠাইয়া দিয়া কর লওয়া হইতেছে বটে। কিন্তু, এই ড্রেণেজবিলের উদ্দেশ্য কি কেনাল কাটিয়া "এনিকট্" বাঁধিয়া কৃষকের শস্যক্ষেত্রে জল যোগাইবার ব্যবস্থা করা? তা, এখানকার কোথায়ও ত কেনাল কাটা জলের আবশ্যক হয় নাই; কৃষক সে জন্য কাহারও কাছে প্রার্থনাও করে নাই। পরন্তু, কেনালের কৃত্রিম জলে বিহারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, এ কথাও প্রকাশ; সে দিন পায়োনিয়র পত্রে কোনও কৃষি ব্যবসায়ী এঙ্গলোইণ্ডিয়ান লেখক এ কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কি তাহাতে দৃষ্টি পতিত হয় নাই? পুনশ্চ ড্রেণেজ দ্বারা কৃষি কার্য্যের উন্নতির পরিবর্ত্তে যেরূপ বিভ্রাট সম্ভাবনা, ধানকুনী বিলের ড্রেণেজই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সে বিভ্রাটকাহিনী পাঠককে কিঞ্চিৎ শুনাইতাম; কিন্তু স্থান নাই।

তা, ড্রেণেজ দ্বারা শস্য-ক্ষেত্রের উপকারই হইবে, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করা যায়,—সে জন্যও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষক কর দিতে বাধ্য নহে। আইন অনুসারে সে কর জমিদারদিগেরই দিতে হয়। অগ্রে ড্রেণেজ করিয়া, ক্ষেত্রের কি উন্নতি হইয়াছে দেখাও, তাহার পর জমিদার জোতদারের জমার হার বৃদ্ধি করিবেন। বেঙ্গল টেনেন্সি আইনে তাহারও ত বিশিষ্ট ব্যবস্থা আছে।

সাহেবেরা নেটিবদিগকে নোঙ্গরা বলিয়া যতই অপবাদ দিউন, আর অপমান করুন; দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষা স্বাস্থ্য-বিধান নেটিবদের মধ্যে কাহারও অনভিমত নহে। আমরা স্বাস্থ্যবিধানের সম্যক্ পক্ষপাতী, এবং তজ্জন্য অবিলম্বে কোনও উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক, ইহাও বার বার বলিতেছি। কিন্তু, ড্রেণেজ আইনের এই আলোচ্য পাণ্ডুলিপি দ্বারা সে উপায় হইবে না; উপকারের পরিবর্ত্তে মহা অপকার ও অত্যাচার হইবে, ইহা নিশ্চয়। এ নিশ্চয়তা আমরা বোধ হয়, এই প্রবন্ধে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিপন্নও করিয়াছি। তবে শ্রদ্ধাস্পদ স্যর চার্লস্ এলিয়ট্ ও তাহার গবর্ণমেণ্ট যে এ ব্যাপারে সদুদ্দেশ্য ও সদাবুদ্ধপে সরলতাপ্রণোদিত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রবন্ধের আরম্ভ হইতে বার বার ইহা বলিয়াছি; উপসংহার কালেও পুনরুক্ত করিলাম।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

গীতা সমালোচনা।

আজ কাল গীতার বড় আদর। সকল গৃহেই প্রায় গীতা দৃষ্ট হয়। গীতার বহুবিধ সংস্করণ ও অনুবাদ হইয়াছে। গীতার প্রশংসা আর লোকের মুখে ধরে না। একমাত্র গীতা পাঠ করিলে অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের আর আবশ্যক নাই, শ্রীধর স্বামী এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুমাত্রেই এ কথা মুক্তকণ্ঠে অনুমোদন করেন। কেবল ভারতবাসী আর্য্য সন্তান নয়, ম্লেচ্ছ কুলোদ্ভব ডেলিনিউসের (Daily News) বর্ত্তমান ইংরাজ সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে ধম্মপদ, বাইবেল, এবং গীতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। তাহাদের মধ্যে গীতাই আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গীতার সহিত তুলনা করিলে ইউরোপের রাজত্ব এবং সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের পার্থক্য, স্বর্গ এবং পরকালের কথা কেবল মাত্র গীতা পাঠেই অবগত হওয়া যায়। গীতার এরূপ প্রশংসা কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহার সমালোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক প্রকার অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলিই ভ্রমপূর্ণ। নিজের মানস সম্ভূত হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ কেহ বা কোন কোন স্থলে স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়াছেন, কেহ বা অনুবাদ না করিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহার সহিত মূলের অনেক স্থলে কোনমাত্র সংস্রব নাই। শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতিকেও গীতার অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; হিন্দুধর্ম্মের এমনই দুরবস্থা উপস্থিত।!!

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ সর্ব্বাপেক্ষা মূলানুযায়ী (literal) এবং উপরিউক্ত দোষ সকল বিবর্জ্জিত। তাঁহার অনুবাদ মূলের সহিত শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহারই অনুবাদ অবলম্বন করিব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র গীতার ঘটনা স্থল। উক্ত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুন গীতোক্ত উপদেশমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৌরব এবং পাণ্ডবগণ সংগ্রামাভিলাষে ধর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। এক দিকে ভীষ্মদ্রোণ কর্ণপ্রমুখ কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, অপর দিকে পাণ্ডবেরা উপযুক্ত রূপে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান। তখন প্রতাপবান্ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরক্ষণে ভেরি, শঙ্খ, পণব, আনক, গোমুখ সকল বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। পাণ্ডবেরাও নিরস্ত রহিলেন না। বাসুদেব অর্জ্জুন ভীমসেন যুধিষ্ঠির নকুল ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হৃদয় বিদারিত করিয়া আপন আপন শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন সারথি বাসুদেব তাঁহার আদেশে উভয় পক্ষের বল নিরীক্ষণার্থ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ সংস্থাপন করিলেন। কপিধ্বজ পাণ্ডব দেখিলেন, উভয় সৈন্যের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল ভ্রাতা পুত্র পৌত্র সখা প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধে জীবন সংকল্প করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সমরাভিলাষী আত্মীয়-

গণকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মুখ শুষ্ক ও দেহ অবসন্ন কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সমুদায় ত্বক্ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তিনি কাতরস্বরে কহিলেন :—

"হে গোবিন্দ, এ সকল আত্মীয়গণকে নিহত করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। আমি জয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য সুখও চাহি না। যাহাদের নিমিত্ত রাজ্য ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়,সেই আচার্য্য,পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক প্রভৃতি আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন কি? ইহারা আমাদের বধ্য করিলেও আমি ইহাদের বধ করিতে পারি না। হে মাধব, আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমি কি প্রকারে সুখী হইব? কৌরবগণের চিত্ত লোভদ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়াই যেন ইহারা কুলক্ষয়জনিতদোষ এবং মিত্রদ্রোহ জনিতপাপ দেখিতেছে না। কিন্তু হে জনার্দ্দিন, আমরা কুলক্ষয়ের দোষ অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত এই পাপযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলে কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। কুল অধর্ম্মে পূর্ণ হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। এবং তাহা হইতে বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ঐ বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়গামী করে। কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তাহারা স্বর্গ হইতে পতিত হয়। হায় কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেছি। রাজ্য সুখ লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া রথের উপর উপবেশন করিলে ধার্তরাষ্ট্রগণ যদি আমাকে বধ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে।"

অর্জ্জুন এই বলিয়া শোকাকুলচিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুনের এই সকল কথা শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে শাক্যসিংহ বা যিশুখ্রীষ্টের অবতার বলিয়া বোধ হয়। যে কৌরবগণ তাঁহাদের অন্যায় পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় অপহরণ করিয়া বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দান করিতে অস্বীকৃত, যাহাদের জন্য দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাসের অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি এরূপ অমানুষিক দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন নিজ মনের মহত্ব দেখাইলেন। কৌরবগণ তাহাদের আজন্ম শত্রু। জতুগৃহ দাহ ও সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা করিয়া তাহাদের কলুষিত হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে। অস্ত্রহস্তে উপস্থিত এরূপ শত্রুকে সম্মুখসংগ্রামে হত্যা করিতে কোন বীরই পরাঙ্মুখ হয় না। শত্রুকে শাস্তি প্রদান করা মানবের প্রকৃতি, কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করা ঈশ্বরের ধর্ম্ম। অর্জ্জুনের হৃদয় সেই স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া জ্ঞাতিনিধনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। পাঠক হয় ত ভাবিবেন যে, কৃষ্ণ যখন ঈশ্বরের অবতার বলিয়া দাওয়া করেন, তখন তিনি অর্জ্জুনের সেই সাধু ইচ্ছার পোষকতা করিবেন, এবং নরহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিবেন; ঈশার ন্যায় মহাশত্রুর উপকার করিতে আদেশ করিবেন। কিন্তু কৃষ্ণের হৃদয় মর্ত্ত্যের মানবের ন্যায় প্রতিহিংসাপূর্ণ। তিনি অর্জ্জুনের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন—

"হে পরন্তপ তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরীকৃত করিয়া উত্থান কর। ঈদৃশ বিষম সময়ে কি জন্য অনার্য্যজনোচিত স্বর্গপ্রতিরোধকর এবং অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল।"

জ্ঞাতি বধই বোধ হয় কৃষ্ণের মতে আর্য্যজনোচিত কার্য্য, এবং গুরুহত্যা পিতামহহত্যাই স্বর্গ গমনের এবং কীর্ত্তিস্থাপনের একমাত্র উপায়।

কৃষ্ণের এই বাক্যে অর্জ্জুনের মোহ অপনোদন হইল না। তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন।

"ভগবন্, আমি কিপ্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম এবং

দ্রোণকে শরজাল দ্বারা বিদ্ধ করিব। গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ভিক্ষায় ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। এই যুদ্ধে জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টার গৌরব অধিক, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, যাহাদিগকে বধ করিয়া ভূমণ্ডলের রাজ্য এবং সুর লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ শোকে পরিশুষ্ক হইবে, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধার্থে উপস্থিত।"

ইহা বলিয়া আমি যুদ্ধ করিব না বলিয়া ধনঞ্জয় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

কৃষ্ণ দেখিলেন, যথোপযুক্ত উত্তর দিয়া অর্জ্জুনের ন্যায়সঙ্গত আপত্তির খণ্ডন করা দুরূহ। যখন তর্কে পারা যায় না, তখন গম্ভীর ভাবে মুরুব্বিআনা চালে—"বাপু হে তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই, এ সকল শাস্ত্রীয় কথা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন; তুমি বুদ্ধিমান হইয়া এরূপ কুতর্ক করিতেছ কেন?" ইত্যাদি বলিয়াও জয়ী হওয়া যায়। কৃষ্ণ এখন সেই পথ অবলম্বন করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই:—

"অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিত হইয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ কেন? শরীর অনিত্য, কিন্তু শরীরী আত্মা নিত্য এবং অবিনাশী। মৃত্যুর পর আত্মা দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। তুমি আমি এবং রাজন্যবর্গ জন্মের পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলাম, মৃত্যুর পরও থাকিব। জীবাত্মা শস্ত্র ছেদিত হয় না, বা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। তিনি কাহাকেও বধ করেন না, বা করিতে আদেশ করেন না। জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির জন্ম অপরিহার্য্য। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দচিত্তে জ্ঞাতিবর্গকে সমূলে নির্মূল কর। কেবলমাত্র তাহাদের শরীর বিনষ্ট হইবে। আত্মার কিছুই হইবে না, সুতরাং তোমারও কোন পাপস্পর্শ হইবে না।"

বেশ্ কথা, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অর্থের জন্য কেহ পিতৃহত্যা করিলেও গীতা-দুয়ারী কৃষ্ণোপাসকগণ তাহার কিছুমাত্র দোষ দিতে পারিবেন না। এই সকল কথা শুনিলে Julius ceasar নাটকের Cassius এর উক্তি মনে পড়ে:—

Cassius —He that cuts off twenty years of life, cuts off twenty years of fearing death

Brutus —Grant that and then is death a benifit; so we are Ceasar's friends, that have abridged his time of fearing death.

তৎপরে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মগরিমা বৃত্তি উত্তেজিত করণাশায় বলিলেন যে, "তুমি এক জন মহারথী হইয়া যুদ্ধ না করিলে অন্যান্য বীরগণ তোমাকে ভীরু বলিয়া উপহাস করিবে। আর সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, জয়ী হইলে পৃথিবী উপভোগ করিবে। দুই দিকেই লাভ, অতএব তুমি যুদ্ধ কর।"

এই সকল "তত্ত্বজ্ঞানের" কথা প্রকাশ করিয়া বাসুদেব কর্ম্মযোগ বিষয়িণী বুদ্ধি কীর্ত্তন করিলেন। তিনি বলিলেন "হে ধনঞ্জয়, তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান কর" ইহাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব। এই সকল সুন্দর উপদেশের জন্য গীতার এত আদর। এই স্থানে বাসুদেব বেদোক্ত যজ্ঞাদি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তীচ্ছু ব্রাহ্মণগণকে বিলক্ষণ উপহাস করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে তাহার সমালোচনা করিব। এই সকল শাস্ত্রীয় কথা শুনিতে শুনিতে অর্জ্জুনের "সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ" ব্যক্তির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা হইল। কৃষ্ণ তাহা বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করিলেন:—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

"যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত। সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সেই মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ"

কখন জ্ঞানের কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তজ্জন্য তিনি বলিলেন "হে জনার্দ্দন, যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে কি নিমিত্ত এই অধর্ম্মকর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ। যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, এমন এক পক্ষ নিশ্চয় করিয়া বল।" ভগবান বাসুদেব বলিলেন, পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, এবং জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতেপারে না। "কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ" তদ্বিষয়ে অনেক নজীর দেখাইলেন, যথা (১) জনকাদি ঋষিরা নাকি কেবল মাত্র কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। (২) সৃষ্টির সময় প্রজাপতি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, প্রজাগণ যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা দেবতাগণকে সংবর্দ্ধিত করিবেন, এবং দেবতাগণও বৃষ্টি দ্বারা অন্নের উৎপত্তি করিয়া প্রজাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন। এই ঘোর কলিকালে যজ্ঞকর্ম্ম যেরূপ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে দেবতাকুলের যেন কোন কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য। খৃষ্টীয়ান্ মুসলমান প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির নিকট ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। "কারণ তাহারা এমন চোর যে, পঞ্চ-যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ না করিয়াই দেবগণদত্ত অন্নাদি ভোগ করে"!!!

শ্রীভগবান আরও বলিলেন যে "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহার অনুসরণ করে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের কর্ম্মসকল নিষ্ফল ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করিয়া স্বয়ং সর্ব্ব প্রকার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন।" অর্থাৎ অজ্ঞ ও মূর্খকে অজ্ঞ ও মূর্খ রাখিতে বিজ্ঞব্যক্তি বিধিমত চেষ্টা করিবেন। পাছে মূর্খ লোকের অর্থশূন্য বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি সন্দেহ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন পুরোহিতবর্গের অলিপ্সতা এবং অর্থলাভ কম হয়, তজ্জন্য বুদ্ধিমান লোকেরা সেই সকল কর্ম্মকে নিষ্ফল জানিয়াও তাহাদের প্রতারণার জন্য স্বয়ং আচরণ করিবেন!!! একথা কেবল ব্রাহ্মণ গীতাকারের মুখেই শোভা পায়।

কৃষ্ণের তৃতীয় সর্গের শেষ যুক্তি এই:—অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তাহাতে তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। অতএব তিনি নিঃশঙ্ক-চিত্তে জ্ঞাতি হত্যায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কারণ, আপনার জাতিধর্ম্ম প্রতিপালন করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত।

> শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। হাইকোর্টের শূদ্র-বিচারপতি এবং উকিলগণ! আপনাদের গীতায় ভক্তি থাকিলে এই দণ্ডেই আপনাদের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া দ্বিজগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইবেন। ভিষক্‌কুলতিলক শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ স্বামী আয়ুর্ব্বেদ পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচাররূপ ব্রাহ্মণোচিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া গীতার অবমাননা করিতেছেন, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইতেছেনা। তিনি ত স্বয়ংই "গীতার্থসন্দীপনী" ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, একের যাহা ঔষধ, অন্যের তাহা বিষ। সনাতন ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করা বিপ্র-বর্গের স্বর্গলাভের উপায় হইলেও বৈদ্যাদি শূদ্রজনের অধোগমনের সেতু। পণ্ডিত প্রবর মহামতি Monier Williams উল্লিখিত

শ্লোকের এইরূপ ভাবার্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

> "Better to do the duty of one's caste,
> Though bad and ill performed and
> fraught with evil,
> Then undertake the business of another,
> However good it be."

Remembering the sacred character attributed to this poem and the veneration in which it has always been held throughout India we may well understand, that such words as these must have exerted a powerful influence for the last 1800 years tending as they must have done to rivet the fetters of caste institutions which for several centuries preceeding the Christian Era not withstanding the efforts of the great Liberator Budha, increased year by year, their hold upon the various classes of Hindu society, impeding mutual intercourse, preventing healthy interchange of ideas and making national union almost impossible

চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে যোগের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য ভগবান বাসুদেব এক 'আষাড়ে অবতারণা' করিয়া বলিলেন, আমিই প্রথম সূর্য্য ঠাকুরকে যোগের কথা বলি। আদিত্য (বোধ হয় মর্ত্তালোকে একদিন বেড়াইতে আসিয়া) মনুকে বলিয়া যান, মনু বলেন ইক্ষ্বাকুকে এবং নেমি প্রভৃতি রাজগণ ইক্ষ্বাকুর প্রমুখাৎ অবগত হয়েন। কালক্রমে এই বিদ্যার লোপ হয়। তুমি আমার বিশেষ ভক্ত বলিয়া আজ আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ধনঞ্জয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাধব, প্রভাকরের জন্ম হইবার অনেক পরে তোমার জন্ম। অতএব তুমি তাহাকে অগ্রে কিরূপে বলিলে? কেশব বলিলেন, এ জন্ম হইবার পূর্ব্বে আমার অনেক জন্ম হইয়াছিল, সেই সময় আমি বলি। এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের দুই একটী বৃত্তান্ত শুনাইয়াদিলেন।

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

মধুসূদন কোন্ সময় দুষ্টদিগের নিপাত করিয়া কোথায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিণামই বা কি, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু কালের এরূপ কুটিল গতি যে, দুষ্ট ম্লেচ্ছগণ তাঁহারই রাজ্য বিনাশ করিতে বসিয়াছে। সুরধুনী কাব্যে একথা তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরায়—

> নিকুঞ্জ মন্দির দ্বার হইল মোচন,
> বাহির হইল রাধা মদনমোহন,
> বিষাদিনী বিনোদিনী নীলনেত্রে নীর,
> মলিন মধুর মুখ আরক্ত অধীর,
> উপনীত উভ যত্ত প্রবাহিনী তট,
> কিশোরী কহিল বাঁধি নাথের নিকট।
> কেন নাথ অকস্মাৎ এ ভাব তোমার,
> কি জন্য ত্যজিতে চাও ব্রজ এ সংসার?
> রাধার বচন শুনি মদনমোহন,
> বলিলেন মৃদুস্বরে এই বিবরণ,
> অজ্ঞানের অন্ধকারে ভারত মন্দিরে,
> আধিপত্য এতদিন উন্নত শরীর
> করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি,
> জ্ঞানালোকে আলোকিত হয় ত মেদিনী,
> গিয়াছে আঁধার দূরে ভেঙ্গেছে মন্দির,
> কতক্ষণ ঢাকা রহে মেঘে ত মিহির?
> বলিতে বলিতে শ্যাম নীরস বদন,
> ঝাঁপ দিলা কালিন্দীর মাঝে ভেসে যান।
> কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী,
> পশিল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী।

এই সর্গে যোগের অনেক কথা আছে, যথা—"কোন কোন যোগী প্রাণবৃত্তিতে অপান বৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া, অপানবৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া রেচক এবং প্রাণ অপানের গতিরোধ করিয়া কুম্ভক রূপ প্রাণায়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার হইয়া প্রাণেন্দ্রিয় সমুদায়কে হোম করিয়া থাকেন"। যোগে আমাদের

বিশ্বাস নাই। বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহার সমর্থন করে না। যোগশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা জীবাত্মার উন্নতি এবং অমানুষিক শক্তিলাভ হইতে পারে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যোগ-সম্বন্ধে আমাদের দেশের "মুখোজ্জলকারী" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত C. I. E. বলেনঃ—

"As a system of Philosophy yoga is valueless. Patanjali tried to blend the idea of a Supreme Diety with the philosophy of Kapila, but unfortunately, he also mixed up with it much of the superstition and mystic practices of the age. In later times the philosophy of the yoga system has been lost sight of, and the system has degenerated into cruel and indecent Tantrik rites or into the impostures and superstitions of the so called Yogins of the present day."

এবং যোগশাস্ত্রসম্ভূত তন্ত্রশাস্ত্র এবং তদুক্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বলেন—'Ignorance is credulous and feebleness hankers after power. And when a superstitious ignorance and a senile feebleness had reached the last stage of degeneracy, men sought by unwholesome practices and unholy rites to acquire that power which Providence has rendered attainable only by a free, open, and healthy exercise of our faculties, moral, intellectual and physical. Tantra literature represents a diseased form of human mind.' Monier Williams বলেন, "The yoga is scarcely worthy of the name of a system of Philosophy. All these mortifications (i. e. those undergone by the Yogins) are explicable by their connection with the *fancied attainment of extraordinary sanctity and supernatural powers*."

অন্যান্য ইউরোপীয় এবং অনেক দেশীয় পণ্ডিতগণের এই মত।

যোগ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন, তোমার সম্যক্ জ্ঞান হয় নাই। জ্ঞান থাকিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধজনিতমোহে অভিভূত হইতে না! (৪র্থ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক) অর্থাৎ একবার ভাল করিয়া জ্ঞান জন্মাইলে, গো-ব্রাহ্মণ হত্যা করিতে তোমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ থাকিবে না। এরূপ জ্ঞানকেই বোধ হয় চলিত ভাষায় টন্‌টনে জ্ঞান বলে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কেশব, কর্ম্মযোগ এবং কর্ম্মত্যাগের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা অবধারিত করিয়া বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

"তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।" দীর্ঘ জটাশ্মশ্রুধারী গঞ্জিকাসেবী অলস কর্ম্মশূন্য সন্ন্যাসিগণের প্রতি গীতাকার বড়ই বিরক্ত। তিনি ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেনঃ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।

"যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, তিনি সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী, কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি (যজ্ঞকর্ম্মাদি) ও পূর্ত্ত (পুষ্করিণী খনন, পথ প্রস্তুতাদি) প্রভৃতি (সাধারণের হিতকর) কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন।" গৈরিকবসনধারী পরভাগ্যোপজীবী জ্ঞানানন্দ স্বামী, প্রেমানন্দ স্বামী, বগলানন্দ স্বামী প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর ধূমপায়ী পরমহংসগণ এবং তাঁহাদের ভক্ত এবং প্রতিপালক হিন্দু-মহোদয়গণকে, আমরা গীতার এই শ্লোকটী স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

এই সর্গে যোগ সাধনের অনেক উপায় বর্ণিত আছে। যথা "পবিত্র স্থানে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত অনতি উচ্চ অনতি-নিম্ন স্থিরতর আসন সংস্থাপন করিয়া, শরীর মস্তক গ্রীবা সরল ভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্য দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে।" এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা ঐহিক বা পারলৌকিক কোন উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, তাহা আমরা জানি না। পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদের ভোজন-স্পৃহা বা নিদ্রাভিলাষ কিঞ্চিৎ অধিক, তাঁহারা

মাত্রা একটু কমাইয়া দিবেন, আর যাহারা অল্প আহার করেন, বা অত্যল্প সময় নিদ্রা যান, তাঁহারাও মাত্রা কিছু বাড়াইবেন। নচেৎ তাঁহাদের সমাধি হওয়া দুষ্কর। অর্জ্জুন দেখিলেন, যোগটা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তজ্জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি "কেহ প্রথমে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে যত্নহীন হইয়া যোগ-ভ্রষ্টচেতা হয়, সে যোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? সে কি যোগ কর্ম্ম (মোক্ষ ও স্বর্গ) উভয় হইতে ভ্রষ্ট হয়?" কৃষ্ণ বলিলেন "যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্যলোকে বহুবৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধনসম্পন্নদিগের গৃহে অথবা বুদ্ধিমান যোগীদের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।" অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান বাসুদেব বলিলেন "যে ব্যক্তি একান্ত মনে অন্তিম কালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।" এই শ্লোকটী বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য কোন বঙ্গীয় ভাষাকার অশেষ আয়াস সহকারে অনেকগুলি নজীর সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা (১) তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয় প্রযুক্ত, ভ্রমর কীট (কাঁচপোকা) চিন্তা বশতঃ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে নিজ দেহ পরিহার পূর্ব্বক ভ্রমর ভাবাপন্ন হইয়া যায়। (২) নন্দীকেশ্বরী সর্ব্বদা সদাশিবে ভাবনা করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন।" এরূপ রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তিনি প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। তিনি বলেন যে "যে বিষয়ের তীব্র চিন্তা সর্ব্বদা মনোমধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে, মনোময় সূক্ষ্ম শরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়।" তবে ত শ্রীক্ষেত্রবাসী যে সকল লোক মৃত্যুকালে দারুব্রহ্মের অঙ্গবিহীন রূপ চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, পর জন্মে তাহাদের হস্ত পদাদি শূন্য হইয়া জন্মাইবার সম্ভাবনা। ম্রিয়মান ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, স্রোতস্বিনী ভাগিরথী পার্শ্বে শয়ন করিয়া পুণ্যসলিলার স্নিগ্ধবারি পান এবং তরঙ্গমালা সুশোভিত জলরাশি দর্শন করিতে করিতে যদি অন্তিম কালে কেবল মাত্র জলের রূপই মনে পড়ে, তবে ত তাহাকে পরজন্মে জল হইয়া থাকিতে হইবে।

এত পদার্থবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের ছড়াছড়ীর ভিতর, নন্দদুলাল কাযের কথাটী বিস্মৃত হইবার লোক নন। তিনি অর্জ্জুনকে সার কথা বলিয়াছিলেন যে,বৃথা বাক্য ব্যয় দ্বারা কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

সকল সময় আমাকে অনুসরণ কর এবং যুদ্ধ কর। নবম সর্গে হৃষীকেশ, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবের আরাধনার অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া বলিলেন যে "দেবতাপূজকগণ দেবলোকে, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোকে গমন করেন। যাহারা ভূতের উপাসক তাহারা ভূত হন। কিন্তু যাহারা আমার উপাসক, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন"। এরূপ কথা তিনি পূর্ব্বেও অনেক বার বলিয়াছিলেন। "অন্য উপাসকের স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও (পুত্রলাভ শত্রুজয়াদি বিষয় বাসনা দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া) প্রসিদ্ধ উপবাসাদি নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভূত প্রেতাদি ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে" (৭ অধ্যায় ২০ শ্লোক)। আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসে বঙ্গদেশে অনেক দেবতাই ষোড়শোপচারে পূজা পাইয়া থাকেন। তাহারাই গীতোক্ত ক্ষুদ্র দেবতা কি না, তাহা ভক্ত মাত্রেরই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, বহুবিধ অর্থ ব্যয় এবং

অশেষ শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া শেষে ভূত পূজার ফল স্বরূপ প্রেতত্ব পাইতে হইলে, অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। আর দেবতা পূজারই বা প্রয়োজন কি? ভগবান তো স্পষ্টাক্ষরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, দেবতা পূজার ফল ক্ষণস্থায়ী। বেদত্রয় বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে পরলোকের মোক্ষ হয় না, তাহাদের পুণ্যসত্বর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বারম্বার তাহাদের জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং।

"যাঁহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করেন, আমি সেই সকল সদেকনিষ্ঠব্যক্তিদিগকে প্রার্থনা না করিলেও যোগমোক্ষ অন্নবস্ত্রাদি অথবা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি" অর্থাৎ ভক্তের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভগবান [illegible] গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্তকে তজ্জন্য চেষ্টা ও [illegible] হয় না। পাপী এবং শূদ্রেরও নিরাশ হইবার কারণ নাই। কারণ, "যাহারা নিকৃষ্ট জাত বা [illegible] পাপাত্মা, যাহারা কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়ন বিরহিত শূদ্র ও স্ত্রীলোক, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে"। (৯ অধ্যায় ৩২শ্লোক) যদি ব্রহ্মোপাসনাই মোক্ষ লাভের এক মাত্র উপায় হয়, যদি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে সকল পাপ—সকল দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তবে কেন ভাই অনর্থক ভূতের উপাসনা করিয়া শরীর মন কলুষিত কর?

দশম অধ্যায়ের নাম বিভূতিযোগ। এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর আপনার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের এক তালিকা দিলেন। তাহার দুই একটী নমুনা দিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন, আমি—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ; হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত; অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা; সবিষ ভুজঙ্গের মধ্যে বাসুকি; এবং নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মধ্যে অনন্ত; মৎস্যের মধ্যে মকর; অক্ষরের মধ্যে অকার; সমাসের মধ্যে দ্বন্দ; মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভারতর্ষভ।

সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত (স্বীয় বনিতাতে পুত্রোৎপত্তি মাত্রের উপযোগী) কাম ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন একটা মস্ত আব্দার করিয়া বসিলেন। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, আমাকে তোমার 'বিশ্বরূপ' দেখাও। কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পরমবন্ধুকে এক জোড়া দিব্য চক্ষু দিলেন। তৎসাহায্যে মধ্যম পাণ্ডব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া নয়নমন সার্থক করিলেন। বিশ্বব্যাপিমূর্ত্তি বাক্ দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। কৃষ্ণানন্দের গীতায় আলেখ্য দর্শন করিলে পাঠকবর্গ অনেকটা idea করিতে পারিবেন। ধনঞ্জয় দেখিলেন, কৃষ্ণের দেহ বহুতর বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রসম্পন্ন। তাহার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই নাই এবং একাকী স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কিন্তু কোন্ স্থান হইতে ইহা দর্শন করিলেন, তাহা কোন ভাষ্যকারই ব্যক্ত করেন নাই। মহামতি পার্থ আরও দেখিলেন যে, মহাবীর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অন্যান্য মহীপালগণ ও তাহাদিগের যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের বদনবিবরে প্রবেশ করিতেছে এবং বিশাল দন্তাঘাতে তাহাদের উত্তমাঙ্গ চূর্ণীকৃত হইতেছে। বাসুদেব সেই মূর্ত্তিতেই বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, আমিই লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক সকল বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষীয় সমস্ত বীরগণই বিনষ্ট হইবেন। অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে বিনাশ করতঃ যশোলাভ এবং অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমি তাহাদের

অগ্রেই নিহত করিয়াছি; এক্ষণে তুমি বিনাশের নিমিত্ত মাত্র হও। হে অর্জ্জুন, আমিই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি" তুমি কেবল তাহাদের গলা একটু একটু কাটিয়া দাও, তাহা হইলেই কার্য্য উদ্ধার হইবে। তজ্জন্য কিছুমাত্র ব্যথিত হইওনা। অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। নিশ্চয় তোমার জয় হইবে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অর্জ্জুনের জ্ঞান মার্গ উন্মুক্ত হইল, এবং আমি হন্তা, উহারা হত, একপ ভ্রান্তি দূর হইল। ইংরাজ বিচার পতিগণকে আমরা গীতার এই অংশটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কারণ, তাহারা অনেক সময় অমুক লোক, অমুক লোককে হত্যা করিয়াছে বলিয়া নির পরাধীকে অনর্থক শাস্তি প্রদান করেন। অনেক দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের মনে একটা কুসংস্কার আছে যে, কোন কোন শ্বেত-পুরুষ কোন কোন কৃষ্ণকায়কে নিহত করিয়াছেন। ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্গীতা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৃন্দাবনের ননীচোরাই যথার্থ হত্যাকারী; সাহেব নিমিত্তমাত্র। যিনি নিমিত্তমাত্র, তাহার আবার অপরাধ কি?

বহুব অনেক স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, কৃষ্ণ পুনরায় নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই আমার তেজোময় বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তি দর্শন করে নাই।" এই কথাটার জন্য বঙ্কিম বাবু বড় গোলে পড়িয়াছিলেন। কেননা, কুরুসভায় এবং অন্যান্য স্থানে সহস্র সহস্র লোককে তিনি ইতিপূর্ব্বে বিশ্বরূপ সন্দর্শন করাইয়া আজ বলিলেন কি না "আমার বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন কেহ দেখে নাই" (কৃষ্ণ চরিত্র –৩১৩পৃষ্ঠা), কিন্তু উপন্যাস কর্ত্তার কল্পনাময়ী লেখনী সহজেই একটা সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বকার সমস্ত বিষয়ই "প্রক্ষিপ্ত", "অসহনীকণ্ডূয়ন নিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতিগাত্রীসম্ভূত কোন কুকবি প্রণীত অলীক উপন্যাস" আর এই বিশ্বরূপটাই আদৃত। * ক্রমশঃ।

শ্রীজয়গোপাল দে।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। (প্রতিবাদ।)

ভাদ্র মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার তাঁহার 'হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান" প্রবন্ধে বঙ্গদেশের কয়েকজন স্বর্গীয় মনস্বী ব্যক্তির প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তাঁহার সেই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ আবশ্যক মনে করিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিলাম।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন যে, প্রকারান্তরে জাতিভেদ মূলক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যেই হইতেছে, মধুসূদন বাবুর এই কথার সহিত আমাদিগের মতভেদ নাই। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও ভূদেবের জীবনের মর্ম্মভেদ করিলে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ক্রমবিকাশের লক্ষণ পাওয়া

* আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ সম্বলিত গীতা হইতে অনেক স্থলেই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। উক্ত পুস্তকের অনুবাদই ভ্রমশূন্য। গীতার যথার্থ অর্থ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ উহা পাঠ করিবেন। উক্ত পুস্তকের মূল্য আট আনা মাত্র।

যায়," এ কথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অন্ততঃ প্রথমোক্ত দুইজন মহাত্মা সম্বন্ধে আমরা একথা আদৌ স্বীকার করি না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার "বিধবা বিবাহের আন্দোলন ও বহু বিবাহ-নিবারণ-যত্ন কেবল ব্রাহ্মণ-বংশ বৃদ্ধির জন্যই সূচিত হইয়াছিল। সাধারণ হিন্দুজাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক গণ্ডূষ চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে এরূপ রূঢ় কথা আর কাহাকেও কখনও প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। কথাগুলি যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা তাহা কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু কে বলিবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমস্ত জীবনব্যাপী কার্য্য কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য। বিধবা বিবাহের আন্দোলন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল ব্রাহ্মণ জাতির বংশ বৃদ্ধির জন্য করিয়াছিলেন, একথা এই নূতন শুনিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় কি কোথাও বলিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক? সরকার মহাশয় তাহার প্রমাণ দিলে বাধিত হইব।

বহুবিবাহ নিবারণের আন্দোলনই কতক পরিমাণে ব্রাহ্মণ জাতির মঙ্গলার্থ সূচিত হইয়াছিল বরং একথা স্বীকার করা যায়; কেননা কুলীনব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই বহুবিবাহ এক সময়ে বিশেষরূপ প্রবল ছিল, তথাপি ব্রাহ্মণেতরজাতির মধ্যে যে, একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল না, একথা ত কেহই বলিতে পারেন না? অতএব আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, সাধারণ হিন্দুজাতির উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন নাই? সহমরণ প্রথা যখন প্রচলিত ছিল, তখন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-বিধবারাই স্বামীর অনুগামিনী হইতেন। ব্রাহ্মণ-রমণীর তুলনায় অন্যান্য জাতীয়া সহমৃতা রমণীর সংখ্যা যে অল্প ছিল, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাদেশ যেরূপ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন, শূদ্রেরা সেরূপ করিতেন না, তাঁহাদিগের ততদূর কঠোর ভাবে নিষ্ঠাবান হওয়া আবশ্যক বলিয়া কেহ বোধ করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিব যে, রাজা রামমোহন রায় কেবল ব্রাহ্মণ জাতির কল্যাণার্থ সতীদাহ নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন? সতীদাহের লোমহর্ষণ দৃশ্যে হৃদয়ে আঘাত পাইয়া রাজর্ষি রামমোহন যেমন তাহার তিরোধানের জন্য কায়মনে যত্ন করিয়াছিলেন, হিন্দুবিধবা ও কুলীন কামিনীদিগের দুঃখে সেইরূপ ব্যথা পাইয়া, সহৃদয় বিদ্যাসাগর সেই কুপ্রথার তিরোধানের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদাভেদ করেন নাই, সে ক্ষুদ্র কথা তাঁহার বিস্তৃত হৃদয়ে স্থান পায় নাই। দুঃখিনী বঙ্গরমণীকুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি তাহার তিরোধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। "অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং" বিদ্যাসাগরকে যিনি সেরূপ লঘুচেতা মনে করেন, তিনি কেবল নিজের সংকীর্ণহৃদয়তার পরিচয় দেন মাত্র।

তাহার পর বঙ্কিম বাবুর কথা। মধুসূদন বাবু বলিয়াছেন, "বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র কেবল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপনের জন্য।" মধুসূদন বাবু কেমন করিয়া একথা বলিলেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। যে বঙ্কিম বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, বৈদ্যবংশোদ্ভব কেশবচন্দ্র যেন সকল ব্রাহ্মণের ভক্তিভাজন, তিনি

ব্রাহ্মণ জাতির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য যত্ন করিয়াছেন, একথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বঙ্কিম বাবু যে, জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিতেন না, তাহা তাঁহার ধর্ম্মতত্বের দশম অধ্যায়ে তিনি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। যজ্ঞোপবীতধারী হইলেই যে ব্রাহ্মণ হইল, এবং তাহাকেই ভক্তি করিতে হইবে, একথা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু তিনি ক্ষমবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহারা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইয়াও উল্লিখিতরূপ গুণসম্পন্ন নহেন, তাহাদিগকে তিনি এক প্রকার শূদ্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই মত সমর্থনের জন্য এবং তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি এস্থলে ধর্ম্মতত্বের একস্থল হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

শিষ্য। এখন দেখিতে ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী পাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এই টুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটী গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক্ তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব, যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক্, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম।

ইহাতেও কি বলিতে হইবে যে, বঙ্কিম বাবু, ব্রাহ্মণপ্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন? তবে বঙ্কিম বাবু সদাশয়সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রকেই "ব্রাহ্মণ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হইতে পারে, মধুসূদন বাবুর এই "ব্রাহ্মণ" কথাটার উপরই যত আক্রোশ। যেমন যোনিবিশেষ "রাম" নাম সহ্য করিতে পারে না, মধুসূদন বাবু সেইরূপ "ব্রাহ্মণ" এই শব্দ শুনিলেই জ্বলিয়া যান। বঙ্কিম বাবু যদি তাহা বুঝিতেন, তাহা হইলে তিনি যে সকল গুণের পরিচায়করূপে ব্রাহ্মণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা না করিয়া বোধ হয় তদর্থে অন্য শব্দ ব্যবহার করিতেন।

মধুসূদন বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে যেরূপ ভুল বুঝিয়াছেন, ভূদেব বাবু সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। সমগ্র হিন্দু সমাজের যে উপায়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে, যাহাতে হিন্দুজাতির মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তার বিকাশ সাধন হইতে পারে, তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। ভূদেব বাবু যদি গোঁড়া হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে, তিনি শিল্পবিজ্ঞানাদির উন্নতির জন্য হিন্দু সন্তানকে বিলাত পাঠাইবার

পরামর্শ দিতেন না। তিনিও বঙ্কিম বাবুর ন্যায় ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে "ব্রাহ্মণ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* টোলের উন্নতির জন্য ভূদেব বাবু যে প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা ব্রাহ্মণ জাতির মঙ্গলার্থে দান করা হইয়াছে বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এ দেশে আর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই উপধর্ম্মের অন্ধকার বিলীন হইয়া সনাতন ধর্ম্মের আলোকে চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বলিত হইবে। রাজর্ষি রামমোহন এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজে বেদালোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রও শেষাবস্থায় আর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা ও ব্যাখ্যায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণও এক্ষণে ক্রমে ক্রমে এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন। বাস্তবিক, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সংস্কারের পদ্ধতি অবলম্বন না করিলে, ইষ্ট সিদ্ধির আশা করা যায় না। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুশাস্ত্র রূপ অসি হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই "জাতিগতব্রাহ্মণ্য" স্থাপনের জন্য যত্ন করেন নাই।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর অবনতির কারণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাবিত্রী-লাইব্রেরীর চতুর্দ্দশ বাৎসরিক অধিবেশনে "বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা" বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা সকলের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি এই বিষয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার প্রয়োজন মনে করিতেছি।

আমাদের বর্ত্তমান অভাব ও অবস্থার কারণ, হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কেবল তাহার আভাস দিয়াছেন মাত্র। আমি সেই কারণ অনুসন্ধান করিব। মানুষের স্বভাব, কোন একটী ঘটনা দেখিলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করে। অনেকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের কোনরূপ উপকারে আসিতে পারে, এই বিশ্বাসেই ইহার অবতারণা করিলাম।

বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা কি, সে সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা না একটা ধারণা আছে। হীরেন্দ্রবাবু উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবেন শুনিয়া আমার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, এক কথায় সমস্ত প্রবন্ধের মর্ম্ম কি হইবে তাহা বুঝিতে পারি। আমাদের অভাব অনন্ত ও অবস্থা শোচনীয়। হীরেন্দ্রবাবুও আমাদের অবস্থা ও অভাব শ্রেণীবিভাগ করিয়া, আমাদের শারীরিক, সামাজিক, "বণিজিক" আর্থিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি অভাব ও অবস্থা একে একে পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের অভাব কি ও অবস্থা কিরূপ, তাহার

* সামাজিক প্রবন্ধ ৩০২ পৃষ্ঠা।

পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, আমাদের অভাব মহাজনগণের পথ অনুসরণ করিয়া অন্তরূপে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া লইতে পারি। এই অভাব ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

এখন আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যাহাকে আপাততঃ কোন ঘটনার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা অনেক সময় প্রকৃত কারণ নহে। সুধু তাহাই নহে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অতি গূঢ়। যাহা আপাততঃ কারণ বলিয়া বোধ হয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার পরবর্ত্তী অবস্থা বা কার্য্য মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা অনেক গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা অবস্থার ফল মাত্র। তাহার উপর আর একটী নূতন ঘটনা সংযুক্ত হইয়া আমার জ্বর হইল। হয় ত, যদি আমার শারীরিক অবস্থা অন্যরূপ থাকিত, তাহা হইলে এই নূতন ঘটনায় আমার শরীরে জ্বর উৎপাদন করিতে পারিত না। তাহার পর সেই জ্বরই আমার শরীরকে আর একরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া দিল, তাহাতে আমার শরীর এরূপ ভগ্ন হইল যে, শরীর একেবারে ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়িল। সুতরাং যে 'জ্বর' এক দিন 'কার্য্য' রূপে অনুমিত হইয়াছিল, তাহাই পরে আবার 'কারণ' রূপে গণ্য হইল।

অতএব কোন বর্ত্তমান ঘটনার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অনুসন্ধান করিলেই যথেষ্ট হয় না। কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যতদূর আমরা অগ্রসর হইতে পারি, ততদূর আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে। আমরা শেষে, যত দূর পর্য্যন্ত সম্ভব, মূল কারণ জানিতে পারিব।

এখন কথা: হইতেছে,—এরূপ কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আর মূল কারণ জানিবারই বা আবশ্যক কি? কোন একটী ঘটনার অতীত কারণ স্থির না করিলে তাহার ভবিষ্যৎ নিয়মিত করা যায় না। যত দূর মূল কারণ জানা যায়—ততদূর সে ঘটনা আমাদের আয়ত্বাধীন হয়। বৈদ্যকে রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে সেই রোগের সমস্ত কারণ গুলি অনুসন্ধান করিতে হয়, মূল কারণ কি, তাহা ও ঠিক করিতে হয়, পরে একে একে সেই কারণ গুলি উন্মূলিত করিতে হয়। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্তে (Fichte) বলিয়াছেন।—

"যে সমস্ত কারণের সমবায়ে কোন এক বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেগুলি যদি অনুসন্ধান করিতে করিতে যাওয়া যায়, এবং সেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কিরূপে পরিণত হইবে তাহা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে সেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত ধরিয়া, আমরা সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিব। অর্থাৎ বর্ত্তমানের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সমগ্র অতীত অবস্থা বুঝিব, আর তাহার ফল পর্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ জানিব।" *

অতএব যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য—আমাদের অভাব দূর করিবার জন্য, চেষ্টা করিতে হয়, যদি কেবল ভগবানের বা দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া আমাদিগকেও কিছু পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

* Were I able to trace backwards the causes, throuh which alone any given moment could have come into actual existence, and to follow out the consequences which must necessarily flow from it, I shall then be able at that moment to discover all possible condition—both past and future past—by interpreting the given moment, future—by foreseeing its results."

এই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে সমাজতত্বের কতকগুলি স্থূল কথা বুঝিতে হয়। মানুষ পরস্পর একত্রিত হইয়াই মনুষ্য সমাজ সংগঠিত করে। কোন বড় ব্যবসায় করিবার জন্য, অথবা একলা যে কাজ হয় না এমন কোন বড় কাজ করিবার জন্য মনুষ্য একত্রিত হয় বটে। কিন্তু তাহাতে মনুষ্য সমাজ সংগঠিত হয় না। মানুষের সমাজবদ্ধ হইবার কতকগুলি বিশেষ কারণ বা বিশেষ নিয়ম আছে। শুধু তাহাই নহে। আজ এ কথা বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছে যে, মানুষের শরীরের ন্যায়,সমাজ শরীরেরও আন্তরিক জৈব শক্তি আছে। জৈবশক্তি বলে কতকগুলি পরস্পর বিরোধী-শক্তিসম্পন্ন পরমাণু, সে শক্তি গুলিকে সংযত করিয়া, জৈবশক্তি-দ্বারা অভিভূত হইয়া দেহরূপে সম্বদ্ধ হয়। মানুষকেও সমাজ সম্বদ্ধ হইতে হইলে—তাহার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের সহিত একত্র হইতে হয়। যে শক্তি বলে সেই স্বার্থ— সেই সমাজ বিরোধী শক্তি সংযত হয়, তাহাই সমাজকে ধারণ করিয়া রাখে। সেই শক্তির বলে জড় জড়াণুবকে আকর্ষণ করে, জীব অন্য জীবকে আকর্ষণ করে—জীবকে আপনাহারা করিয়া দেয়, মানুষ পরের বা সমাজের উন্নতির জন্য কর্ম্ম করে—কর্ত্তব্য (duty) করে,পরকে ভালবাসে। পরমাণু পরমাণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া জড় জগতের বিবর্ত্তন হয়। জীবাণু জীবাণুকে আকর্ষণ করে বলিয়া জীবজগৎ উন্নত হয়। মানুষ মানুষকে আকর্ষণ করে বলিয়া মনুষ্য সমাজ দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়। সেই আকর্ষণ বলে —সেই বন্ধন বশে, মানুষ স্বধর্ম্ম পালন করে, নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, অপরের উপকারের জন্য, সমাজের রক্ষার জন্য নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করে। এই আকর্ষণের মূল ধর্ম্ম।

আদিম অবস্থায় মানুষের জ্ঞানে দুইটী বিষয় প্রতিভাত হয়—আপনি ও জগৎ। তখন মানুষ বাহ্য জগৎ দ্বারা চারিদিক হইতে বিপর্য্যস্ত হয়। বাহ্য জড় শক্তির সহিত তাহাকে অবিরত সংগ্রাম করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে হয়। সংগ্রাম করিয়া মানুষ ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়ে; শেষে জড় শক্তির আশ্রয় লয়, কখন বা দেবতা ভাবিয়া জড় শক্তিকে পূজা করিয়া তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া কোনরূপে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। এই আত্মরক্ষার জন্য তখন আদিম মনুষ্য পরস্পর সমাজ সম্বদ্ধ হয়। এই সমাজের প্রথম সূচনা। পরে বাহ্য জগতের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাহ্য জড় শক্তিকে নিয়মিত করিয়া, সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ আপনার কথা, অন্য কথা, ভাবিতে অবসর পায়। তখন সে আপনাকে, জগৎকে বড় নিয়মিত,বড় সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এই সসীমের ধারণা হইতে ক্রমে অসীমের বা ঈশ্বরের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। সেই সময়ই তাহার জ্ঞানে ধর্ম্মবীজ প্রথম উপ্ত হয়।

তখন মানবের ভাবিবার বিষয় হয় তিনটী— আপনি, জগৎ ও ঈশ্বর। ইহার মধ্যে এক একটী সমাজে এই তিনের কোন একটী ভাবনার প্রাধান্য থাকে। যাহারা স্বার্থ ভাবে, অর্থ কাম ভাবে —তাহাদের মধ্যে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হয়। এই স্বার্থ সংঘর্ষে সমাজ বন্ধন শিথিল হইবার উপক্রম হইলে, পরস্পরের স্বার্থ সুনিয়মিত হইবার চেষ্টা হয়। তাহা হইতে রাজনীতির উন্নতি হয়। বাহ্য জগতের আলোচনা হইতে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। জগতের সৌন্দর্য্য তত্বের ভাবনা হইতে শিল্পের উন্নতি হয়। আর ঈশ্বর ভাবনা হইতে ধর্ম্ম ও তত্ব-বিদ্যার উন্নতি হয়। সুতরাং সমা-

জের মূলসূত্র সমাজ-নিয়ামক মূলভাব পাঁচটী যথা—(১) কৃষি বাণিজ্য, (২) রাজনীতি (৩) শিল্প, (৪) ধর্ম্ম ও (৫) তত্ত্ব বিদ্যা। সাধারণতঃ এইগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী। অর্থাৎ একের প্রাধান্যে অপরগুলি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়।*

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই পাঁচটী বিষয়ের একটী না একটীকে—কোন এক বিশেষ সমাজ অবলম্বন করিয়া উন্নত হয়।† স্থান কাল ও জাতি বিশেষে এই মূল ভাবের পার্থক্য হয়। যে দেশের প্রকৃতি (আধিভৌতিক অবস্থা) বিশেষ অনুকূল নহে—যেখানে প্রকৃতির শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষকে উন্নতির পথে যাইতে হয়, সে দেশ বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির কতকটা অনুকূল। যে দেশের অবস্থান হেতু বিভিন্ন জাতির সহিত সর্ব্বদা সংঘর্ষণ সম্ভব, সেখানে রাজনৈতিক উন্নতি হয়। যে দেশের প্রকৃতি মানুষের অনুকূল—যেখানে মানুষকে বড় বেশী জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিতে হয় না, সে দেশ ধর্ম্ম ও তত্ত্ব বিদ্যার উন্নতির অনুকূল। সেই রূপ কাল ধর্ম্ম অনুসারে এক এক সময়ে এক এক ভাবের আধিক্য হয়। এক সময়ে জগতে ধর্ম্ম-ভাবের আধিক্য ছিল—সত্য যুগ ছিল। তখন যে জাতি ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছিল, তাহারাই বড় হইয়াছিল। এখন বাণিজ্য বিজ্ঞানের দিনে—এই কলিযুগে, যে জাতি বাণিজ্যে বড় হইয়াছে—সেই সকলের উপর আধিপত্য করিতেছে।

যাহা হউক এতদূর পর্য্যন্ত আমরা যে টুকু সমাজ তত্ত্ব বুঝিলাম—তাহা আমাদের পক্ষে বড় আশাপ্রদ নহে। কিন্তু আরও কথা আছে। যদি কোন দেশে কোন কালে কোন সমাজের মূল মন্ত্র থাকে বাণিজ্য, রাজনীতি বা শিল্প—তবে সে সমাজ স্থায়ী হয় না। মিসর, কার্থেজ, সাইডন, টায়র প্রভৃতি কত জাতি বাণিজ্য বলে উন্নত হইয়াছিল। তাহারা এখন কাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। রাজনীতিতে, শিল্পে, প্রাচীন রোম ও আধুনিক ইতালী এক দিন কত বড় হইয়াছিল—রোমরাজ্য, ম্যাসিডন্ রাজ্য এক দিন সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আজ তাহাদের নাম-মাত্রাবশেষ হইয়াছে। শুধু তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় গ্রীসও এক দিন বড় হইয়াছিল, তাহা এখন কেবল ইতিহাস-বক্ষে বিচরণ করিতেছে। কেবল যে জাতির একমাত্র ধর্ম্মই অবলম্বন ছিল, তাহারাই কালকে উপহাস করিয়া কতদিন জীবিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম ইহুদীদের অবলম্বনীয় না হইলে তাহারা এত অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া এতদিন কোথায়

---

* The five elements in a nation's life are industry, state, art, religion and philosophy. They strive to conquer and absorb each other. Thus industry entirely occupied with utility would reduce to that all the rest. The state continually encroaches upon and attempts to draw all into it sphere. Religion cannot consent to abdicate its empire. Philosophy is peaceful but when the state or religion would reduce it to the condition of a servant it resists. This state of warfare comes from the essential diversity of elements. Cousin's History of philosophy vol I. P. 151

† Every nation is called into existence to represent an idea and it progresses towards the accomplishment of this idea. The different nations of the same epoch represent different ideas. The nation which represents the idea must in accordance with the general spirit of the epoch is the nation called to domain. When the idea of a nation has served its time, this nation disappears."

Cousin's. History of Philosoply.
vol i. P. 151.

ভাসিয়া যাইত। আজ নয় শত বৎসর অত্যাচার সহ্য করিয়া এবং দাসত্ব করিয়াও হিন্দু জীবিত রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম 'এখনো' আমাদের আশা আছে।

এ কথায় আর এক আপত্তি হইবে। ধর্ম্ম সকল সমাজকে রক্ষা করে নাই। ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইয়া একদিন মুসলমানগণ পৃথিবীর অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখন তাহাদের সে আধিপত্য নাই। ধর্ম্ম অনেক সময় উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে, বিজ্ঞানালোচনার পথে বাধা দিয়াছে, গ্যালিলিও কোপার্নিকাস্ প্রভৃতির উপর অত্যাচার করিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধের কথা conflict between religion and science এর কথা অনেকেই অবগত আছেন। অতএব কেবল ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই যে জাতির উন্নতি হইবে, তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারা যায়।

ইহার উত্তর দুইটী। এক, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম—যাহা সনাতন ধর্ম্ম, কেবল তাহা অবলম্বন করিলেই মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি হয়, মানুষ সাত্ত্বিক ও দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, এবং তাহা হইতেই জাতীয় উন্নতি হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বনে বা স্বার্থপ্রণোদিত তামসিক ধর্ম্ম অবলম্বনে তাহা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সাধারণ লোক যাহাতে সেই ধর্ম্ম প্রণোদিত হয়—ধর্ম্মভাব যাহাতে সমাজ মধ্যে সজীব ভাবে বর্ত্তমান থাকে, যে সমাজে তাহার সুব্যবস্থা আছে, সেই সমাজই উন্নত হয়। নতুবা যে সমাজে সেরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানে উন্নতির আশা করা বৃথা। এই দুই কথাই আমাদের এ প্রবন্ধে বুঝিতে হইবে।

তাহার পূর্ব্বে আর একটী কথাও বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের ফল এ জগতে ও পর জগতে মানুষের উন্নতি, তাহারই ফল সমাজের উন্নতি। মানুষ অসীমের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহার সাধনা অনন্তজীবন ব্যাপী, সুতরাং মানুষের উন্নতির সীমা নাই। সমাজের উন্নতির একটা সীমা আছে। সমাজ একটা আদর্শকে লক্ষ করিয়া অগ্রসর হয়, সেই আদর্শে সমাজ উপনীত হইতে পারে। এবং সে আদর্শে উপনীত হইলে সমাজ আর উন্নত হয় না, সমাজ স্থায়ী হইয়া দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়।

এই আদর্শ সমাজ কি? কথাটা বড় গুরুতর। সুতরাং সংক্ষেপে তাহার দুই একটী মূলসূত্র আমরা এখানে আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয় পাঁচটা। কৃষিবাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, ধর্ম্মসাধন ও তত্ত্ববিদ্যা। সমাজের লোকের শরীরধারণ ও রক্ষা প্রথম প্রয়োজন, তাহার জন্য কৃষিবাণিজ্যের আবশ্যক। সমাজকে বহিঃ ও অন্তঃ শত্রু হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজনীতি চাই। সমাজ রক্ষক চাই। সমাজের লোকের ধর্ম্ম বৃত্তি স্ফূর্ত্তির জন্য—তাহার রক্ষার জন্য, ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যার আবশ্যক। এক কথায় সুনিয়মিত সমাজে এই সকল গুলিরই সুব্যবস্থা থাকে। ইহার একের আধিক্য হইলে অন্য গুলির ক্ষতি হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহাতে সেরূপ না হয়, সুসমাজে তাহার ব্যবস্থা থাকে। আমরা দেখাইব যে, যে সমাজ ধর্ম্মভাব প্রণোদিত, সেই খানেই এরূপ সম্ভব হয়। হীরেন্দ্র বাবুও তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে "মানব সমাজের আধ্যাত্মিক অভাবের পূরণে, কোন অভাবের পূরণ অবশিষ্ট থাকে না। সকল অভাব নিঃশেষিত হয়।"

তাহার পর আরও এক কথা আছে। সমাজ কিসের জন্য? মানুষ পরস্পর সম্মিলিত

হইয়া যাহাতে নিজ উদ্দেশ্য পথে যাইতে পারে, কেবল তাহারই জন্ত সন্দেহ নাই। মানুষের উদ্দেশ্য—এই জগতে ও পরজগতে উন্নতি,অনন্তের পথে গতি। তাহার জন্য মানুষের প্রয়োজন—ধর্ম্ম সাধন। এখন বুঝা যাইবে যে মানুষের মন যাহাতে অন্যরূপ বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিতে পারে, যাহাতে সমস্ত মন ধর্ম্মের দিকে,নিজের উন্নতির দিকে নিযুক্ত থাকিতে পারে—সমাজ তাহার পক্ষে অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। যদি মানুষের দেহ রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম করিতে হয়—প্রতিকূল প্রকৃতির সহিত প্রতিক্ষণ সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিতে হয়—তাহা হইলে ধর্ম্মসাধন হয় না। অতএব সমাজ এরূপে সম্বদ্ধ হওয়া চাই,যাহাতে জীবন সংগ্রাম একেবারে কমিয়া যায়। পণ্ডিতবর কারলাইল তাঁহার কোন প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, আমাদের দেহ যখন সুস্থ থাকে,তখন আমাদের যে দেহ আছে, তাহা মনেই হয় না। স্বাস্থ্যের সময় দৈহিক কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে এমনি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। কিন্তু যখন আমাদের পীড়া হয় কেবল তখনই সেই শরীরের দিকে অথবা পীড়িত স্থানে আমাদের মন আকর্ষিত হয়, যতক্ষণ সে স্থান সুস্থ না হয়—ততক্ষণ মনকে আমরা সেস্থান হইতে সরাইয়া লইতে পারি না। আমাদের সমাজ দেহ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। যখন সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত—সুস্থ থাকে, তখন সমাজের দিকে আমাদের মন আকৃষ্ট হয় না। তাহার কোন স্থান পীড়িত হইলে পরে যতক্ষণ সে স্থান সুস্থ না হয়, ততক্ষণ-আমাদের মন সেই ভাবনায় ব্যস্ত থাকে।

একদিন আমাদের সমাজ সেইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সমাজের জন্য আমাদের ভাবিতে হইত না। সমাজে আমরা নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া সমস্ত মনটাকে ধর্ম্মের দিকে নিয়োজিত করিতে পারিতাম। এখন সমাজে রোগ প্রবেশ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজ সুস্থ সুনিয়মিত সমাজ নহে। নিহিলিজম্,সোসালিজম্,ট্রেড্ ষ্ট্রাইক্, trade strike ভঙ্গ, প্রভৃতিই তাহার সাক্ষী। সেখানে সমাজের ব্যাধি এত অধিক যে, সকলের মনই সেই দিকে এখন আকৃষ্ট। সেই অস্বাস্থ্যকর পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে আমাদের সমাজ কতকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সমাজ মধ্যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। যাউক, সে অপ্রাসঙ্গিক কথায় এস্থলে কাজ নাই।

বলিয়াছি যে, যে সমাজের মূল—প্রকৃত ধর্ম্ম, সেই সমাজই সর্ব্বদিকে সুগঠিত হয়, সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এখন এ ধর্ম্ম কি তাহার কথা বলিব। এস্থলে তত্ত্ববিদ্যা বা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিব না। এখানে কেবল আমাদের এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, ধর্ম্মের মূল-সূত্র সংযম, নিবৃত্তি। বাসনা বীজই সংসারের মূল। এই বাসনা বীজই আমাদের মানুষ করিয়াছে, আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয় দিয়াছে, আমাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তি দিয়াছে। আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব জর্ম্মাণ পণ্ডিত সপেনহর বড় বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।*

*Man emerges on the scene as a being charged with individual appetites and desires, concerned with nothing but his own interests, blind to everything, but securing means of gratification, wholly controlled by the lust of life, and exulting in the natural pride of existence When his consciousness awakes, he finds himself lodged in the fabric of the body, identified with its lusts ann appetites his intellect entirely in bondage to his passions, and without a thought beyond * * * He affirms that lust of life, which he finds himself practically enacting, is the law of his being Another step, and his selfishness, which makes it his only duty to be happy,

এই বাসনা বীজ নষ্ট হইলেই আমাদের মুক্তি হয়। এই জন্য স্বার্থ ও আত্ম ত্যাগ আমাদের মূল ধর্ম্ম।

ধর্ম্মবলে এই স্বার্থ ইচ্ছা,এই বাসনাজ প্রবৃত্তির দমন হয়; আমাদের অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি সকল নিয়মিত হইয়া উর্দ্ধস্রোত হয়। এই প্রবৃত্তি দমন বা denial of the will হইতে আমাদের নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পালনে মতি হয় —প্রীতি দয়া প্রভৃতি সৎবৃত্তি বা ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, এবং পরিণামে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মের চরম সাধনার যোগ্য হওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে,মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ-প্রবৃত্তি তাহার অহঙ্কারের পরিবর্ত্তে নিবৃত্তিধর্ম্ম কোথা হইতে আসে ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি,আদিম অসভ্যাবস্থায় মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম্মবৃত্তির প্রথম স্ফূর্ত্তি হয়। তখন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না। ক্রমে এই ইচ্ছা ও কর্ম্মবৃত্তির সহিত আমাদের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। সর্ব্বশেষে --মানুষ কতকটা উন্নত হইলে, তবে তাহার জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। জ্ঞানে এক দিকে সসীম জগৎ বা সংসারকে ও অপর দিকে সসীম আপনাকে প্রতিভাত হয়। শেষে সেই সসীমের মধ্য দিয়া অসীমকে দেখিতে পায়। পরিণামে আপনাকে ও সমস্ত সংসারকে সেই অনন্তের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। তখন এক ব্রহ্ম ছাড়া সংসারে বা আপনাতে আর কিছু দেখিতে পায় না। ভিতরে বাহিরে কেবল সেই অনন্ত অসীমকে উপলব্ধি করে। তখন সে বুঝে—এ সংসার অসৎ—ব্রহ্মই সৎ। সংসার ও জীব তাঁহারই বিকাশ। জীবাত্মা এক—কিন্তু সংসারে মায়াবশে বহুরূপে প্রতিভাত। মানুষ (জীব) বহু হইয়াছে—পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া এক হইবে বলিয়া—তাহার ও জাবের আত্মার ভিতর দিয়া এক পরমাত্মার ভাব উপলব্ধি করিবে বলিয়া। * এইরূপ ধারণা হইলে পরে আমরা,

> সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
> সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি।

এইরূপে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, অহঙ্কার বিনষ্ট করিয়া, সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া,ধর্ম্মের চরম ফল মোক্ষ লাভ করিবার উপযুক্ত হওয়া যায়। অতএব জ্ঞানবৃত্তির এইরূপ স্ফূর্ত্তি হইলে, আমাদের কর্ম্মবৃত্তি—প্রবৃত্তির শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, নিষ্কামভাবে আসক্তি শূন্য হইয়া পরিচালিত হয়—আমাদের চিত্তবৃত্তি সংযত হইয়া ভক্তিমার্গে তাহা ঈশ্বরাভিমুখী হয়।

সে যাহা হউক, সমাজের মধ্যে সকল লোকেরই জ্ঞানের এরূপ বিকাশ ও পরিণতির সম্ভাবনা নাই। সমাজে সকল শ্রেণীর লোক থাকে। সুতরাং সমাজকে এরূপে সংগঠিত করিতে হয় যে, সকল শ্রেণীর

---

carries out its principles by reducing the whole world into a mere material and vehicle for his pleasures. * * Thus the selfish creed of the natural quest for happiness issues in the career of wrong in a world of wrongdoing. The discomforts thus arising, call forth the machinery of public law, the state and its ministries of so called justice. * * But political and penal agencies would not exert even the slightest influence they do, were they not re-inforced by other and more purely moral stimuling.—Wallace's *Life of Schopenhauer*, p. 132.

* The universe is not what it seems. It is something higher which lies beyond mere appearence. It is the Divine Life manifested in Existence—as the World, as Human Life. The life of man is essentially one and indivisible. It is divided into the life of many proximate individuals, in order that it may form itself to unity, and that all the separate individuals, who compose it may through life itself blend themselves, together into oneness of mind. The progressive culture of the human race is the object of the Divine idea, and of those in whom the Idea dwells.—Fichte, *On Nature of the Scholar.*

লোকই, প্রবৃত্তি নিয়মিত করিয়া, স্বার্থ সংযত করিয়া, ধর্ম্মের দিকে—অনন্ত উন্নতির দিকে যাহার যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইতে পারে। সকল মানুষেরই একটা না একটা অবলম্বন প্রয়োজন—বিষয়াকর্ষণে অস্থির মনের একটা আশ্রয় চাই। ধর্ম্ম বা পরহিতব্রত অবলম্বন না করিলে মন আপনাকে ও বিষয়কে অবলম্বন করে—মনঃ স্বার্থ চালিত হয়—অথবা নিরাশ্রয় হইয়া আত্মঘাতী হয়। তাপ উৎপন্ন হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত না হইলে, তাহা আপনার আধারকেই ভস্মীভূত করে, এবং তাহার সংস্পর্শে অন্যকেও নষ্ট করে, ইহা *বিজ্ঞানের স্থিরসিদ্ধান্ত।*

এখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথা বলা আবশ্যক। তাহা হইলে সমাজে বর্ণবিভাগের কথা বলিতে হয়। কেননা, হিন্দুর বর্ণ ও কর্ম্ম বিভাগতত্ত্ব না বুঝিলে সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণ বুঝা যায় না—সমাজ-বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এবং সেইজন্য বোধ হয় একথা সাহস করিয়া বলা যায় যে, ইউরোপে সকল বিজ্ঞানের উন্নতি হইলেও সমাজ বিজ্ঞান এখনও বড় অসম্পূর্ণ আছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে,

> "তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণ কর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
> গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥"

সকল সমাজেই চারি শ্রেণীর লোক থাকে। কর্ম্ম ও গুণের বিভাগ হইতে এই বর্ণবিভাগ হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

> চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

অন্যত্র বলিয়াছেন,

> ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
> কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈ গুণৈঃ॥

অতএব এই বর্ণবিভাগ বুঝিতে হইলে গুণ ও কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। প্রথম কর্ম্মবিভাগের কথা বলিব। বঙ্কিম বাবুর কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম। এজন্য জ্ঞানার্জ্জন যাহাদিগের স্বধর্ম্ম তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। জগতে অন্তর্বিষয় আছে, বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। *বহির্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়।* মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী; যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্ম্মী। এবং যাহারা রক্ষা করে তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী।... ... যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্য বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মীগণ আপনাদের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা (৩) শিল্প বা বাণিজ্য (৪) উৎপাদন বা কৃষি (৫) পরিচর্য্যা—এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম। এই কর্ম্মানুসারে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। গীতায় আছে,

> শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
> জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং॥
> শৌর্য্যং তেজোধৃতি দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
> দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্র কর্ম্ম স্বভাবজং॥
> কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
> পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং॥

আরও এক কথা। এই কর্ম্ম বিভাগ প্রকৃতিজ গুণ বা লোকের স্বভাব অনুসারে হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কতকগুলি লোক